বিদেশীদের চোখে ভারতবর্ষ

ইবন বাতুতার দেখা ভারত

সংকলন

প্রেমময় দাশগুপ্ত

ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড

কলিকাতা * * ১৯৮৩

প্রকাশক :
ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড
২৫৭ বি, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০১২

প্রথম প্রকাশ : ১৯৮১
পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ-১৯৮৩

মুদ্রক :
নায়ক প্রিন্টার্স
৮১/১ই রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০০৬

—আমাদের কথা—

প্রথম সংস্করণ

'বিদেশীদের চোখে ভারতবর্ষ' গ্রন্থমালার পঞ্চম বই "ইবন বাতুতার দেখা ভারত"। এর আগে আমরা 'ফা-হিয়েনের দেখা ভারত', 'মারকো পোলোর দেখা ভারত', 'অলবেরুনীর দেখা ভারত' ও 'ইৎসিঙের দেখা ভারত' প্রকাশ করেছি এবং সেগুলি পাঠক মহলে যথেষ্ট সাড়া জাগিয়েছে।

আশা করি এ গ্রন্থখানিও অনুরূপ সাড়া জাগাবে এবং পরবর্তী গ্রন্থ প্রকাশে আমাদেরকে আরও উৎসাহিত করবে। পরবর্তী গ্রন্থ 'মানুচির দেখা ভারত' শীঘ্রই বের হচ্ছে।

৪.১.৮১. প্রকাশক

দ্বিতীয় সংস্করণ

এত শীঘ্র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করার প্রয়োজন হল যে উৎসাহী পাঠক বর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁদের কথা স্মরণে রেখেই সমস্ত জিনিসের দাম বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও চেষ্টা করা হ'ল বইখানির দাম যথাসাধ্য কম রাখতে।

আনন্দের কথা "মানুচির দেখা ভারত" ছাড়াও এর মধ্যে প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে এই গ্রন্থমালার আরও তিনখানি বই— "তিব্বতী পরিব্রাজকদের দেখা ভারত", "হিউয়েন সাঙের দেখা ভারত" "লিনসকোটেনের দেখা ভারত"। শীঘ্রই বের হবে আরও কয়েকখানি।

অক্টোবর, ১৯৮৩ প্রকাশক

॥ ইবন বাতুতা ও তার 'রেহলা' ॥

ইবন বাতুতা তার জীবনে প্রায় একটানা ৭৭৬৪০ মাইল ভ্রমণ করেছেন। এর মধ্যে ভারতবর্ষ, মালদ্বীপপুঞ্জ এবং সিংহল (আধুনিক শ্রীলঙ্কা) অঞ্চলে ১৪,৩১৮ মাইলেরও বেশি। ইসলাম জগতের তৎকালীন সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ দেশগুলিই ঘুরে দেখেছেন তিনি। গেছেন প্রত্যেক মুসলিম শাসকের দরবারে। বেড়িয়েছেন কনস্তান্তিনোপল, সিংহল ও চীনের মতো অ-মুসলিম দেশগুলিতেও। যে যুগে তিনি এ ভ্রমণ করেছেন, সে যুগে ছিল না ভ্রমণ জিনিষটি মোটেই সহজ কাজ, রেল কি বিমানে চড়ে আরামী মানুষের প্রমোদ-বিলাস। ছিলনা সেদিন মোটর, রেল, বিমান কিংবা আধুনিক উন্নত মানের সড়ক পথও। ছিলনা সাগর যাত্রাও বর্তমানের মতো নিরাপদ। পথে ছিল যেমন হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের ভয়, তেমনি জন্তু-জানোয়ারের চেয়েও শতগুণ হিংস্র ও নিকৃষ্ট ধর্মান্ধ উগ্র সাম্প্রদায়িক, ও জাতি বিদ্বেষীদের ভয়। লুটেরা ও দস্যুদের ভয়। এছাড়া প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতা তো আছেই। তাই মরণকে তুচ্ছ ও উপেক্ষা করেই ভ্রমণ-বিলাসী হতে হতো সে-কালে। এগোতে হতো পদে পদে হাজার বেশে ওত পেতে থাকা মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষে। এ হেন পরিবেশের মধ্যে ইবন বাতুতার মতো এরূপ সুদীর্ঘ পথ ভ্রমণ ক'রে অক্ষত শরীরে জীবন নিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসা এক অকল্পনীয় কৃতি। এদিক থেকে ইবন বাতুতা অবশ্যই মরণজয়ী বীর আখ্যা পাবার যোগ্য। শুধু তিনি কেন, সে যুগের প্রত্যেক সুদীর্ঘ পর্যটনকারীই। এই সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমা সম্পূর্ণ করার জন্য ইবন বাতুতাকে বারবার পাড়ি দিতে হয়েছে খরস্রোত নদীধারা, অগ্নিময় ধু-ধু মরুভূমি, দুর্গম ও বিপদ-সংকুল সংকীর্ণ গিরি-সংকট, বাত্যা বিক্ষুব্ধ উত্তাল ও অজানা সাগর। বহু সময়েই পথ চলতে হয়েছে তীব্র শীত ও তুষারপাত কিংবা উৎকট গরম ও উষ্ণ বায়ু প্রবাহের মধ্য দিয়ে।

সে যুগের অন্ধকার আফ্রিকার ওপর তিনি যে আলোকপাত ক'রে গেছেন আধুনিক বিশেষজ্ঞরাও প্রথম শ্রেণীর গুরুত্ব আরোপ ক'রে থাকেন তার ওপর। অ্যারাবীয়া, বুখারা, কাবুল, গান্ধার, ভারত, সিংহল, সুমাত্রা ও চীনের ভূ-পরিচয় ক্ষেত্রেও তার 'রেহলা' মধ্যে উপস্থিত বর্ণনার গুরুত্ব কম নয় কিছু। মালদ্বীপপুঞ্জের

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস ক্ষেত্রেও তার বিবরণ মূল্যবান। আফ্রিকা ভ্রমণ করেছেন তিনি দুটি ভিন্নমুখি দিক ধরে। প্রথমত: উত্তর থেকে দক্ষিণে, দ্বিতীয়ত: পূব থেকে উত্তর-পূবে। ঐ অঞ্চলগুলি সম্পর্কে যে সব তথ্য তিনি দিয়ে গেছেন তার সাথে আধুনিক অভিযাত্রীদের সংগৃহীত তথ্যের সাম্য রয়েছে প্রায় সবদিক থেকেই।

বাতুতা ছিল এই মরণজয়ী পর্যটকের বংশীয় নাম। ব্যক্তিগত নাম মহম্মদ। পৈত্রিক পদবী আবু আবদুল্লা। পিতার নাম আবদুল্লা ইবন মহম্মদ। ইবন বাতুতা নিজে অন্য কতক নামেও ছিলেন পরিচিত। কেউ কেউ ডাকতেন তাকে শামস-উদ-দীন বলে। অনেকে উল্লেখ করতেন আবার অল-মঘরিবী বা পশ্চিম দেশবাসী রূপে। কেউ কেউ ডাকতেন আবার মৌলানা বদর-উদ-দীন নামে। মরক্কোর তাঞ্জিয়ের-এ জন্ম হয়েছিল তার। জন্ম তারিখ ২৪ ফেব্রুয়ারী ১৩০৪ খ্রীষ্টাব্দ। মারা গিয়েছিলেন, যতদূর জানা যায়, ৭৪ বছর বয়সে, মরক্কোর ফেজ-এ। তার পিতৃপুরুষেরা পূর্বে বাস করতেন লওয়াতে। পরে কয়েক পুরুষ আগে চলে আসেন সেখান থেকে তাঞ্জিয়ের। বংশীয় পেশা হয়ে উঠেছিল বিচার-বিভাগীয় কর্ম (কজা) ও দাতব্য-সংস্থা পরিচালনা (মশীখত)। ইবন বাতুতার মধ্যে তীব্রভাবে সঞ্চারিত হয়েছিল ভ্রমণের নেশা, অজানা দেশকে জানার, নতুন নতুন দেশ ও গমন পথ আবিষ্কারের আকাঙ্খা। দেখা দিয়েছিল তার মধ্যে তীব্র ধর্মীয় প্রবণতা, সাধু-সন্ত-ফকীরদের দর্শন ও তীর্থ-স্পৃহা। বহুবার হজ করেছেন তিনি, করেছেন মুসলিম জগতের অন্যান্য তীর্থভূমি এবং সাধু-সন্তদের সমাধিস্মারক দর্শন। তার পঁচিশ বছরেরও অধিক ভবঘুরে জীবনকে বিভক্ত করা চলে পাঁচটি পর্বে।

প্রথম পর্ব : ১৩২৫-১৩৩৩

২১ বছর বয়সে ঘর ছাড়েন ইবন বাতুতা। সন-তারিখের হিসাবে দিনটি ছিল ১৪ই জুন ১৩২৫। তাঞ্জিয়ের থেকে রওনা হলেন মক্কা যাবেন বলে। পথে, ৫ই এপ্রিল ১৩২৬-এ পৌঁছলেন এসে আলেকজেন্ড্রিয়ায়। ঘুরে ঘুরে দেখলেন দর্শনীয় স্থানগুলি। দেখা করলেন দুজন খ্যাতনামা সন্তের সঙ্গে। এদের একজন হলেন বুরহান-উদ-দীন অল আরজ।

আলেকজেন্ড্রিয়ার পর যাত্রা করলেন হেজাজের দিকে। পথে দর্শন করলেন একে একে কায়রো, জেরুজালেম, ত্রিপোলি, ও, অন্তিয়োক। ১৩২৬-এর ৯ই

আগষ্ট পৌঁছলেন এসে দমস্কাস-এ। তারপর আবার পথের ডাকে সাড়া দিয়ে এলেন মদিনা ও মক্কায়। করলেন সেখানে হজ সম্পূর্ণ। করলেন তারই মাঝে বহু সন্তের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ। আবার পথ হাতছানি দিল তাকে। ১৭ই নভেম্বর ১৩২৬। ত্যাগ করলেন মক্কা। এলেন ইরাক। দর্শন করলেন নজফ ও করবলার পুণ্য স্মৃতি-স্মারকগুলি। তারপর ইরানে এক সংক্ষিপ্ত ভ্রমণ সেরে এলেন আবার ইরাকে, ঘুরে ঘুরে দেখলেন বাগদাদ। বাগদাদ থেকে আবার মন করলেন মক্কা যাবেন বলে। করলেন যাত্রা। কিন্তু পড়লেন পথে অসুস্থ হয়ে। এসত্ত্বেও অটুট রইল তার সংকল্প। চলতে থাকলেন অসুস্থ শরীর নিয়েই। মক্কায় পৌঁছে ঠিক করলেন থেকে যাবেন সেখানেই। তিন বছর রয়ে গেলেন সেখানে তিনি। অধ্যয়ন করলেন সেখানকার সন্তদের পাদপীঠে থেকে ইসলামী দর্শন। তাৎপর আবার ডাক দিল তাকে পথ। গেলেন পূর্ব আফ্রিকায়। সেখান থেকে আবার এলেন মক্কায় হজ করার জন্য। তারপর রওনা হলেন ভারতমুখি, পূবদিকে। জাহাজ না পেয়ে থামলেন জেদ্দায়। সেখান থেকে করলেন এবার উত্তরমুখি যাত্রা। দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে এলেন কনস্তান্তিনোপল-এ। তারপর পূর্বমুখি হয়ে এলেন একে একে নিশাপুর, হিন্দু-কোহ পর্বতমালা, হিরাট, কাবুল ও করমাশ। সেখান থেকে আরো এগিয়ে পৌঁছলেন তারপর সিন্ধুতীরে। দিনটি ছিল ১৩৩৩-এর ৮ই সেপ্টেম্বর।

দ্বিতীয় পর্ব : ১৩৩৩-১৩৪২

সিন্ধুনদ পার হয়ে এলেন ইবন বাতুতা জনানী-তে। দেখে বেড়ালেন একে একে শিহওয়ান, লাহরি, বুক্কুর, ও উচ। এলেন মুলতানে। স্থায়ীভাবে বসবাস না করলে হিন্দুস্তান মধ্যে ঢুকতে দেয়া হয় না বলে এখানে সরকারের কাছে অঙ্গীকার-নামা লিখে দিতে বাধ্য হলেন যে এদেশে এসেছেন তিনি স্থায়ী বসবাসের ইচ্ছা নিয়ে চাকুরির সন্ধানে। পেলেন তখন দিল্লী আসার অনুমতি। মুলতান থেকে রওনা হয়ে পথে একের পর এক দেখলেন তিনি অবোহর, আবু বখর, অযোধান, সরস্বুতি, হানসী ও মস্উদাবাদ। সতর্কতা অবলম্বন ক'রে সারা পথটিই এসেছেন তিনি অন্য যাত্রীদের সঙ্গে দলবদ্ধ ভাবে। দিল্লী পৌঁছবার পর যখন সঙ্গীদের গোনা হলো দেখা গেল সংখ্যায় তারা মোট চল্লিশজন। মূল সংখ্যা নিশ্চয়ই ছিল আরো বেশি। কেননা, অবোহর পার হয়ে যে সময় মরুম

মধ্য দিয়ে চলেছেন এমন সময়ে আক্রান্ত হয়েছিলেন তারা তীর-ধনুক ও তরবারি-তে সজ্জিত এক দল হিন্দুর দ্বারা। তখন যে লড়াই হয় তাতে তীর বিঁধে জখম হন তিনি, মারা যান কতক সঙ্গী।

রাজধানী দিল্লীতে আসার পর নিযুক্ত করা হলো তাকে কাজীর পদে। দেয়া হলো দাতব্য সংস্থা পরিচালনার দায়িত্ব (৯ই জুন ১৩৩৪)। পরবর্তী কালে কর্মোপলক্ষে ঘুরে এলেন তিনি সরযূ নদী পার হয়ে অমরোহ ও আফগানপুর (এ আফগানপুর ঘিয়াস-উদ-দীন তুঘলকের মৃত্যুস্থান নয়)। ১৩৩৬-এর আগষ্ট মাসের ঘটনা এ। ১৩৩৮-এ সম্রাট যখন স্বর্গ-দ্বারীতে স্থানান্তর হলেন, গেলেন ১৩৩৯-এ তিনিও সেখানে। আইন-উল-মুল্ক-এর বিদ্রোহ দমন-কল্পে পদক্ষেপ গ্রহণ কালে রইলেন সর্বদা সম্রাটের সঙ্গে সঙ্গে। ১৩৪০-এ সালার মসুদ ঘাজীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য সম্রাটের সাথে গঙ্গা ও সরযূ পার হয়ে গেলেন তার দরগায়। ফিরে এলেন তারপর দিল্লীতে (১৩৪১)। এর কিছুকাল পরেই হলেন তিনি গৃহীজীবন ত্যাগ ক'রে ফকীর, যোগ দিলেন কমাল-উদ-দীন আবদুল্লা অল ঘারীর সম্প্রদায়ে (১৩৪১)। সম্রাট শিহওয়ানে ডেকে পাঠালেন তাকে, প্রভাবিত করার প্রয়াস করলেন সন্ন্যাস ত্যাগ ক'রে আবার চাকুরি গ্রহণের জন্য। রাজী হলেন না ইবন বাতুতা। চাইলেন মক্কা চলে যাবার অনুমতি। ১৩৪১-এর জুলাই মাসে পেয়ে গেলেনও তা। কিন্তু অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ডেকে পাঠালেন আবার সম্রাট, প্রস্তাব দিলেন চীনে দূত হিসাবে যাবার জন্য। ভ্রমণ-তৃষাতুর ইবন বাতুতা রাজী হলেন এতে (সেপ্টেম্বর ১৩৪১)।

দিল্লীতে থাকাকালে তিনি ব্যাপকভাবে লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করেছেন। আগ্রহ দেখিয়েছেন ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস জানার জন্য। করেছিলেন বিয়েও মাদুরার জলাল-উদ-দীন অহশন শাহের কন্যা হুর নসব-কে। তাকে যথেষ্ট ভাল বাসতেন তিনি। জন্মেছিল একটি কন্যাও। কিন্তু পরবর্তী কালে ঘটেছিল তাদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ। মা-মেয়ে দুজন সম্পর্কেই রাখেননি আর কোন খবর তিনি। চীন যাত্রার পূর্ব পর্যন্ত আট বছর মধ্যে আর যে কোন বিয়ে করেছিলেন বলেননি সে-কথা কোথাও। তবে নারী-সঙ্গ বিমুখ ছিলেন না কখনো। বাঁদীরাই ছিল তার প্রধান যৌন-সঙ্গী। ভারত আগমন কালে বুখারার কাছে এক বাঁদী-গর্ভে জন্মেছিল একটি কন্যাও তার। তবে মারা যায় সে দিল্লীতে পৌঁছবার মাত্র দেড় মাস পরেই।

তৃতীয় পর্ব : ১৩৪২-১৩৪৫

চীন যাবার জন্য রাজকীয় প্রতিনিধিদল দিল্লী ত্যাগ করল ১৩৪২-এর ২২শে জুলাই। কিন্তু এক হিন্দু আক্রমণ প্রতিরোধে অংশ নিতে গিয়ে তাদের এগিয়ে চলায় ছেদ পড়ল কয়েল-এর কাছে। এই আক্রমণকারী বাহিনীতে ছিল হাজার খানেক অশ্বারোহী ও হাজার খানেক পদাতিক। তাদের নির্মূল করতে গিয়ে ইবন-বাতুতার দলকেও হারাতে হলো ২৩ জন অশ্বারোহী ও ৫৫ জন পদাতিক। এবং ঘটনাচক্রে তিনি নিজেও হয়ে পড়লেন দলছাড়া। এ অবস্থায় হলেন ৪০ জনের মতো এক কাফেরের দলের হাতে বন্দী। তারা তাকে হত্যার জন্য অর্পণ করল তিন ব্যক্তির হাতে। এদের একজন ও আরেকটি যুবকের সহায়তায় পেয়ে গেলেন শেষ পর্যন্ত মুক্তি তিনি। শুরু হলো এবার অজানা বনাঞ্চল ও জনশূন্য লোকালয় মধ্যে অন্নহীন অবস্থায় দিগভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়ানো। দিন কয়েক অশেষ কষ্ট ভোগের পর উদ্ধার পেলেন এ পরিস্থিতি থেকে তিনি সন্ত দিলশাদ-র সহায়তায়। তিনি তাকে নিয়ে এলেন কয়েল থেকে সামান্য কয়েক মাইল দূরে থাকা তাজপুরে। আবার মিলিত হলেন তিনি অবশিষ্ট দলের সঙ্গে। দল পুনর্গঠন ক'রে হল আবার চীন যাবার জন্য যাত্রা শুরু। একে একে বৃজপুর, কনৌজ, অলাপুর, গোয়ালিয়র, চান্দেরী, ধার, উজ্জয়নী হয়ে পৌঁছলেন তারা দৌলতাবাদ। সেখান থেকে আবার যাত্রা শুরু ক'রে পার হলেন একে একে নন্দুরাবার, কাম্বে ও গোয়া। উপস্থিত হলেন গন্ধার বন্দরে। জাহাজে চেপে এগিয়ে চললেন মালাবার উপকূল বরাবর। দেখলেন একে একে পথে গোগো, হিনাবর, বরসিলোর, ফাকনর, মঞ্জরুর, হিলি, জুরফত্তন, দহফত্তন, ফন্দরয়ন ও কালিকট। কালিকট পৌঁছে চীন যাবার জন্য স্থান সংগ্রহ করা হলো একটি চীনা বড়ো জাহাজ ও ছোট জাহাজ বা ককমে। বড়ো জাহাজটিতে তোলা হলো সব উপহার সামগ্রী। প্রতিনিধি দলের অধিকাংশও ঠাঁই নিলেন তাতে। ইবন বাতুতা ককমে চড়তে গিয়েও উত্তাল সাগর পরিস্থিতির জন্য চড়তে পারলেন না তাতে। পরদিন জানা গেল, ভেঙে তছনছ হয়ে ডুবে গেছে বড় জাহাজটি। ইবন বাতুতার কাছে এ সময়ে সম্বল বলতে একটি কার্পেট ও দশটি টাকা (তঙ্কা)। তার বাঁদীর দল ও সঙ্গের সব জিনিষপত্র ককমটিতে। সেটি নিশ্চয়ই কুইলন বন্দরে থামবে এই আশায় নৌকা ক'রে ছুটলেন সেখানে। কিন্তু পাওয়া গেল না কোন হদিশ-তার। দেখা হল সেখানে তার দেশে ফিরে চলা চীনা

প্রতিনিধি দলের সাথে। তারাও দিল্লী থেকে তাদের সঙ্গেই এসেছিলেন, কালিকট থেকে চেপেছিলেন অপর একটি চীনা বড় জাহাজে। আপন জিনিষপত্র থাকা ককমটির দেখা না পেয়ে ফিরে এলেন ইবন বাতুতা হিনাবরে (২২শে এপ্রিল, ১৩৪৩)। রয়ে গেলেন সেখানে সেখানকার অধিপতি সুলতান জমাল-উদ-দীনের কাছে ২৪শে জুলাই পর্যন্ত। সন্দাপুর অভিযানে সঙ্গীও হলেন তার। নৌ-যুদ্ধ কালে পড়লেন তিনি জীবন-সংশয় মধ্যে। বিপদ কাটাবার জন্য ঝাঁপ দিলেন সাগর জলে, সাঁতরে কোনমতে উঠে এলেন ডাঙায়। এমনকি কোমল প্রাণ ইবন বাতুতাকে দেখা গেল এসময়ে তরবারী নিয়েও যুদ্ধে ও লুটপাটে মেতে যেতে।

সন্দাপুর জয়ের পর সেখানে কিছুদিন কাটিয়ে আবার রওনা হলেন হিনাবর ফেরার জন্য। থামলেন এসে শালিয়াত-এ, ১৩৪৪-এর ১ই জানুয়ারী। সেখানে কিছুকাল থাকার পর ফিরলেন তিনি কালিকট। সেখানে হঠাৎ দেখা হলো চীনগামী ককমটিতে ঠাঁই নেয়া তার দুই বান্দার সাথে। তাদের কাছে খবর পেলেন, তার বাঁদীদের অধিকাংশকে ও তার যাবতীয় সামগ্রী বাজেয়াপ্ত ক'রে নিয়েছেন সুমাত্রার রাজা। এবং তার অন্যান্য অনুচরেরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে চীন, সুমাত্রা ও বাঙলায়। এ খবর পেয়ে মন বিপর্যস্ত হয়ে গেল তার। কি করবেন কিছু স্থির করতে না পেরে মানসিক অস্থিরতা নিয়ে ফিরে গেলেন হিনাবরে। পাড়ি দিলেন আবার তারপর সন্দাপুর (৯ই জুন, ১৩৪৪)। এবং ফিরলেন সেখান থেকে আবার কালিকটে। সিদ্ধান্ত নিলেন মালদ্বীপ ভ্রমণে যাবেন বলে। চাপলেন জাহাজে। ১৩৪৪-এর ৫ই সেপ্টেম্বর নামলেন গিয়ে কন্নলুসে। তারপর সেখান থেকে যাত্রা করলেন মালদ্বীপের রাজধানী মহলে সুলতানা খদীজা ও তার ওয়াজীরের সঙ্গে দেখা করার জন্য। পৌঁছলেন সেখানে ১৮ই সেপ্টেম্বর। অনিচ্ছুক ছিলেন তিনি সেখানে আপন পরিচয় প্রকাশের জন্য। কিন্তু একদল আরব ও পারসিক ফকীর ফাঁস ক'রে দিলেন তা সেখানকার উজীরের কাছে। পরিস্থিতির চাপে পড়ে শেষমেশ বাধ্য হলেন তিনি সেখানকার কাজীপদ গ্রহণে (ডিসেম্বর, ১৩৪৪)। থাকা কালে করলেন সেখানে চারটি বিয়ে। কিন্তু ক্ষমতাসীনদের সাথে মনোমালিন্য দেখা দেয়ায় আগষ্ট ১৩৪৫-এ ছেড়ে দিলেন সে পদ। দুজন স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে রওনা হলেন মালদ্বীপ ত্যাগের জন্য। তৃতীয় জনকে দিলেন তালাক। চতুর্থ জন এসময়ে গর্ভবতী থাকায় করলেন তার সাথে

ন' মাসের জন্য এক চুক্তি। যদি ইতিমধ্যে তিনি আর মালদ্বীপ ফিরে না আসেন দিলেন তাকে সেক্ষেত্রে আপন ইচ্ছা মতো সিদ্ধান্ত নেয়ার স্বাধীনতা। যাত্রাপথে থামলেন এসে মুলুক দ্বীপে। দু'মাস থেকে গেলেন সেখানে। ইতিমধ্যে ঘটনা চক্রে বাধ্য হলেন দুই স্ত্রীকেও তালাক দেয়ার জন্য। করলেন সেখানে আবার অন্য দুজনকে সাময়িক-ভাবে বিয়ে। এ সময়ে যে জাহাজ-সহ তিনি সেখানে অপেক্ষা করে চলছিলেন তাতে থাকা অস্ত্রশস্ত্র অপর্ণের জন্য স্থানীয় ওয়জীর চাপ সৃষ্টি করায় সে সমস্যা সমাধানের জন্য গেলেন আবার তিনি মহলে এবং কয়েকদিনের মধ্যেই ফিরে এলেন আবার মুলুক। ১৩৪৫-এর ১২ই সেপ্টেম্বর নাগাদ তিনি চূড়ান্তভাবে ত্যাগ করলেন মালদ্বীপ।

চতুর্থ পর্ব : ১৩৪৫-১৩৪৮

মালদ্বীপ থেকে মবর ফেরার পথে জাহাজ থামল সিংহলে। দেখা করলেন তিনি স্থানীয় রাজা আর্য-চক্রবর্তীর সঙ্গে। গেলেন আদমের পদচিহ্ন (প্রকৃত পক্ষে বুদ্ধের পদচিহ্ন) দর্শনের জন্যও। তারপর আবার শুরু করলেন যাত্রা। কিন্তু পথে ঝড়ের মুখে পড়ে ডুবে গেল জাহাজ। জনাকয়েক হিন্দু উদ্ধার করলেন তাকে, তাদের নৌকায় ক'রে নিয়ে এলেন তাকে মবর উপকূলে। তারপর গেলেন সেখান থেকে মবরের রাজধানী মাদুরায়। সেখানে সাংঘাতিক ধরনের এক জ্বরে হয়ে পড়লেন শয্যাশায়ী। খেলেন তখন আধসেরের মতো তেঁতুল। ছুটল পেট। তারই ফলে রেহাই পেয়ে গেলেন সেই জ্বরের কবল থেকে। দুর্বল শরীর নিয়েই গেলেন তিনি ফত্তন। তারপর সেখান থেকে কুইলন। চড়লেন হিনাবর-গামী জাহাজে। পথে আক্রান্ত হলো জাহাজ জলদস্যুদের দ্বারা। ফলে খোয়া গেল তার যা-কিছু সম্বল। বহু কষ্টে পৌঁছলেন এসে কালিকটে। ইচ্ছা জাগল সেখান থেকে আবার মালদ্বীপ যাবার। গেলেনও। দেখলেন সেখানে আপন নবজাত পুত্রকে। তার লালনপালন ভার ছেড়ে দিলেন তাদের ওপরেই। তারপর মালদ্বীপ থেকেই চাপলেন বাঙলাগামী জাহাজে। ৪৩ দিন সাগরে কাটাবার পর পৌঁছলেন সেখানে ১৩৪৬-এর জুলাই। পরিদর্শন করলেন চট্টগ্রাম ও লক্ষ্মণাবতী। গেলেন কামরূপের পাহাড়ী অঞ্চলে তাবরিজের বিখ্যাত সাধু শেইখ জলাল-উদ-দীনের সাথে দেখা করতে।

১৩৪৬-এর আগষ্ট মাসে বাঙলা ছেড়ে সোনার গাঁ থেকে চাপলেন সুমাত্রাগামী

জাহাজে। সুমাত্রার রাজা, শাফাই সম্প্রদায় ভুক্ত মুসলমান, মালিক জাহির যথেষ্ট আদর-আপ্যায়ন করলেন তাকে। ক'রে দিলেন চীনগামী জাহাজে চেপে সেখানে যাবার ব্যবস্থা। পথে দেখলেন তিনি জাভা (মূল-জাভা) ও তওয়ালিসী দ্বীপ (মালয়ের তবল দ্বীপ)। (মূল) জাভার 'কাফের' রাজা আরবী ভাষা জানেন না, এজন্য সাহায্য নিতে হয় তাকে দোভাষীর। রাজা ব্যতীত আর কারো অধিকার নেই সেখানে ঘোড়ায় চড়ার। তওয়ালিসী রাজ্যের শাসনকর্ত্রী তখন এক 'কাফের' রানী। নাম তার উরদুজা। এখানে পুরুষদের মতো মেয়েদেরও নাম লেখাতে হয় সেনাবাহিনীতে। স্বাধীন নাগরিকই হোক আর বাঁদীই হোক প্রত্যেক মেয়েকেই। সেখান থেকে যাত্রা ক'রে আরো সতের দিন সাগরে কাটাবার পর পৌঁছলেন তিনি ৎস'ওয়ান-চউ-ফু বা জৈতুন। গেলেন সেখান থেকে সীন জেলা ঘুরে দেখার জন্য। পৌঁছলেন তারপর চীনের রাজধানী খান বালিক বা পিকিং (মার্কো পোলোর 'কামবালুক')। 'কান' বা রাজা ছিলেন না রাজধানীতে তখন। গিয়েছিলেন শিকার-অভিযানে। শিকারকালেই নিহত হলেন তিনি। ফলে রাজ্য জুড়ে যে শোকের ঢেউ ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় তা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ হলো তার।

ফেরার পথে দেখলেন তিনি একে একে খনসু ও কনজনফু। এলেন আবার জৈতুনে। চড়লেন সেখান থেকে জাহাজে। এলেন কালিকট। যাত্রা করলেন সেখান থেকে অ্যারাবীয়া ও ইরানের উদ্দেশ্যে। ঘুরে ঘুরে দেখলেন ধোফার (জফার), মসকাত, শিরাজ, ইস্পাহান, বসরা, নজফ, কুফা ও হিল্ল। পৌঁছলেন দীর্ঘকাল পর ১৩৪৮-এর জানুয়ারীতে আবার বাগদাদে। গেলেন তারপর দমস্কস। তারপর জেরুজালেম ঘুরে দেখে রওনা হলেন কায়রো। সেখানে পৌঁছে আবার তার সাধ হলো মক্কায় যাবার। করলেন যাত্রা শুরু। পৌঁছলেন সেখানে (১৬ই নভেম্বর ১৩৪৮)। এটি মক্কায় তার সপ্তম ও শেষ হজ।

পঞ্চম পর্ব : ১৩৪৮-১৩৫৩

মক্কা থেকে ফিরলেন ইবন বাতুতা আবার কায়রোয়। সেখান থেকে জন্মভূমি মরক্কোয় রওনা হয়ে ১৩৪৯-এর ১২ই নভেম্বর পদার্পণ করলেন তার রাজধানী ফেজ শহরে। কিছুদিন সেখানেই কাটালেন তিনি। তারপর আবার পড়লেন পথের ডাকে বেরিয়ে। গেলেন এবারে স্পেনের দিকে (অ্যাণ্ডালুস)। পথে দর্শন

করলেন একে একে জিব্রল্টার প্রণালী এবং রোণ্ডা, মরবালা ও গ্রানাডা শহর। ফিরে এলেন আবার তারপর মরক্কোয়; মরুরাকুশ হয়ে রাজধানী ফেজ-এ।

কিন্তু বেশিদিন বসে থাকতে পারলেন না চুপ হয়ে। আবার বেরিয়ে পড়লেন পথে। এবার আফ্রিকার নাইজের নদীকূলের নিগ্রোভূমির দিকে। পথে দেখলেন একে একে সিজিলমাস ও তঘাজ শহর। শেষের শহরটিতে দু সপ্তাহের মতো কাটাবার পর রওনা হলেন নিগ্রোভূমির রাজধানী মাল্লীর উদ্দেশে। পৌঁছে দেখা করলেন সেখানকার নিগ্রোশাসক মউসা সুলেইমানের সাথে।

১৩৫৩-র ২৭ ফেব্রুয়ারী মাল্লী ত্যাগ করলেন ইবন বাতুতা। এগিয়ে চলে করলেন নাইজের নদীর মধ্য প্রবাহটির আবিষ্কার। নামকরণ করলেন তার 'নীল' বা 'নিগ্রোভূমির নীল'। এই ভ্রমণ অভিযান কালে একে একে দেখার সুযোগ হলো তার তিমবুকতা, তকদ্দা ও বুদা শহর। ফিরে এলেন তারপর আবার আপন জন্মভূমি মরক্কোয়, রাজধানী ফেজ-এ। এখানেই শেষ হয়েছে ইবন বাতুতার ভ্রমণ, শেষ হয়েছে তার 'রেহলো'-র বৃত্তান্তও। গ্রন্থটি লেখা সমাপ্ত করেছেন তিনি ৩রা ধিলহিজ্জ, ৭৫৬ বা ৯ই ডিসেম্বর, ১৩৫৫ খ্রীষ্টাব্দে। নামকরণ করেছেন তার 'তুহফত-উন-নুজ্জার ফী ঘরাইব-ইল-অমসার ওয়া অজাইব-ইল-অসফার'।

এই তারিখটির পর মৃত্যু পর্যন্ত ইবন বাতুতার জীবন ইতিহাস কিছুই জানা যায় না আর। এ থেকে মনে হয় শেষ জীবনে জন্মভূমিতে তেমন কোন স্বীকৃতি ও সমাদর না পেয়ে নিষ্প্রভ জীবনই কাটাতে হয়েছে তাকে। শোনা যায়, গ্রন্থ-সমাপ্তির পর আরো দীর্ঘকাল বেঁচে ছিলেন তিনি। মারা যান ১৩৭৭-৭৮ অব্দে বা তারই কাছাকাছি সময়ে ফেজ-এ।

তার লিখে যাওয়া গ্রন্থটির সংক্ষিপ্ত রূপ দিয়েছেন ইবন জুজায়ী।

ইবন বাতুতার রেহলা একদিকে যেমন অতি চমকপ্রদ এক জীবন ও ভ্রমণ-কাহিনী, অন্যদিকে তেমন তার সমকালীন ইতিহাসের এক সমৃদ্ধ তথ্য খনি। বিশেষতঃ ভারতবর্ষের ইতিহাস ক্ষেত্রে। এ গ্রন্থে তিনি এখানকার তৎকালীন স্মরণীয় ঘটনাগুলিকেই শুধু স্থান দেননি, ওই সঙ্গে সুদক্ষভাবে তুলে ধরেছেন তার বিচার-ব্যবস্থা, রাজনৈতিক ও সামরিক সংগঠন ও পরিস্থিতি এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সবাক চিত্র। আকর্ষণীয় আলোকপাত করেছেন তৎকালীন ভারতীয় বস্তু সভ্যতা ও প্রশাসনিক কাঠামো-সহ অসংখ্য দিকের বহু খুঁটিনাটি

বিষয়ের ওপর। এর ভেতর ডাক ব্যবস্থা, পরিবহন, রাস্তাঘাট, গোপন খবর সংগ্রহ ব্যবস্থা, কৃষি ও কৃষিজ উৎপাদন, দরবারের রীতি-নীতি ও অনুষ্ঠান, সাধারণ ব্যবসা বাণিজ্য, বন্দর ও নৌ-বাণিজ্য, সমকালীন মানুষ ও তাদের রীতি-নীতি ধ্যান-ধারণা, সঙ্গীতকলা প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখনীয়।

তার মতো একজন জ্ঞানীগুণী এবং ব্যাপক ভ্রমণ থেকে বিভিন্ন দেশ ও মানুষ সম্পর্কে গভীর অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ ব্যক্তির দেয়া এই সমকালীন বিবরণের গুরুত্ব ও মূল্য যথেষ্ট গভীর। বিশেষতঃ উঁচু মহলের সাথে মেলামেশা ক'রে প্রকৃত তথ্যাদি জানার ও দেখার প্রচুর সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি। সত্যের প্রতি অনুরাগ এবং খোলামেলা ভাবে সত্য ভাষণের সৎ-সাহসও যে তার ছিল তার প্রমাণ রেহলা মধ্যে তার নিজের জীবন ও চাল-চলন সম্পর্কে অবাধ বিবরণগুলি। তাছাড়া বিদেশী হয়ে বিদেশে বসে লেখার দরুন তিনি যতো খোলামেলা ভাবে আপন অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করতে পেরেছেন, তা অবশ্যই সম্ভব হতো না শাসকের রক্ত-চক্ষুর নিচে বসে কোন ভারতীয় ঐতিহাসিক বা দরবার-ঐতিহাসিকের পক্ষে। এইসব কারণে ইতিহাসের অন্যান্য ক্ষেত্র ছাড়াও, মহম্মদ বিন তুঘলকের চরিত্র ও তার রাজত্বকালের মূল্যায়নে তার দেয়া তথ্যাদি গভীর ভাবে সাহায্য ক'রে আমাদের।

প্রথম পরিচ্ছেদ

অবশেষে সিন্ধু উপত্যকায় পা রাখলাম। দিনটি ১৩৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই সেপ্টেম্বর। এ অঞ্চলটির নাম পাঞ্জাব বা পঞ্চনদ। পৃথিবীর সব থেকে বড়ো নদী-অববাহিকাগুলির মধ্যে একটি। গ্রীষ্মকালে এই অববাহিকা বন্যায় ভেসে যায়। তখন চাষবাস শুরু হয়। ঠিক যেমনটি নীলনদ অববাহিকায় হয়ে থাকে। এই নদী-তট থেকে হিন্দ ও সিন্ধ-এর সম্রাট মুহম্মদ শাহর রাজ্যসীমা আরম্ভ হয়েছে।

নদীতটে পা ফেলতে না ফেলতেই খবর-কর্মচারী আমাদের কাছে এসে হাজির। খবরা-খবর নিয়ে মুলতান শহরের শাসক কুতব-উল-মুল্কের কাছে আমাদের আসার খবর পাঠালো। এ সময়ে সিন্ধুর মুখ্য শাসক ছিলেন স্থলতানের ক্রীতদাস ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী সরতেজ। তখন তিনি সিন্ধুর শিরস্তান শহরে ছিলেন। এ শহরটি মুলতান থেকে দশ দিনের পথ। স্থলতানের আবাস দিল্লী শহর মুলতান থেকে পঞ্চাশ দিনের পথ। সিন্ধুর কোন শহর থেকে দিল্লীতে স্থলতানের কাছে কোন পত্র দিলে ডাক বিভাগের দৌলতে তা তার কাছে পাঁচ দিনে পৌঁছে যায়।

ভারতে দু'ধরনের ডাক ব্যবস্থা রয়েছে। এক—ঘোড়ায় বয়ে নিয়ে যাওয়া ডাক—যার নাম উলাক। প্রতি চার মাইল অন্তর রাজকীয় ঘোড়া ডাক নিয়ে যাবার জন্য মজুত থাকে। দুই—মানুষে বয়ে নিয়ে চলা ডাক। একে বলা হয় দাওয়। এজন্য প্রতি মাইলে তিনটি ক'রে থানা রয়েছে। মাইলকে ভারতীয়রা কুড়ো বলে। প্রত্যেক ⅓ মাইল অন্তর অন্তর একটি ক'রে জনবসতি ভরা গ্রাম পাওয়া যাবে। গ্রামের বাইরে তিনটি ক'রে মণ্ডপ রয়েছে। সেখানে পোষাক পরা লোক বসে অপেক্ষা করছে, ডাক আসা মাত্র তাকে নিয়ে যাবার জন্য। প্রত্যেক বাহকের হাতে একটি ক'রে দু'হাত লম্বা লাঠি, তার মাথায় একটি ক'রে তামার ঘণ্টা। লোকটি ছুটে চলার সময় ওই ঘণ্টা বাজতে থাকে। পরের মণ্ডপের লোক দূর থেকে ওই শব্দ শোনা মাত্র তার কাছ থেকে ডাক নিয়ে ছোটার জন্য তৈরী হয়। এই ডাক ঘোড়ায় বয়ে নিয়ে যাওয়ার থেকে অনেক তাড়াতাড়ি যায়। এজন্য খুরাসান থেকে নিয়ে আসা ফল প্রায়ই এই

ডাকের মাধ্যমে পাঠানো হয়। খুরাসানের ফলমূলাদির এখানে যথেষ্ট চাহিদা আছে। দুর্দান্ত অপরাধীদেরও ডাকে চালান করা হয়ে থাকে। তাদের কাঠের খাঁচার মধ্যে পুরে বাহকরা মাথায় ক'রে পুরো বেগে বয়ে নিয়ে চলে। এই ভাবে সুলতানের জন্য গঙ্গা থেকে দৌলতাবাদ জলও বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। গঙ্গা নদী দৌলতাবাদ থেকে চল্লিশ দিনের পথ। হিন্দুরা এই নদীতে তীর্থস্নান করতে আসে।

সিন্ধু প্রদেশের রাজধানী মুলতানে যখন কোন নবাগত এসে পৌঁছায়, তখন রাজ আদেশ ও অভ্যর্থনার জন্য তাকে অপেক্ষা ক'রে থাকতে হয়। প্রত্যেক লোক তার প্রতিভা, চাল-চলন ও যোগ্যতা অনুযায়ী সম্মান পেয়ে থাকেন। তার জাতি বা পারিবারিক পরিচয়ের উপর কোন গুরুত্ব দেয়া হয় না।

বিদেশীদের সম্মান দেখানো ভারত সম্রাট আবদুল মুজাহিদ মুহম্মদ শাহর একটি বিশেষ গুণ। তিনি তাদের মধ্যে গুণী লোকদের প্রদেশ শাসক ও অন্যান্য উঁচু পদে নিয়োগ ক'রে থাকেন। তার বিশেষ কর্মাধ্যক্ষ, মন্ত্রী, বিচারক, এমনকি শ্যালকদের মধ্যেও বেশির ভাগই বিদেশী। তার সাম্রাজ্যে বিদেশীদের অইজ্জা বা সম্মানাস্পদ রূপে সম্বোধন করার জন্য তিনি হুকুমনামা জারী করেছেন। প্রত্যেক নবাগতরই সম্রাটকে কিছু না কিছু উপহার দিতে হয়। তার নজরে পড়তে এ উপহার অনেক সময় সাহায্য ক'রে। সুলতান এ উপহারের বিনিময়ে অনেক গুণ মূল্যবান উপহার দিয়ে থাকেন।

সম্রাটের সঙ্গে দেখা করতে চায় এমন নবাগতদের, সিন্ধু ও হিন্দ-এ অনেক ব্যবসায়ী উপহার কেনার জন্য এক হাজার দীনার পর্যন্ত ধার দিয়ে থাকেন। এমনকি ব্যক্তিগত খরচ-খরচা, সেবা-যত্ন পর্যন্ত এই ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে তারা পায়। এই উপহারের প্রতিদানে সম্রাটের কাছ থেকে যে উপহার পাওয়া যায় তাই দিয়ে নবাগত তার ওই দেনা শোধ ক'রে। এ কারণে ধার দেবার ব্যবসা এখানে রীতিমতো জমজমাট।

সিন্ধ-এ পৌঁছে আমিও ওই পথ ধরলাম। বণিকদের কাছ থেকে কিছু ঘোড়া, উট, সাদা ক্রীতদাস ও আরো অন্যান্য জিনিষ কিনলাম। ঘজনার এক ইরাকী বণিকের কাছ থেকে আগেই আমি তিরিশটি ঘোড়া ও এক বোঝা তীর সহ একটি উট কিনি। সুলতানকে যেসব জিনিষ সাধারণত উপহার দেয়া হয় এগুলি তার একটি।

যখন আমরা সিন্ধু নদ বা পাঞ্জাব পার হই তখন এক জলাভূমির মধ্য দিয়ে যাবার কালে গণ্ডার দেখার সুযোগ পাই। এটি হাতির চেয়ে আকারে ছোট হলেও মাথা কয়েকগুণ বড়ো। রঙ কালো। দু'চোখের মাঝে তিন হাত লম্বা ও এক বিঘত চওড়া শিঙ (খড়্গ) রয়েছে। এই পথে চলার সময়ে আরো একবার এর দেখা পাই। আমরা আক্রমণ করার মতলব করতেই সে পালিয়ে যায়। পরে, আর একবার সম্রাটের সঙ্গে হাতিতে চড়ে যাবার পথেও গণ্ডার দেখার সুযোগ পাই। সুলতানের সেনারা জলাভূমিটিকে ঘিরে গণ্ডারটিকে মেরে মুণ্ডটা কেটে শিবিরে নিয়ে এলো।

সিন্ধু নদ থেকে দু'দিনের পথ পার হয়ে জনানী শহরে এসে পৌঁছলাম। নদী পারের এ শহরটি বেশ বড়ো ও সুন্দর। এখানকার বাজারগুলি বেশ ভালো। অধিবাসীরা সামির গোষ্ঠীর লোক। প্রাচীনকাল থেকে এখানে বাস ক'রে আসছে। হাজ্জাজ-বিন-ইউসুফ সিন্ধু দখলের সময়েও এরা এখানে বসবাস করতো। এরা অন্য লোকের সাথে খানাপিনা করে না, এমনকি তাদের সামনেও খায় না। এরা নিজ গোষ্ঠীর বাইরে বিয়ে করে না, অন্যরাও এদের ঘরে বিয়ে-থা করে না।

জনানী থেকে আবার যাত্রা শুরু ক'রে শিবিস্তান এলাম। এ শহরটির বাইরে মরুভূমি, একমাত্র আকাসিয়া ছাড়া আর কোন গাছই নেই। নদীর দু'ধারে তরমুজ বা কুমড়া জাতীয় ফল ছাড়া আর কোন চাষ হয় না। জনার ও শুঁটি, যার নাম এখানে মুশুক্‌, এই তাদের খাদ্য। এ দিয়ে তারা রুটি বানায়। মোষের দুধ ও মাছ অঢেল মেলে। 'শকান্‌কুর' নামে টিকটিকির মতো এক প্রকার ছোট প্রাণীকে-ও তারা খায়। এর পেটে তারা হলুদ জাতীয় মশলা ভরে দেয়। তাদের এগুলি খেতে দেখে আমার তো ভীষণ ঘেন্না পেলো, আমি খেলাম না। শিবিস্তান যখন এলাম তখন প্রচণ্ড গরম। আমার সঙ্গীরা বলতে গেলে প্রায় উদম হয়ে থাকলো। বার বার একটুকরো কাপড় ভিজিয়ে তা গায়ে জড়িয়ে নিতে লাগলো।

শিবিস্তানে বিশিষ্ট আইনজ্ঞ অলা-উল-মুল্কের সাথে পরিচয় হলো। তিনি এর আগে হীরাটের কাজী ছিলেন, খুরাসানের অধিবাসী। এখন ভারত-সম্রাটের অধীনে কাজ নিয়েছেন। সিন্ধুর লাহরী শহর ও প্রদেশের শাসনকর্তা

হয়ে লাহরী চলেছেন। আমিও তার সঙ্গে যাবো ঠিক করলাম। তিনি ১৫টি জাহাজের বহর নিয়ে সিন্ধু নদের জলপথ ধরে সেখানে চলেছেন।

অলা-উল-মুল্কের জাহাজগুলির মধ্যে একটির নাম অল-অহউরা। আমাদের তীরদা জাতীয় জাহাজের মতো। তবে লম্বায় কিছুটা ছোট ও চওড়ায় সামান্য বড়ো। এর অর্ধেকটা জুড়ে একখানা কাঠের ঘর। মইয়ের সাহায্যে তাতে যেতে আসতে হয়। ঘরের ওপরে আমীরের বসার বিশেষ মঞ্চ। তার সামনে অনুচরেরা বসে, ডাইনে বাঁয়ে দাঁড়িয়ে থাকে দাসেরা। জাহাজটি বয়ে নিয়ে চলেছে চল্লিশজন মাল্লা। তার ডাইনে বাঁয়ে চারখানা জাহাজ। এর দু'খানিতে শাসনকর্তার পতাকা ও ঢাক, ভেরী, শিঙা, বাঁশী ইত্যাদি; অন্য দু'টিতে গায়কের দল। ভোর থেকে খাবার সময় পর্যন্ত পালা ক'রে তারা বাজনা বাজাতো, গান ক'রে চলতো। এরপর সব ক'টি জাহাজকে পাশাপাশি জুড়ে দেয়া হতো। গায়করা আমীরের অল-অহউরায় উঠে আসতো। আমীর যতক্ষণ বসে খেতেন, তারা গান ক'রে চলতো। পরে তারা খেতে বসতো। এরপর আবার যাত্রা শুরু, সন্ধ্যা নামতে জাহাজ নদীকূলে ভিড়তো। সেখানেই শিবির গেড়ে আমীর জাহাজ থেকে নেমে আসতেন। রাতের খাবার সময় সিমাট (কাপড়) বিছিয়ে দলের প্রায় সকলে এক সঙ্গে খানা খেয়ে নিতো। শোবার আগের নমাজ শেষ হলে শুরু হতো সারারাত ধরে শান্ত্রীদের পাহারা দেয়ার পালা। প্রত্যেক দল তাদের পাহারার পালা শেষ ক'রে প্রহর ঘোষণা করতো।

সকালবেলা বাজনা বেজে উঠতো। ভোরের নমাজ জানানো হতো। তারপর জলখাবার খেয়ে নিয়ে শুরু হতো আবার যাত্রা। আমীর যদি জলপথে না গিয়ে স্থলপথে যেতেন তবে বাদকদল পুরোভাগে, তারপর পদাতিক সৈন্য, এরপর আমীর যেতেন। বাদকদের আগে আগে ছ'জন অশ্বারোহী। পথে গ্রাম পড়লে ঢাক ও বাঁশী বাজানো হতো। তারপর সৈন্যদের ভেরী ও শিঙা। বাদকদের ডাইনে বাঁয়ে গায়করা পালা ক'রে গান গাইতেন।

পাঁচদিন চলার পর লাহরী এলাম। মহাসাগর তটে এটি একটি মন-ভোলানো শহর। একটি বড়ো বন্দরও আবার। এখানেই দুই উপসাগরের সঙ্গমস্থল। ফার, ইয়েমেন ও নানান দেশ থেকে লোক আসার ফলে এর সমৃদ্ধি ও রাজস্ব দুই-ই যথেষ্ট বেড়েছে। আমীর আমায় জানালেন, এ শহরের

বার্ষিক আদায় আট লক্ষের মতো। তার ১/২০ ভাগ তিনি পান। সম্রাট এই হারে তার কর্মচারীদের ওপর আঞ্চলিক শাসনভার অর্পণ করেন।

একদিন অলা-উল-মূল্কের সাথে ঘোড়ায় চড়ে তারণ উপত্যকায় (মোরা-মারী) এলাম। জায়গাটি শহর থেকে সাত মাইল দূরে। দেখলাম সেখানে পাথরের অসংখ্য মূর্তি ও জীবজন্তু। অনেক মূর্তিরই মূল চেহারা ক্ষয়ে গেছে। কয়েকটির শুধু মাথা বা পা—এরকম অংশ-বিশেষ মাত্র রয়েছে। পাথরে গড়া গম, শুঁটী, মসুর, শিম প্রভৃতি নানা শস্যদানাও চোখে পড়লো। বাড়ির ভিত ও দেয়াল, দুর্গের পাঁচিল ও পেছনের টিপি প্রভৃতির অবশেষ এখনো বর্তমান। একটি বাড়ির ভাঙা স্তূপ আমাদের দৃষ্টি কাড়লো। সেদিকে এগিয়ে গেলাম। দেখলাম কাটা পাথরে তৈরী একখানা ঘর এখনো টিঁকে আছে। দেখলে মনে হবে যেন একখানি আস্ত পাথরে তৈরী। ঘরের ওপরে একটি মানুষের মূর্তি। তার মাথাটি লম্বা, ঠোঁট দু'টি মুখাবয়বের একপাশে, হাত দু'টি পিছন দিকে বন্দীর মতো। একটি পুকুরও রয়েছে সেখানে। তা থেকে তীব্র দুর্গন্ধ ভেসে আসছে। কতকগুলি দেয়ালে হিন্দি অক্ষরে লেখা খোদাই করা রয়েছে। অলা-উল-মূল্ক আমায় জানালেন: ঐতিহাসিকেরা মনে করেন, এখানে আগে একটি বড়ো শহর ছিল। তার অধিবাসীরা খুব দুর্দান্ত প্রকৃতির ছিলেন। এ জন্যে (দৈব রোষে) পাথরে পরিণত হয়েছে। বাড়িটির ওপরের মঞ্চে যে বিকৃত মানুষ মূর্তিটি রয়েছে, সেটি তাদের রাজার মূর্তি। এ বাড়িটিকে লোকেরা এখনো 'রাজবাড়ি' বলে। হিন্দি অক্ষরে লেখা বিবরণগুলিতে এ শহরের মানুষদের ধ্বংসের ইতিহাস লেখা রয়েছে বলে মনে করা হয়। আজ থেকে প্রায় হাজার বছর আগে এটি ধ্বংস হয়ে যায়।

পাঁচদিন লাহরীতে কাটিয়ে বুক্কুর (বকার) শহরের দিকে রওনা হলাম। সুবাদার অলা-উল-মূল্ক আমার যাত্রার জন্য সবকিছু দরাজ হাতে যুগিয়ে দিলেন। এই চোখ জুড়ানো শহরটিতে সিন্ধু নদের একটি খাল পেরিয়ে যেতে হয়। এই খালের মাঝে একটি ভালো সরাইখানা রয়েছে। এখানে ভ্রমণ-কারীদের খাওয়ানো হয়। কিজলু খান সিন্ধুর শাসক থাকা কালে এটি বানান। বুক্কুর থেকে সিন্ধু নদ তীরে উচ (উজ) শহরটিতে এলাম। শহরটি বেশ বড়োসড়ো, নতুন বাড়ি ঘর, ভালো ভালো বাজারও রয়েছে। শাসনকর্তা তখন মালিক শরীফ জলাল-উদ-দীন অল-কীজী। তিনি নিঃসন্দেহে একজন

সাহসী, উদারমনা ও বিদ্বান ব্যক্তি। তার সঙ্গে খুব ভাব জমে গেল। পরে দিল্লীতে আবার তার দেখা পেয়েছিলাম। ওই সময় সুলতান রাজধানী ছেড়ে দৌলতাবাদ যান। আমাকে রাজধানীতেই থাকতে বলে গেলেন। জলাল-উদ-দীন তখন আমায় বললেন: 'সুলতান অনেক দিন বাইরে থাকবেন। তোমার এদিকে নিজের খরচ চালাবার জন্য অনেক টাকার দরকার হবে। তুমি আমার গ্রামটি নাও। যতদিন আমি না ফিরি, সেখানকার আদায় দিয়ে তোমার খরচ-খরচা চালাও।' আমি তাই করলাম। সেখান থেকে প্রায় ৫০০০ দীনারের মতো নিলাম। এই উপকারের জন্য, তিনি যেন ভগবানের কাছ থেকে সেরা প্রতিদান পান।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

উচ থেকে সিন্ধু প্রদেশের রাজধানী মুলতান শহরে চলেছি। শহর থেকে দশ মাইল আগে খুসরাবাদ নদী। নদীটি বড়ো, নৌকা ছাড়া পার হবার উপায় নেই। এখানে যাত্রীদের মালপত্র তল্লাসী ক'রে দেখে। মুলতানে এসময়ে বণিকদের কাছ থেকে এক চতুর্থাংশ কর আদায় করা হতো। প্রত্যেকটি ঘোড়ার জন্য আদায় করা হতো ৭ দীনার। দু'বছর পরে এ নিয়ম পালটে 'জকাৎ' ও 'উষর' করের চলন হয়। অব্বাস বংশীয় খলিফা আবুল অব্বাসের সঙ্গে মৈত্রীর পর এই নিয়ম চালু করা হয়েছিল।

আমার মালপত্র তল্লাসী হবে এটা আমার পছন্দ হলো না। অবশ্য আমার ধন-সম্পদ বিশেষ ছিল না। ভাগ্যক্রমে মুলতানের শাসনকর্তা কুতব-উল-মুল্কের প্রতিনিধি প্রধান সামরিক অধিকর্তা এসে হাজির। তার আদেশে আর তল্লাসী করা হলো না। রাতটুকু আমরা নদীর পারেই কাটালাম। পরের দিন ডাক অধ্যক্ষ (মালিক-উল-বরীদ) দিহকান এলেন। তিনি সমরকন্দের লোক। এ শহরে কে এলো, কী ঘটলো সব খবর তাকেই সুলতানের কাছে জানাতে হয়। তার সঙ্গে পরিচয় হলো। তিনি আমাকে মুলতানের শাসনকর্তার কাছে নিয়ে গেলেন।

মুলতানের সুবাদার কুতব-উল-মুল্কের সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে আমায় অভ্যর্থনা জানালেন। শুভেচ্ছা বিনিময় হলো। আমায় পাশে নিয়ে বসালেন। আমি তাকে একটি দাস, একটি ঘোড়া, কিছু কিস্‌মিস ও বাদাম উপহার দিলাম। ভারতের শাসকদের উপহার দেবার পক্ষে এগুলি সেরা জিনিষ। কেননা, এর একটিও এখানে নেই—খুরাসান থেকে আনাতে হয়।

গালিচা বিছানো মঞ্চের ওপর সুবাদার বসে আছেন। তার কাছে কাজী ও খতীব, ডাইনে বাঁয়ে সামরিক প্রধানেরা। পিছনে সুসজ্জিত যোদ্ধারা দাঁড়িয়ে। সৈন্যরা তার সামনে দিয়ে কুচকাওয়াজ ক'রে বেরিয়ে গেল। কাছে অনেকগুলি নানা রকমের ধনুক রয়েছে। যারা তীরন্দাজ সৈন্যদলে নাম লেখাতে চায় তাদের যোগ্যতার পরীক্ষা নেয়ার জন্য। অশ্বারোহী সেনাদলে

আসতে চাইলে তার দক্ষতার পরিচয় নেবার জন্যও একটি ঢাক রাখা হয়েছে। প্রার্থীকে ঘোড়া ছুটিয়ে এটিকে বর্শা দিয়ে বিঁধতে হবে। ছোট্ট একটি দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে একটি চাকতিও। অশ্বারোহী এর কাছাকাছি ঘোড়া ছুটিয়ে এসে বর্শা বিঁধিয়ে চাকতিটি তুলে নিতে পারলে, সে খুব ভালো অশ্বারোহী বলে বিবেচিত হবে। যদি কেউ অশ্বারোহী তীরন্দাজ হতে চায়, তাকে পরীক্ষার জন্য একটি গোলক রাখা হয়েছে মাটিতে। ঘোড়ায় চড়ে সেটি তাক ক'রে তীর ছুঁড়তে হবে। যারা সেনাদলে যোগ দেবার সুযোগ পায়, দক্ষতা অনুসারে তাদের মাইনে ঠিক করা হয়।

মুলতান আসার দু'মাস পরে একদিন সুবাদারের ঘরোয়া কর্মচারী ও কোতোয়াল (পুলিশ প্রধান) এসে, আমার এদেশে আসার উদ্দেশ্য জানতে চাইলেন। জবাব দিলাম : 'খুন্দ-আলম' (পৃথিবীপতি)-এর কাছে চাকরি করতে এসেছি। সুলতানকে তাঁর রাজ্য মধ্যে এই বিশেষণে সম্বোধন করা হয়। ভারতে থাকার ইচ্ছে নিয়ে যারা আসবে তাদের ছাড়া আর কোন খুরাসানী বা বিদেশীকে এদেশে ঢুকতে দেয়া হবে না, এমন এক আদেশ সম্রাট জারী ক'রে দিয়েছেন। আমি থাকার ইচ্ছা দেখানোয় তারা কাজী ও উদুল (দলিল নিবন্ধকার) দের ডেকে পাঠালেন। আমাকে ও আমার যে সব সঙ্গী ভারতে থেকে যেতে চান, তাদের দিয়ে চুক্তিপত্র লিখিয়ে নিলেন।

আমরা এবার দিল্লী যাবার জন্য তৈরী হলাম। উর্বর, জনবসতি ভরা অঞ্চলের মধ্য দিয়ে ৪০ দিনের পথ চলতে হবে। আমাদের দলের বিশিষ্ট ব্যক্তি হলেন তিরমিধের কাজী কিয়াম-উদ-দীন। ঘরোয়া কর্মচারী ও তার দলবল তাকে আপ্যায়নের জন্য সবরকম ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত রইলো। মুলতান থেকে তারা ২০ জন রাঁধুনীকে সঙ্গে নিলেন। ঘরোয়া কর্মচারী রাঁধুনীদের নিয়ে প্রতি রাতে আগে আগে এগিয়ে গিয়ে কাজীর জন্য রান্নার ব্যবস্থা করতেন।

মুলতান ছাড়ার পর প্রথম যে শহরে পা রাখলাম তার নাম অবোহর (পাঞ্জাবের ফিরোজপুর জেলায়)। এটি হিন্দের প্রথম শহর। ছোটখাটো, সুন্দর, বেশ ঘনবসতি ভরা শহর। নদী আর গাছপালায় চোখ জুড়ানো চেহারা। আমাদের দেশের গাছ বলতে একমাত্র **zizyphus lotus,** কিন্তু ভারতের এই ফলগুলি খুব বড়ো। তার বিচি আকারে **gall-nut** এর

মতো ও খেতে বেশ মিষ্টি। ভারতে এমন অনেক গাছপালা আছে, যা আমাদের দেশে বা অন্য কোন দেশে নেই। যেমন: আম, কাঁঠাল, নারঞ্জ, জাম, মহুয়া, কসেরা ইত্যাদি।

আঙুর এখানে খুব কম ফলে। একমাত্র দিল্লীর কতক অঞ্চলে দেখা যায়। আমাদের দেশে যেসব ফলের ফলন হয় তার মধ্যে ডালিম এখানে দেখা যায়। মালদ্বীপে আমি সারা বছর ডালিম হতে দেখেছি। ভারতীয়রা একে আনার বলে।

ভারতীয়রা বছরে দু'বার ফসল বোনে। একবার, গ্রীষ্ম ঋতুতে যে সময় বর্ষা হয়। তখন তারা শারদীয় ফসল বোনে। ষাট দিন পর ফসল পাকে। এই ফসলের মধ্যে একটি হলো—কুধরু। এটি এক রকমের জোয়ার। সব ফসলের মধ্যে এর চাষ বেশী। (২) কাল—এটিও জোয়ারের মতো। (৩) সামাখ—আকারে কালের চেয়ে ছোট। চাষ ছাড়াও এগুলি জন্মাতে দেখা যায়। সাধু সন্ন্যাসী, গরীব ও ভিখারীদের এটি প্রধান খাদ্য। যেগুলি বিনা চাষে জন্মায় এরা ঘুরে ঘুরে তা সংগ্রহ করে। প্রত্যেকে বাঁ হাতে একটি ক'রে ঝুড়ি নেয়, ডান হাতে একখানি চাবুক। এটি দিয়ে ফসলের গায়ে ঘা দিলেই ঝুড়িতে ঝরে পড়তে থাকে। এভাবে এরা বছরের খোরাক জোগাড় করে। (৪) মাষ—এক ধরণের ডাল। (৫) মুগ—এক ধরণের মাষ। এর সাথে চাল মিলিয়ে কিশরি (খিচুড়ি) বানায়। খাবার সময় ঘি মিশিয়ে নেয়। এদিয়ে প্রত্যেকদিন তারা সকালের জলখাবার করে। (৬) লোবীয়া—এক রকম শিম। (৭) মুদে (Mote)—কুধরুর মতো দেখতে, তবে আকারে ছোট। এটি সাধারণতঃ প্রাণীখাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

বসন্ত কালের ফসল হলো গম, যব, মটর, কলাই, মসুর। যে জমিতে শারদীয় ফসল হয়, সেই একই জমিতে ওইসব ফসল বোনা হয়। দেশটি অতি চমৎকার, জমিও উর্বরা।

ধান বছরে তিনবার বোনা হয়। এটি এখানকার প্রধান খাদ্যের মধ্যে একটি। তিল আর আখের চাষও হয়। এবং শারদীয় ফসলের সঙ্গে একই সময়ে।

এবার আমরা অবোহর শহর থেকে একটি মরুভূমির মধ্য দিয়ে চললাম। এটি পার হতে পুরো এক টিদিন লাগলো। এর পাশ বরাবর বিরাট আকাশ ছোঁয়া

পর্বতমালা। এখানে কাফেররা বাস করে। এরা প্রায়ই পথে নানা বিপদ ঘটায়। ভারতের অধিবাসীরা প্রায় সকলেই কাফের। তাদের মধ্যে কতক মুসলমান-অধীন প্রজা হিসাবে গ্রামে বাস করে। তারা একজন মুসলমান প্রশাসকের অধীন। এর নাম হলো হাকিম। তিনি আবার একজন 'আমিল' বা খদীম-এর অধীন। গ্রামটি তারই 'ইকতা'-র মধ্যে। যে সব কাফের অধীনতা মেনে নেয়নি তারা পাহাড়ী এলাকায় জোটবদ্ধ ভাবে থেকে যুদ্ধ ক'রে চলেছে। ওত পেতে থেকে, আচমকা হানা দিয়ে লোকজনের ওপর উপদ্রব করে।

পথে আমরা এরকম এক হানাদার দলের খপ্পরে পড়লাম। এ ব্যাপারে ভারতে এই আমার প্রথম অভিজ্ঞতা। মূল দলটি ভোরবেলা বেরিয়ে পড়েছিল। আমরা ২২ জন অশ্বারোহী দুপুর নাগাদ বের হলাম। আমাদের মধ্যে কতক আরব, কিছু পার্শী, কতক তুর্কী। মরুভূমির মধ্যে হঠাৎ দু'জন অশ্বারোহী ও ৮০ জন পদাতিক কাফের আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। আমার সঙ্গীরা ছিল সাহসী ও কষ্টসহিষ্ণু। তারা জোর লড়াই করলো। আমরা একজন অশ্বারোহীকে মেরে ফেলে তার ঘোড়াটি ছিনিয়ে নিলাম। খতম করলাম ১২ জন পদাতিককেও। আমার গায়ে একটি আর আমার ঘোড়ার গায়েও একটি তীর বিঁধেছিল। তবে তীরের গতি ততো তীব্র না থাকায় ভগবানের কৃপায় কারো জখম গুরুতর নয়। আমার এক সঙ্গীর ঘোড়াটিও জখম হলো। ছিনিয়ে নেয়া ঘোড়াটি দেয়া হলো তাকে। জখমী ঘোড়াটিকে মেরে সঙ্গের তুর্কীরা তার মাংস খেলো। মৃত কাফেরদের মাথা কেটে আবু-বক-হর দুর্গে নিয়ে গেলাম। সেখানে শহরের দেয়ালের ওপর সেগুলি টাঙিয়ে দেয়া হলো। মাঝরাতে আমরা দুর্গে পৌঁছেছিলাম।

দু'দিন পরে একটি ছোটখাটো শহর অজোধনে (বর্তমান পাকপত্তন) পৌঁছলাম। পুণ্যবান শেখ ফরীদ-উদ-দীন এর মালিক। আমি তার সঙ্গে দেখা ক'রে ফিরছি। দেখি, পথে অনেক লোক হন হন ক'রে চলেছে। এদের সাথে আমার কিছু সঙ্গীও রয়েছে। কারণ জিজ্ঞাসা করতে বললো : একজন হিন্দু কাফের মারা গেছে। তাকে দাহ করার জন্য চিতায় আগুন দেয়া হয়েছে। তার বউ নিজেও তার সাথে পুড়ে মরবে। সঙ্গীরা সে দৃশ্য দেখে ফিরে এসে আমায় জানালো বউটি পুড়ে শেষ না হওয়া পর্যন্ত স্বামীর মৃতদেহটি জড়িয়ে

ধরে ছিল। এরপর ভারতে এ দৃশ্য প্রায়ই দেখেছি। সুন্দর বেশভূষায় সেজেগুজে কাফের রমণী ঘোড়ায় চেপে চলেছে। তার পিছু পিছু মুসলমান আর কাফের দর্শকদের ভিড়। ঢাক ও শিঙা বাজিয়েরা চলেছে আগে আগে। হিন্দুদের মধ্যে যারা সেরা—সেই ব্রাহ্মণেরা চলেছে তার সঙ্গে। সুলতানের সীমানায় যখন এরূপ ঘটনা ঘটে, তখন তারা এর জন্য অনুমতি চায়। তিনিও অনুমতি দেন। এরপর তারা দাহ করে।

স্বামীর সাথে স্ত্রীর সহমরণ বাধ্যতামূলক নয়। তবে একে এক আদর্শ কাজ বলে মনে করা হয়। এতে পরিবারের সম্মান বাড়ে। যে এভাবে সহমরণে যায় তার সতীত্বের খ্যাতি ছড়ায়। যারা সহমরণে যায় না সেসব বিধবারা মোটা কাপড় পরে, কঠোর সংযমের মধ্যে জীবন কাটায়। এদের সতীত্বকে সম্মানের চোখে দেখা না হলেও, সহমরণে বাধ্য করা হয় না। একবার অমজরী (দিল্লীর কাছে অমঝের) শহরে তিনজন মহিলাকে আমি 'সতী' হতে দেখেছিলাম। তাদের স্বামীরা যুদ্ধে মারা যান। তিনজন মহিলার প্রত্যেকেই দামী সাজপোষাকে ও সুগন্ধি দ্রব্যে সেজেগুজে ঘোড়ার পিঠে চাপলেন। প্রত্যেকের ডান হাতে একটি ক'রে নারকেল, বাঁ হাতে একখানি ক'রে দর্পণ। বামুন ও আত্মীয়রা এদের ঘিরে রয়েছে। আগে আগে ঢাক, ভেরী ও শিঙা বাজিয়ে চলেছে বাজনাদারেরা। কাফেরদের প্রত্যেকে তাদের বলছিল: আমার বাবাকে, আমার ভাইকে, মাকে বা অমুকের সঙ্গে সেখানে দেখা হলে আমার প্রণাম জানিও। মহিলারা 'হ্যাঁ' বলে হাসিমুখে তাদের সম্মতি জানাচ্ছিল। কীভাবে তাদের পোড়ানো হয় তা দেখার জন্য সঙ্গীদের নিয়ে আমিও তাদের পিছু পিছু গেলাম। তিন মাইল খানেক যাবার পর একটি অন্ধকার জায়গায় তারা এলো। জায়গাটিতে অনেক জল আর ঝাঁকড়া গাছপালা। তার মাঝে ৪টি মন্দির রয়েছে। প্রত্যেকটিতে একটি ক'রে পাথরের বিগ্রহ। মন্দিরের কাছে একটি পুকুরে মহিলারা স্নান করলেন। পরণের কাপড়চোপড় গয়নাপত্তর সব একে একে দান ক'রে দিলেন। প্রত্যেকে একখানি ক'রে মোটা সুতীর কাপড় পরে নিলেন। পুকুরের কাছে একটি নিচু জায়গায় আগুন জ্বালা হলো। এতে তিল তেল ঢালা হলো ভালো ক'রে জ্বালাবার জন্য। মহিলাদের আসার অপেক্ষায় বাজিয়েরা দাঁড়িয়ে রইলো। এছাড়া সরু কাঠের আঁটি হাতে জনা-পনেরো ও বড়ো ভারি কাঠ হাতে জনা-

দশেক লোক তৈরী। যাতে মহিলারা আগুন দেখে ভয় না পায়, সেজন্য কিছু লোক একটি কম্বল দিয়ে আগুনকে তাদের কাছ থেকে আড়াল ক'রে রেখেছে। মহিলাদের একজন তাদের কাছ থেকে কম্বলখানা ছিনিয়ে নিয়ে হেসে উঠে বললেন: 'ভাবছো আগুন দেখে ভয় পাব? আমি জানি এখানে আগুন জ্বলছে। সরে গিয়ে তোমরা আমায় একা ছেড়ে দাও।' এরপর সে হাত দুটি জুড়ে কপালের ওপর ঠেকিয়ে আগুনকে প্রণাম জানিয়ে তাতে ঝাঁপ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঢাক, ভেরী, শিঙা বেজে উঠলো। দাহকারীরা মহিলার গায়ে কাঠ ছুঁড়তে থাকলেন। কতক লোক তার গায়ের ওপর ভারী কাঠ চাপিয়ে দিল যাতে তিনি আর নড়াচড়া না করতে পারেন। আর সেই সঙ্গে জুড়ে দিল জোর চীৎকার ও হই হই। এ দৃশ্য দেখে আমি তো একরকম জ্ঞান হারিয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যাচ্ছিলাম। সঙ্গীরা তাড়াতাড়ি আমায় ধরে চোখে মুখে জল দিল। কোন মতে বাড়ি ফিরে এলাম।

ভারতীয়দের মধ্যে জলে ঝাঁপ দিয়ে মরার রেওয়াজ রয়েছে। যে গঙ্গা নদীর জলে তারা পুণ্যস্নান করে, বেশির ভাগ লোক এজন্য সেখানেই ঝাঁপ দেয়। মৃতদেহ পুড়িয়ে ফেলার পর তাদের দেহভস্মও এই নদীতে বিসর্জন দেয়া হয়। একে তারা সুরধুনী বা স্বর্গের নদী বলে মনে করে। যারা এখানে মরতে আসে তারা নদীতে ঝাঁপ দেবার আগে তার সঙ্গের লোকজনকে লক্ষ্য ক'রে বলে: 'ভেবনা যেন, কোন সাংসারিক কারণে বা দুঃখ কষ্টের জ্বালায় আমি মরছি; আমি ভগবানের কোলে ঠাঁই নেবার জন্য যাচ্ছি।'

এবার মূল কথায় ফেরা যাক। আমরা তো অজোধন থেকে রওনা হয়ে চারদিন পর সরসতী (সরস্বতী বা শিরসা) এসে পৌঁছলাম। এটি একটি বড়ো শহর। এ অঞ্চলে একজাতের চমৎকার চালের ফলন হয়, দিল্লীতে তা চালান যায়। এই শহর থেকে প্রচুর রাজস্ব আদায় হয়ে থাকে।

এখান থেকে হানসী শহরে গেলাম। নিখুঁত ভাবে গড়া সেরা শহরের মধ্যে এটি একটি। বেজায় ঘনবসতি। সীমানা ঘিরে সুদীর্ঘ প্রাকার রয়েছে। শুনলাম এটি নাকি তুর নামে এক কাফের রাজার গড়া। তার নামে নানা প্রবাদ আর কিংবদন্তী চলিত রয়েছে।

হানসী ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম। দু'দিন পরে এসে উঠলাম মস্‌উদাবাদ। দিল্লী আর দশ মাইল দূর। তিনদিন কাটালাম এখানে।

সুলতান তখন রাজধানীর বাইরে। কনৌজের গ্রামাঞ্চল পরিদর্শনে গেছেন। দিল্লী থেকে কনৌজ দশদিনের পথ। রাজধানীতে আছেন শুধু সুলতানের মা মখদুমা-ই-জহান আর উজীর খাজা-জহান। তার আসল নাম আহমদ-বিন-অইয়াজ। জাতে তিনি তুর্কী। উজীর আমাদের সঙ্গে দেখা করার জন্য সমান পদমর্যাদার লোক পাঠালেন। সুলতানের কাছেও আমাদের আগমন সংবাদ জানিয়ে 'দাওয়' ডাকে চিঠি পাঠান হলো। আমরা যে তিনদিন মস্দাবাদ ছিলাম, তার মধ্যেই চিঠি পৌছে তার জবাব চলে এলো।

এরপর আমরা মস্দাবাদ ছেড়ে দিল্লীর পথে রাস্তে এসে পালম গ্রামে (আধুনিক দিল্লীর দক্ষিণ পশ্চিমে) আস্তানা গাড়লাম। এলাম পরদিন সকালে রাজধানী দিল্লী। এটি একটি চোখ-ভোলানো বিশাল শহর। ঘরবাড়ি যেমন সুন্দর তেমন মজবুত। এটি ভারতের সব থেকে বড়ো শহর। প্রাচ্য জগতে মুসলমানদের যতো শহর আছে তার মধ্যেও এটি সব থেকে বড়ো।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আধুনিক দিল্লী শহর অঢেল জায়গা জুড়ে গড়ে উঠেছে। লোক সংখ্যাও বিরাট। বিশাল শহরটির মধ্যে আগেকার চারটি শহর ঠাঁই পেয়েছে। তার একটির নাম দিল্লী। এটি হিন্দুদের গড়া পুরানো শহর। ১১৮৮ খ্রীষ্টাব্দে[১] একে জয় করা হয়। দ্বিতীয় শহরটির নাম সীরী। এটি দার-উল-খিলাফা (খলিফাদের আবাস) নামেও পরিচিত। সুলতান আলা-উদ-দীন ও তার ছেলে কুতব-উদ-দীন এখানে থাকতেন। তৃতীয় শহরের নাম তুঘলুকাবাদ। প্রতিষ্ঠাতা সুলতান তুঘলুক-এর নামানুসারে নাম। বর্তমান সুলতান এরই ছেলে। এ শহরটি গড়ে ওঠার একটি কাহিনী আছে। তুঘলুক একদিন সুলতান কুতব-উদ-দীন-এর সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ওই সময়ে তিনি সুলতানকে বললেন: "খুন্দ আলম! এই জায়গাটিতে একটি শহর গড়ে তোল। আপনার মতো লোকের পক্ষে খুব মানানসই কাজ হবে।" সুলতান ব্যঙ্গ ক'রে উত্তর দিলেন: 'তুমি যেদিন রাজা হবে সেদিন তুমিই বানিয়ো।' বিধাতার বিধান মতো তিনিই রাজা হলেন। তখন তিনি নিজেই শহরটি বানালেন ও এই নামকরণ করলেন। চতুর্থ শহরের নাম জাঁহাপনা। বর্তমান মালিক-ই-হিন্দ সুলতান মুহম্মদ শাহর আবাস হিসেবে এখন এর নামডাক। তিনিই একে গড়ে তোলেন। চারিটি শহর ঘিরে একটি প্রতিরক্ষা প্রাকার গড়ার জন্য তিনি মন করলেন। তার কিছুটা কাজ এগিয়েও নিয়েছিলেন। কিন্তু তা শেষ করবার জন্য যে প্রচুর সম্পদ খরচ হবে তার জন্য এটির কাজ বন্ধ রাখেন পরে।

দিল্লী শহরকে ঘিরে যে প্রতিরক্ষা প্রাকার গড়া হয়েছে তা জগতে অতুলনীয়। এ দেয়াল চওড়ায় ১১ হাত। এর মধ্যে যেসব ঘর রয়েছে তাতে রাতের প্রহরী ও দ্বাররক্ষকেরা থাকে। এর মধ্যেই অম্বার বা খাদ্য ভাণ্ডার, অস্ত্রাগার ইত্যাদি রয়েছে। এই গুদামগুলিতে শস্য অনেক কাল ভালো অবস্থায় মজুত থাকে। একবার আমার চোখের সামনে নব্বই বছর আগে সুলতান বলবন-এর আমলে মজুত করা চাল ও জনার এই গুদাম থেকে বার করা হয়। তখনো সেগুলি ভালো অবস্থায় ছিল। চালের রঙ

১। প্রথম দিল্লী জয়ের তারিখ হিজরী ৫৮৪ বা খ্রীষ্টাব্দ ১১৮৮-এর বদলে ৫৮৭/১১৯১ বা ৫৮৯/১১৯৩ হবে। দিল্লীর কুতব মসজিদে থাকা লেখ থেকে এরকম তথ্যই পাওয়া যায়।

কালচে হয়ে গেলেও খেতে বেশ সুস্বাদু লাগল। এই প্রাকারের ভেতর দিয়ে অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যরা শহরের এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত যাওয়া আসা করতে পারত। এই পথে জানালাও ছিল আর সেগুলি সব শহর-মুখো ক'রে বসানো। এগুলি দিয়ে ভেতরে আলো ঢুকতো। প্রাকারের নিচের অংশ পাথর দিয়ে ও ওপরের ভাগ ইট দিয়ে গড়া। গম্বুজ-গুলি বেশ ঘন ঘন। শহরে মোট ২৮টি ফটক রয়েছে। এর মধ্যে বুদাউন দরওয়াজাটিই সব থেকে বড়ো। মান্দভি দরওয়াজার কাছে শস্য বাজার। গুল দরওয়াজার কাছে অনেক ফুলের বাগান। পালম গ্রামের দিকে পালম দরওয়াজাটি। ঘজনা দরওয়াজাটির বাইরের দিকে ঈদ মসজিদ ও গোরস্থান। বজালসা দরওয়াজার কাছে দিল্লী কবরখানা, এটির পরিবেশ অতি মনোরম। সমাধিক্ষেত্রগুলিকে এরা ফুলগাছ দিয়ে সাজায়। জুঁই, রজনীগন্ধা, বুনো গোলাপ ও আরো নানারকম ফুলে সেগুলি সারা বছর রঙীন থাকে।

দিল্লীর জুমা মসজিদটি বিরাট। এর ছাদ, দেয়াল ও রাস্তা সব কিছু সুন্দর ক'রে কাটা সাদা পাথরে তৈরী। সেগুলি সীসে দিয়ে শিল্পকর্মের আঙ্গিকে জোড়া। পুরো কাঠামোটির কোথাও কাঠ ব্যবহার হয়নি। এর মধ্যে তেরোটি পাথরের মণ্ডপ ও একটি পাথরের বেদী ও চারটি অঙ্গন রয়েছে। মসজিদের মাঝখানে একটি প্রকাণ্ড স্তম্ভ। এটি যে কোন্ ধাতু দিয়ে গড়া তা জানা নেই। কয়েকজন ভারতীয় পণ্ডিত বললেন যে, এটি সাতটি ধাতু মিশিয়ে করা হয়েছে। এই স্তম্ভের এক আঙুলের মতো স্থান মসৃণ করা হয়েছে ও সেই অংশটি খুবই চকচকে। লোহাও এ স্তম্ভের কোন ক্ষতি করতে পারে না। স্তম্ভটি লম্বায় ৩০ হাত, পরিধি ৮ হাত। মসজিদের পূব দরজার কাছে দু'টি খুব বড়ো আকারের পিতলের বিগ্রহ পাথর দিয়ে জোড়া হয়ে শোয়ানো পড়ে আছে। মসজিদে যারা যাতায়াত করে তারা একে মাড়িয়ে যায়। যেখানে এই মসজিদটি উঠেছে, সেখানে আগে একটি মন্দির ছিল। দিল্লী জয়ের পর একে মসজিদ করা হয়। উত্তরের অঙ্গনের দিকে একটি মিনার (কুতব মিনার) রয়েছে। মুসলিম দেশগুলিতে এটির আর জুড়ি নেই। মসজিদের শ্বেত পাথরের বিপরীত রূপে মিনারটিকে লাল পাথর দিয়ে গড়া হয়েছে। গায়ে তার খোদাই কারুকাজ। মিনারটি খুবই উঁচু। ওপরের চূড়াটি সাদা পাথরে তৈরী, গোলকগুলি খাঁটি সোনার। ধাপগুলি এতো

চওড়া যে একটা হাতীও ওপরে উঠে যেতে পারে। একজন বিশ্বাসী লোক আমায় বললো, এটি যখন তৈরী হয় তখন সে একটি হাতীকে এর ওপর পাথর নিয়ে উঠে যেতে দেখেছে। গিয়াস-উদ-দীন বলবনের নাতি, নাসির-উদ-দীনের ছেলে মইজ্জ-উদ-দীন এটি বানিয়েছে।

সুলতান কুতব-উদ-দীন পশ্চিম প্রাঙ্গণের দিকে আর একটি মিনার তৈরী করতে চেয়েছিলেন। এক-তৃতীয়াংশ তৈরী ক'রে তিনি মারা যান। সুলতান মুহম্মদ প্রথমে এটি সম্পূর্ণ করতে চেয়েছিলেন। তারপর অমঙ্গল-সূচক মনে ক'রে সে বাসনা বর্জন করেন। এটি এখনো তাই অসম্পূর্ণ পড়ে রয়েছে। এটির এই একতৃতীয়াংশ উত্তরের পুরো মিনারটির সমান। (আলাউদ্দীন খিলজী আসলে এটি বানান)।

সুলতান কুতব-উদ-দীন সীরী শহরে একটি জুমা মসজিদ বানানোর ইচ্ছা নিয়ে কাজ আরম্ভ করেন। কিন্তু একটি খিলান ও মক্কামুখী একটি দেয়াল ছাড়া আর কিছুই বানিয়ে যেতে পারেন নি। সুলতান মুহম্মদ এটি সম্পূর্ণ করার মন করে মুখ্য স্থপতিদের সেজন্য ব্যয়ের খসড়া করতে বলেন। তারা ৩৫ লক্ষ হিসাব দেয়। কিন্তু তিনি আর এগোলেন না। তার এক বিশেষ কর্মচারী আমায় বলেন যে খরচের ভয়ে নয়, অমঙ্গলের ভয়েই তিনি এটি সম্পূর্ণ করার চেষ্টা করেন নি। কুতব-উদ-দীন এটি শেষ করার আগেই খুন হন। এটি শেষ হলে জগতের এক অতুলনীয় দ্রষ্টব্য হতো।

সুলতান লালমিশের নামানুসারে দিল্লীর বাইরে একটি বিরাট ঝিল তৈরী হয়েছে। এটি দু'মাইল লম্বা ও তার অর্ধেক চওড়া। মাঝে একটি কাটা পাথরের তৈরী দোতলা সমান উঁচু সৌধ বর্তমান। এই জলাধার থেকে সকলে খাবার জল আনে। এটিতে প্রধানতঃ বৃষ্টির জল জমা হয়। ঝিলটি যখন ভরা থাকে তখন নৌকা ছাড়া যাতায়াত করা যায় না, জল নেমে গেলে লোকে হেঁটেও যাওয়া-আসা করতে পারে। সৌধটির মাঝে একটি মসজিদ আছে। সব সময় সেখানে ফকীররা থাকেন। যখন ঝিলের ধারগুলি শুকিয়ে যায়, তখন সেখানে আখ, শসা, তরমুজ, কুমড়া, খরমুজ ইত্যাদি ফলানো হয়। দিল্লী ও দার-উল-খিলাফার মাঝে আর একটি ব্যক্তিগত জলাধার রয়েছে। সেটি এর চেয়েও বড়ো। এর পাশে প্রায় ৪০টি বাড়ি

আছে। সঙ্গীত শিল্পীরা বাস করেন সে মহল্লাটিতে। এ-জন্য এর নাম তরবাবাদ। এখানে যে বাজারটি আছে সেটি পৃথিবীর একটি বড়ো বাজার।

এখানকার সমাধি গৃহগুলির মধ্যে ধর্মপ্রাণ শেখ কুতব-উদ-দীন বখতিয়ার কাকীর সমাধি-সৌধটি বিশিষ্ট।

'মুসলমানেরা ১১৮৮ খ্রীষ্টাব্দে কাফেরদের কাছ থেকে দিল্লী জয় করে।' সিন্ধ ও হিন্দের প্রধান কাজী কামাল-উদ-দীন মুহম্মদ একথা আমায় জানালেন।

জুমা মসজিদের খিলানে থাকা একটি লিপি থেকেও এই তারিখটি আমি পড়ি। সর্দার-ই-জহান (প্রধান কাজী) আমায় আরো বলেন যে আমীর কুতব-উদ-দীন আইবক একে প্রথমে জয় করেন। তিনি তখন সিপাহ-শালার বা সেনাপতি। কুতব-উদ-দীন গজনী ও খুরাসানের মহান সুলতান শিহাব-উদ-দীন মুহম্মদের ক্রীতদাস ছিলেন। শিহাব-উদ-দীন সুলতান গাজী মাহমুদের ছেলে ইব্রাহীম-এর রাজ্য অধিকার করেন। সুলতান মাহমুদের পিতা সবুক্তগীন-ই প্রথম ভারত জয় অভিযানের সূচনা করেছিলেন।

সুলতান শিহাব-উদ-দীন এক বিরাট সৈন্য বাহিনী সহ কুতব-উদ-দীনকে ভারত অভিযানে পাঠান। দৈব সহায়তায় তিনি লাহোর (লাহাউর) জয় ক'রে সেখানেই বসবাস শুরু করেন। সেখানে তিনি বেশ প্রতিপত্তিশালী হয়ে ওঠেন। ঈর্ষুক লোকেরা সুলতানের কাছে তার নামে নানা ক্ষতিকর গুজব রটাতে থাকল। তারা বলতে শুরু করলো যে কুতব-উদ-দীন ভারতে স্বাধীন হবার মতলবে আছে, সে বিদ্রোহ করেছে ও সুলতানের আদেশ অমান্য ক'রে চলেছে।

কুতব-উদ-দীন এসব কান-ভাঙ্গানির কথা জানতে পেরে তাড়াতাড়ি ঘজনা (গজনী) ছুটে গেলেন রাতে সেখানে পৌঁছে তখনি সুলতানের সঙ্গে দেখা করলেন। তার অপবাদকারীরা এর কিছুই জানতো না। পরদিন সকালে সুলতান দরবারে এসে সিংহাসনে বসলেন। আইবককে সিংহাসনের পিছনে এমন ভাবে বসালেন যে তার উপস্থিতি কেউ জানতে পারল না। যে বিশেষ সচিব ও সভাসদেরা তার কুৎসা করছিল তারা এলো ও আসন নিল। তখন সুলতান তাদের কাছে আইবকের কথা জানতে চাইলেন। তারা আগের মতোই বললো—সে বিদ্রোহ করেছে ও সুলতানের আদেশ অমান্য করেছে। সেই সঙ্গে তারা আরো বললো, আমরা প্রমাণ পেয়েছি যে সে পুরো সাম্রাজ্যের ওপর দাবী জানাচ্ছে। সুলতান সিংহাসনে পা দিয়ে আঘাত ক'রে হাততালি দিয়ে

আইবককে ডাকলেন। আইবক ডাকে সাড়া দিয়ে বেরিয়ে এলেন। কুৎসাকারীরা হতভম্ব হয়ে পড়লো, ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল। সুলতান বললেন—এবারের মতো তোমাদের আমি ক্ষমা করলাম। এরপর আর কখনো আইবকের নামে যেন কুৎসা রটনা ক'রো না। সুলতান আইবককে ভারতে ফিরে যেতে বললেন। তিনি ফিরে এসে এবার দিল্লী জয় করলেন ও সেই সঙ্গে আরো অনেক শহরও নিজের অধিকারে আনলেন। সেই থেকে ভারতে ইসলাম আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ও তা এখনো অব্যাহত আছে। কুতব-উদ-দীন জীবনের শেষ দিনগুলি এখানেই কাটান।

সুলতান শামস-উদ-দীন লালমিশই (ইলতুতমিশ)[২] প্রথম স্বাধীন সুলতান যিনি দিল্লীকে রাজধানী ক'রে এখানকার সাম্রাজ্য শাসন করেন। সম্রাট হবার আগে তিনি কুতব-উদ-দীন আইবকের ক্রীতদাস ছিলেন। তিনি তার সেনাপতি ও নায়েবের কাজ করতেন। কুতব-উদ-দীন মারা গেলে তিনি মসনদ দখল ক'রে বসলেন। তিনি একজন ন্যায়নিষ্ঠ, সদগুণ সম্পন্ন দক্ষ শাসক ছিলেন। স্বাধীন সুলতান হিসেবে কুড়ি বছর রাজত্ব করে যান।[৩]

স্মরণে রাখার মতো তার ভালো কাজগুলির মধ্যে একটি হলো—তিনি কারো কোন অভিযোগ থাকলে তা দূর করতেন, নিগৃহীত অত্যাচারিতরা যাতে ন্যায় বিচার পায় সেদিকে চোখ রাখতেন। তিনি আদেশ জারী করেন যে কেউ নিপীড়িত হলে সে যেন তা জানান দেবার জন্য রঙে ছোপানো পোষাক পরে। এর কারণ, ভারতের সব লোকই সাদা পোষাক পরতো। বিচারালয়ে বসে অথবা ঘোড়ায় চড়ে কোথাও যাবার সময়ে যখনি তিনি কোন রঙীন পোষাক পরা লোক দেখতেন তখুনি তার বিষয়ে খোঁজ নিতেন ও যাতে সে ন্যায় বিচার পায় সেদিকে নজর দিতেন। এতেও তিনি নিশ্চিত হলেন না। তিনি ভাবলেন—এমনও হতে পারে, রাতে কেউ নিগৃহীত হয়েছে! সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিকার হওয়া জরুরী। তাই তিনি প্রাসাদের ফটকের কাছে থাকা দুই গম্বুজে দু'টি মার্বেলের সিংহমূর্তি বসালেন। মূর্তিদু'টির গলায় দু'টি

২। ইবন বাতুতা ইলতুতমিশের বদলে এখানে লালমিশের নাম করেছেন। কুতব-উদ-দীন আইবকের পালিত ছেলে আরাম শাহ-র স্বল্প-কালীন রাজত্বের কথাও তার নজর এড়িয়ে গেছে। লালমিশ প্রকৃতই রাজত্ব করেছিলেন কিনা তা অনিশ্চিত।

৩। শামস-উদ-দীন ইলতুতমিশ খ্রী ১২১০-১২৩৬ মোট ২৬ বছর রাজত্ব করেন।

বিরাট ঘণ্টা এঁটে তার সাথে শিকল ঝুলিয়ে দিলেন। নিপীড়িত লোকেরা রাতে সেই শিকল টেনে ঘণ্টা বাজালে তিনি তাদের অভিযোগ শুনে তখুনি ন্যায় বিচারের চেষ্টা করতেন।

সুলতান শামস-উদ-দীন তিন ছেলে রুকন-উদ-দীন, মুয়িজ্জ-উদ-দীন ও নাসির-উদ-দীনকে রেখে মারা যান। রাজিয়া নামে এক মেয়েও ছিল। এই মেয়ে ও মুয়িজ্জ-উদ-দীন এক মায়ের পেটের ভাই-বোন। শামস-উদ-দীনের পর রুকন-উদ-দীন রাজা হন।

সিংহাসনে বসে রুকন-উদ-দীন প্রথমেই মুয়িজ্জ-উদ-দীনকে খতম করলেন।[৪] বোন রাজিয়া এ কাজ সমর্থন না করায় তাকেও সরিয়ে ফেলতে চাইলেন। এক শুক্রবারে রুকন-উদ-দীন নমাজ পড়তে গেলে, রাজিয়া নিপীড়িতের রঙিন পোষাক পরে মসজিদের কাছে পুরানো রাজপ্রাসাদের দৌলতখানার ওপরে গিয়ে উঠলেন। সৈন্যদের ডেকে সেখান থেকে বললেন: সুলতান আমার ভাইকে খুন করেছে। আমাকে তিনি খুন করতে চান। একথা বলে তিনি সবাইকে তার পিতার মহৎ গুণাবলীর কথা মনে করিয়ে দিলেন। এর ফলে বিদ্রোহ দেখা দিল। মসজিদের ভেতর থেকে রুকন-উদ-দীনকে তারা ধরে আনল। রাজিয়া বললে: খুনীকে হত্যা করা হোক। ভাইকে খুনের অপরাধে হত্যা করা হলো রুকন-উদ-দীনকে। অন্য ভাই নাসির-উদ-দীন তখনো বালক। সৈন্য সামন্তরা একমত হয়ে রাজিয়াকে শাসক পদে বসালো।

রাজিয়া স্বাধীন শাসক হয়ে চার বছর রাজত্ব করলেন। সে ছেলেদের মতোই হাতে তীরধনুক নিয়ে ঘোড়ায় চড়তো। মুখ কখনো সে ঢাকতো না। এরপর তাকে নিয়ে কাফ্রী ক্রীতদাসের সঙ্গে অবৈধ ঘনিষ্ঠতা থাকার অভিযোগ উঠলো। তাকে সিংহাসন ছেড়ে দিয়ে বিয়ে করতে বাধ্য করা হলো। এক আত্মীয়কে রাজিয়া বিয়ে করলো। তার ভাই নাসির-উদ-দীন এবার সিংহাসনে বসলো।[৫] কিছু কাল নাসির-উদ-দীনের রাজত্ব চললো। পরে রাজিয়া ও তার

৪। মুয়িজ্জ-উদ-দীনকে সুলতান রুকন-উদ-দীন হত্যা করেননি। তিনি পরে মুয়িজ্জ-উদ-দীন বহরাম নাম নিয়ে সিংহাসনে বসেন।

ইবন বাতুতা এখানে সুলতান মুয়িজ্জ-উদ-দীন বহরাম (খ্রী ১২৪০-১২৪২), ও সুলতান আলা-উদ-দীন মসুদের (খ্রী ১২৪২-১২৪৬) নাম করেননি। তারা দুজনেই দুর্বল সুলতান ছিলেন। তাদের রাজত্বকালে মুঘলরা আবার নতুন ক'রে অভিযান শুরু করে ও ১২৪১ অব্দে লাহোর দখল ক'রে নেয়। ইলতুতমিশের ছোট ছেলে নাসির-উদ-দীন মাহমুদ ১২৪৬ থেকে ১২৬৬ অব্দ পর্যন্ত ২০ বছর রাজত্ব করেন।

স্বামী তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেন। ক্রীতদাস ও কতক রাজনৈতিক বিক্ষুব্ধদের নিয়ে নাসির-উদ-দীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য তৈরী হলেন। নাসির-উদ-দীন তার ক্রীতদাস ও নায়েব গিয়াস-উদ-দীন বলবনকে নিয়ে তাদের মুখোমুখি হলেন। যুদ্ধ চললো। হেরে গিয়ে রাজিয়া পালিয়ে গেলেন। ক্লান্ত, অবসন্ন ভাবে ঘুরতে ঘুরতে খিদের জ্বালায় এক চাষীর কাছে এসে কিছু খেতে চাইলেন। চাষীটি চাষ থামিয়ে একখানা রুটি এনে দিল। তাই খেয়ে ক্লান্ত রাজিয়া সেখানে ঘুমিয়ে পড়েন। এ-সময়ে রাজিয়ার পোষাকের নীচে পরে থাকা কবা (ঘাঘরা)টির দিকে চাষীটির চোখ পড়লো। সেটিতে অনেকগুলি দামী রত্ন বসানো। চাষী বুঝলো, এ একজন পুরুষের বেশ ধরা মেয়ে। সে তাকে খুন ক'রে পোষাক খুলে নিয়ে তার দেহ মাটিতে পুঁতে ফেলল। তারপর রাজিয়ার ঘোড়াটিকে ছেড়ে দিয়ে তার পোষাক নিয়ে বাজারে বেচতে গেল। বাজারের লোকেরা তাকে সন্দেহ ক'রে হাকিমের কাছে ধরে নিয়ে এলো। মার খেয়ে সে সব কথা খুলে বললো। তখন রাজিয়ার দেহ উদ্ধার ক'রে নিয়ম মতো আবার সেখানেই কবর দিয়ে তার ওপরে একটি স্মৃতিস্তম্ভ তৈরী হলো। এটি যমুনা নদীর তীরে, শহর থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে।

স্বাধীন রাজা রূপে কুড়ি বছর রাজত্ব ক'রে নাসির-উদ-দীন অনেক মহৎ গুণের পরিচয় দিয়ে গেছেন। তিনি নিজ হাতে কোরান নকল করতেন। তা বিক্রী ক'রে যে অর্থ পেতেন তাই দিয়ে আপন খরচ চালাতেন। কাজী কামাল-উদ-দীন সুলতানের হাতের লেখা একখানি কোরান আমায় দেখান। লেখা যেমন সুন্দর তেমনি পরিচ্ছন্ন। পরে নায়েব ঘিয়াস-উদ-দীন বলবন নাসির-উদ-দী-কে হত্যা ক'রে রাজা হয়ে বসলো।[৬]

ঘিয়াস-উদ-দীন বলবন সুলতানের গদীতে বসে কুড়ি বছর রাজত্ব করেন। এর আগে কুড়ি বছর কাল তিনি নাসির-উদ-দীনের নায়েব ছিলেন। এদেশের সেরা সুলতানদের মধ্যে তিনি একজন। দার-উল-আম তার এক মহৎ কীর্তি। ঋণগ্রস্ত যে কোন লোক তার কাছে এলে তিনি তার দেনা শোধ ক'রে দিতেন। আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে যে-ই এখানে আশ্রয় নিক না কেন তার আর কোন ভয়ের কারণ থাকতো না। খুন ক'রে যদি কেউ এখানে ঠাঁই নিতো সুলতান তার

৬। বলবন তার প্রভু নাসির-উদ-দীনকে হত্যা করেছিলেন এর ধ্রুব প্রমাণ পাওয়া যায় না।

হয়ে মধ্যস্থতা ক'রে মৃতের উত্তরাধিকারীদের সঙ্গে তার বিবাদ মিটিয়ে দিতেন। যদি কোন অপরাধী এখানে আশ্রয় নিতো তবে তার পিছু ধাওয়া করা লোকেরা আর তার পিছু নিতো না। এই ভবনেই ঘিয়াস-উদ-দীনকে সমাধিস্থ করা হয়। আমি তার স্মৃতি সৌধটি দেখেছি।

সুলতান ঘিয়াস-উদ-দীন বলবনকে নিয়ে যেসব চমকপ্রদ কাহিনী শোনা যায় তার একটি এরকম : একবার সুলতান শামস-উদ-দীন লালমিশ (ইলতুতমিশ) এক বণিককে সমরকন্দ, বুখারা ও তিরমিধ পাঠালেন কতক দাস কিনে আনার জন্য। সে একশোর মতো দাস কিনে সুলতানের কাছে নিয়ে এলো। এদের মাঝে বলবনও ছিল। সে দেখতে কদাকার। সুলতান সবাইকে দেখে খুশী হলেন একমাত্র বলবন ছাড়া। সুলতান বলবনকে দেখিয়ে বললেন : "একে আমি চাই না, ফিরিয়ে নিয়ে যাও।" বলবন তখন বিনীত ভাবে বললো : 'খুন্দ-আলম! কার জন্য এ দাসদের আপনি কিনলেন?' রাজা হেসে জবাব দিলেন : 'আমার নিজের জন্য।' বলবন তখন বললো : 'আমাকে তবে সকলের প্রভু পরমশক্তিমান ঈশ্বরের জন্য কিনুন।' সুলতান তখন তাকেও কিনে নিলেন। কিন্তু সুনজরে দেখলেন না। জল বাহকের কাজে লাগালেন বলবনকে।

বলবন নিজের কাজের গুণেই জলবাহক থেকে তাদের সর্দার; সর্দার থেকে সৈনিক ও এরপর আমীর হন। সিংহাসনে বসার আগে বলবনের মেয়েকে নাসির-উদ-দীন বিয়ে করেন। সুলতান হয়ে বলবনকে তার নায়েব পদ দিলেন। পরে এই নাসির-উদ-দীনকে খুন ক'রে ঘিয়াস-উদ-দীন বলবন নিজেই তখত দখল ক'রে বসলেন।

সুলতান বলবনের দুই ছেলে। একজন (মুহম্মদ) খান। তিনিই যুবরাজ নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাকে সিন্ধুর শাসক ক'রে পাঠানো হয়। মুলতানে তিনি বাস করতেন। তাতারদের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি মারা যান। তার দু'টি ছেলে, কৈকুবাদ ও কৈখুসরভ। সুলতান বলবনের অন্য ছেলের নাম নাসির-উদ-দীন। তিনি লক্ষ্ণাবতী ও বাঙলার শাসনভার পেয়েছিলেন। খান তাতারদের সঙ্গে যুদ্ধে শহীদ হলে, সুলতান বলবন নাসির-উদ-দীনকে উপেক্ষা ক'রে খানের ছেলে কৈখুসরভকে যুবরাজ করেন। নাসির-উদ-দীনেরও

এক ছেলে। নাম তার মুয়িজ্জ-উদ-দীন। সেও তখন দিল্লীতে তার ঠাকুরদার কাছে থাকতো। সুলতান বলবন মারা গেলে অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যে সে-ই রাজ্যের মালিক হয়ে বসলো।

সুলতান ঘিয়াস-উদ-দীন যে রাতে মারা যান ছেলে নাসির-উদ-দীন তখন লক্ষ্মণাবতীতে। সুলতান তার নাতি কৈখুসরভকে উত্তরাধিকারী মনোনীত ক'রে গিয়েছিলেন সে কথা আগেই বলেছি। কিন্তু ঘিয়াস-উদ-দীনের নায়েব মালিক-উল-উমরা তার শত্রু ছিল। সে এক বিরাট কুটচাল খেলল। একটি জাল দলিল তৈরী করলো। তাতে সব বড়ো বড়ো আমীরদের সই রয়েছে। দলিলে বলা হয়েছে যে, এই আমীররা সুলতানের অপর নাতি মুয়িজ্জ-উদ-দীনকে সমর্থন করবে। তারপর সে কৈখুসরভের কাছে গিয়ে জানাল, আমীররা সবাই তার খুড়তুতো ভাইকে সমর্থন করবে, তাই এখন তার খুব বিপদ। সে তখন তার কাছে পরামর্শ চাইল। উল-উমরা তাকে সিন্ধু পালিয়ে যেতে বললো। কৈখুসরভ জিজ্ঞেস করলো: কী ক'রে পালিয়ে যাবো, দরজা তো সব বন্ধ? উল-উমরা জবাব দিলো: চাবি আমার কাছে আছে, আমি খুলে দেব। কৈখুসরভ তখন পালিয়ে গেল। উল-উমরা তাকে নগর থেকে বার ক'রে দিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে দিল।

এরপর মালিক-উল-উমরা মুয়িজ্জ-উদ-দীনের কাছে এসে তার প্রতি নিজের আনুগত্যের কথা তাকে জানাল। মুয়িজ্জ-উদ-দীন প্রথমে থ মেরে গেলেন। তারপর সব কথা শুনে তাকে ধন্যবাদ জানালেন। সেই রাতেই সব আমীরদের ও সম্মানিত ব্যক্তিদের রাজপ্রসাদে ডেকে পাঠালেন। তারাও সকলে মুয়িজ্জ-উদ-দীনের প্রতি আনুগত্য জানাল।

ভোর হতে সকলে মুয়িজ্জ-উদ-দীনকে রাজা বলে ঘোষণা ক'রে অভিবাদন জানাল। এদিকে তখনো তার বাবা জীবিত, তিনি তখন লক্ষ্মণাবতীতে। সব খবর শুনে তিনি বললেন: আমিই রাজ্যের উত্তরাধিকারী, আমি বেঁচে থাকতে আমার ছেলে কী ক'রে রাজা হবে! তিনি সৈন্যবাহিনী নিয়ে দিল্লী রওনা দিলেন। ছেলেও দিল্লী রক্ষা করার জন্য সেনাবাহিনী সাজাল। উভয়ে কর শহরের কাছে গঙ্গানদীর তীরে মুখোমুখি হলেন। নদীর যে তীরে কর শহর সেই দিকে নাসির-উদ-দীন ও অন্য তীরে মুয়িজ্জ-উদ-দীন যুদ্ধের জন্য তৈরী। কিন্তু ভগবান মুসলমানদের রক্তপাত বন্ধ করতে চাইলেন। তিনি

নাসির-উদ-দীনের মনে ছেলের প্রতি মমতা জাগালেন। নাসির-উদ-দীন ভাবলেন, যদি ছেলে আমার রাজা হয়, সিংহাসনে বসে, সে তো আমারই গৌরব। সে-ই রাজা হোক। এদিকে সুলতান মুয়িজ্জ-উদ-দীনের মনেও একই ভাবান্তর দেখা দিলো। দু'জনেই নৌকায় চেপে একে অন্যের সঙ্গে দেখা করতে চললেন। মাঝ গঙ্গায় উভয়ের দেখা হলো।

সুলতান মুয়িজ্জ-উদ-দীন পিতার পায়ে চুমু খেয়ে তার কাছে ক্ষমা চাইল। পিতা নাসির-উদ-দীন বললেন: আমার রাজ্য তোমাকেই দিলাম, তার দেখা-শোনার ভার তোমার ওপরেই রইলো।

এরপর নাসির-উদ-দীন নিজ রাজ্যে ফিরে যেতে চাইলেও ছেলের অনুরোধে দিল্লী এলেন। তিনি সিংহাসনে ছেলেকে বসিয়ে তার সামনে দাঁড়ালেন।

গঙ্গানদীর বুকে পিতা-পুত্রের এই মিলনকে 'দুই নক্ষত্রের দেখা' বলে কবিরা বর্ণনা করেছেন।

নাসির-উদ-দীন এরপর নিজ রাজ্যে ফিরে এসে সেখানেই বাকী জীবন কাটালেন। কিছু কাল পরে তিনি মারা গেলেন। তার অন্যান্য ছেলেদের মধ্যে একজন হলো ঘিয়াস-উদ-দীন বাহাদুর।[৭] সুলতান তুঘলক একে বন্দী করেন। পরে তুঘলকের ছেলে মুহম্মদ তাকে ছেড়ে দেন।

অন্য পুত্র, সুলতান মুয়িজ্জ-উদ-দীন মাত্র চার বছর রাজত্ব করেন।[৮] তার রাজত্বকালকে আনন্দ-উৎসবের সঙ্গে তুলনা করা চলে। যারা তার রাজত্ব দেখেছেন এমন কিছু লোকের দেখা আমি পেয়েছিলাম। তারা সকলেই বলেছেন: মুয়িজ্জ-উদ-দীনের রাজত্বকালে দেশ নানা দিকে উন্নতি লাভ করেছিল। জিনিষপত্রও বেশ সস্তায় পাওয়া যেত। রাজা নিজেও উদার ও মহৎ প্রকৃতির ছিলেন। জুমা মসজিদের উত্তর অঙ্গনে থাকা অন্য মিনারটি তিনিই গড়েন।[৯]

একজন ভারতীয় আমায় বলেন যে, মুয়িজ্জ-উদ-দীন কৈকুবাদ খুব মদ খেতেন ও নারীসঙ্গে মন ছিল। এর ফলে তাকে রোগের কবলে পড়তে হয় ও শরীরের একদিক পক্ষাঘাতে অসাড় হয়ে পড়ে। ডাক্তাররা সে রোগের চিকিৎসা করতে

৭। ঘিয়াস-উদ-দীন বাহাদুর ভুর।
৮। মুয়িজ্জ-উদ-দীনের রাজত্ব মোটামুটি তিন বছর। খ্রীঃ ১২৮৭-৯০ অব্দ।
৯। এটি প্রকৃত পক্ষে তৈরী করান মুয়িজ্জ-উদ-দীন সাম, যিনি মুহম্মদ ঘোরী নামে পরিচিত।

ব্যর্থ হন। তার নায়েব জলাল-উদ-দীন ফিরোজ শাহ খলজী এই সুযোগে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। তিনি শহরের বাইরে জয়শানী প্রাসাদের কাছে একটি পাহাড়ে আস্তানা গাড়েন। মুয়িজ্জ-উদ-দীন তার আমীরদের খলজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পাঠান। কিন্তু যাকেই পাঠান হলো সে-ই খলজীর দলে ভিড়ে গেল। জলাল-উদ-দীন শহরের ভেতর ঢুকে পড়লেন। তিন দিন ধরে মুয়িজ্জ-উদ-দীনকে প্রাসাদে অবরোধ ক'রে রাখলেন।

নিজের চোখে এ ঘটনা দেখেছে এমন একজন লোক আমায় জানালেন: ওই অবরোধকালে সুলতানকে অনাহারের যাতনা পর্যন্ত সইতে হয়। প্রতিবেশীদের মধ্য থেকে একজন সৈয়দ তাকে অনাহারের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য কিছু খাবার পাঠান। এরপর জলাল-উদ-দীন প্রাসাদে ঢুকে মুয়িজ্জ-উদ-দীনকে হত্যা করলেন।

জলাল-উদ-দীন ফিরোজ শাহ খলজী ক্ষমাশীল ও সুদক্ষ শাসক ছিলেন। তবে, তার ক্ষমাশীলতাই শেষে তার খুনের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সুলতান হবার কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি রাজ্যে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। একটি প্রাসাদও তৈরী করেন। তার নামানুসারেই প্রাসাদের নামকরণ হয়।

সুলতান জলাল-উদ-দীনের ছেলে রুকন-উদ-দীন; ভাইপো আলা-উদ-দীন। সুলতান ভাইপোর সাথে নিজের মেয়ের বিয়ে দেন। তাকে কর ও মাণিকপুর এবং তার অধীন অঞ্চলের শাসক পদে বসান। এ অঞ্চল ভারতের সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলির মধ্যে একটি। অঢেল গম, চাল আর চিনি হয়। মিহি কাপড়ও সেখান থেকে দিল্লী চালান আসে। দিল্লী থেকে কর আঠারো দিনের যাত্রাপথ। আলা-উদ-দীনের বউ স্বামীর ওপর পীড়ন চালাত। এজন্য সে বউয়ের নামে অনবরত অভিযোগ করতো। ফলে, বউকে নিয়ে দু'জনের সম্পর্কে চিড় ধরলো।

আলা-উদ-দীন প্রতিভাবান, সাহসী, বিজয়শীল ও সফল শাসক ছিলেন। এর ফলে তার মনে ক্রমেই রাজা হবার বাসনা দানা বাঁধতে থাকে। কিন্তু, কাফেরদের কাছ থেকে অস্ত্রের জোরে লুটপাঠ ক'রে যে ধন সম্পদ তিনি পান তাছাড়া আর কোন সম্পদ তার ছিল না। একবার তিনি দেওগীর রাজ্যের রাজার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যান। দেওগীরকে কটকও বলা হতো। এটি মালব ও মহারাষ্ট্রের রাজধানী। এর রাজা কাফেরদের মধ্যে সব থেকে বড়ো। এই অভিযানে যাবার পথে আলা-উদ-দীনের ঘোড়া একটি পাথরে আঘাত

করে। এর ফলে সেখানে ফাঁপা আওয়াজ ওঠে। আওয়াজ শুনে আলা-উদ-দীন সে জায়গাটি খোঁড়ার আদেশ দেন। জায়গাটি খুঁড়ে বিরাট ধনভাণ্ডার পাওয়া গেল। এ সম্পদ সঙ্গীদের মধ্যে তিনি বিলিয়ে দিলেন। তিনি দেওগীর এলে সেখানকার রাজা বিনা যুদ্ধে অধীনতা মেনে নিলেন। শহর তার হাতে সঁপে দিলেন। সেই সঙ্গে অঢেল উপহারও দিলেন। তিনি সে সব নিয়ে কর শহরে ফিরে এলেন। মতলববাজেরা তার বিরুদ্ধে কাকাকে তাতিয়ে তুলল। তিনি তখন আলা-উদ-দীনকে ডেকে পাঠালেন। সে গেল না। সুলতান নিজেই তখন তার সাথে দেখা করতে চললেন। সঙ্গে সেনাদলও নিলেন। কর শহরের যে জায়গাটিতে সুলতান মুয়িজ্জ-উদ-দীন পিতা নাসির-উদ-দীনকে বাধা দিতে সৈন্য সমাবেশ করেছিলেন, তিনিও সেখানেই আস্তানা গাড়লেন। তারপর জলপথে ভাইপোর সাথে দেখা করতে চললেন। এদিকে ভাইপোও চলেছে নৌকায় কাকার দেখা পেতে। মাঝ নদীতে দেখা হবার সময়ে ভাইপো যখন কাকাকে জড়িয়ে ধরলো, সেই সুযোগে আগে থেকে এঁটে রাখা ফন্দী মতো তার সঙ্গীরা কাকা জলাল-উদ-দীনকে খুন করলো।

আলা-উদ-দীন এবার সুলতানের গদীতে বসলেন। কাকার সৈন্যেরা অধিকাংশই তার আনুগত্য স্বীকার ক'রে নিল। কতক অবশ্য দিল্লী ফিরে রুকন-উদ-দীনকে মদত দিয়ে আলা-উদ-দীনকে হটিয়ে দেবার জন্য লড়াইয়ে নামল। কিন্তু পরে তাকে ছেড়ে সুলতানের দলেই ভিড়ল। রুকন-উদ-দীন শেষে সিন্ধু পালালেন। আলা-উদ-দীন রাজধানীর দখল নিয়ে দাপটের সঙ্গে কুড়ি বছর রাজত্ব করলেন।

সেরা সেরা সুলতানের মধ্যে আলা-উদ-দীন একজন। ভারতীয়রা তার প্রশংসায় মুখর। তিনি ব্যক্তিগত ভাবে প্রজাদের বিষয়ে খোঁজখবর নিতেন। জিনিষপত্রের দরদামের ওপর নজর রাখতেন। এসব বিষয়ে খবরা-খবর নেবার জন্য রইস-কে ডেকে পাঠাতেন। শোনা যায়, একবার তিনি তাকে মাংসের দর বাড়ার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। সে জানায় যে, গরুর ওপর বেশি কর চাপানোর ফলেই এ অবস্থা। শুনে তিনি কর তুলে নেবার আদেশ দিলেন। ব্যবসায়ীদের ডেকে এনে তাদের টাকা দিয়ে বললেন : এদিয়ে গরু ভেড়া কিনে, তা বিক্রী ক'রে সে টাকা রাজকোষে জমা দিন। একাজের জন্য আপনাদের বিক্রীর ওপর একটি বিশেষ নির্দিষ্ট হারে ভাগ দেয়া হবে। তারা

তাই করলেন। এই একই ভাবে স্থলতান দৌলতাবাদ থেকে আমদানি করা বস্ত্র বিক্রী করেন। একবার শস্যের দাম চড়ে গেল। তখন তিনি রাজভাণ্ডার থেকে চাল বার ক'রে দিতে থাকলেন। বাজার দর কমাবার জন্য তা বেচা হতে থাকল। আরো একবার শস্যের দাম আগুন হয়ে গেল। রাজা দর বেঁধে দিয়ে ব্যবসায়ীদের সেই দামে বেচার আদেশ দিলেন। তারা সে দরে বেচতে রাজী হলো না। স্থলতান তখন ব্যবসায়ীদের শস্য বেচা বে-আইনী ঘোষণা ক'রে, সরকারী শস্যভাণ্ডার থেকে তা বেচার আয়োজন করলেন। এভাবে ছ'মাস কাল সবাইকে শস্য যুগিয়ে গেলেন। ফলে, ব্যবসায়ীরা জোর মার খেল। পাছে তাদের জমানো শস্য পোকায় নষ্ট ক'রে দেয় এই ভয়ে তা বেচবার অনুমতি লাভের জন্য ধরাধরি শুরু করলো। তখন, আগে যে দামে তারা বেচতে অরাজী হয়েছিল, তার চেয়েও কম দামে তা বেচার অনুমতি দেয়া হলো।

স্থলতানের এক ভাইপো স্থলেইমান শাহ। স্থলতান তাকে খুব ভালো-বাসতেন, প্রশ্রয় দিতেন। একবার তাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি শিকারে গেলেন। আলা-উদ-দীন যেমন কাকাকে খুন ক'রে গদীনশীন হয়েছেন, স্থলেইমানেরও তেমনি কাকাকে খুন ক'রে তার আসনে বসার লোভ জাগল। পথে, স্থলতান যখন একদিন সকালে জলখাবার খেতে বসেছেন, সে তাকে তাক ক'রে তীর ছুঁড়ল। স্থলতান আঘাত পেয়ে ঢলে পড়লেন। একজন বান্দা ঢাল নিয়ে তাকে আড়াল ক'রে দাঁড়াল। স্থলেইমান যখন তাকে পুরো খতম করতে এগিয়ে এলো বান্দারা জানাল সে মারা গেছে। তাদের কথায় বিশ্বাস ক'রে স্থলেইমান প্রাসাদে ফিরে এলো। এদিকে আলা-উদ-দীন চেতনা ফিরে পেয়ে ঘোড়ায় চড়ে প্রাসাদের দিকে রওনা হলেন। পিছন পিছন তার সেনাদল। ভাইপো এ খবর পেয়ে চম্পট দিল। পরে ধরা পড়ে প্রাণটি খোয়াতে হলো। সেই ঘটনার পর থেকে স্থলতান আর ঘোড়ায় চড়ে বাইরে যেতেন না। এমনকি শুক্রবারের নমাজ, ঈদের নমাজ কোন কিছুতেই যোগ দিতেন না।

খিজর খান, শাদী খান, আবুবকর খান, মুবারক খান ও শিহাব-উদ-দীন আলা-উদ-দীনের ছেলে। মুবারক খান কুতব-উদ-দীন নাম নিয়ে পরে স্থলতান হন। কুতব-উদ-দীনকে তিনি দেখতে পারতেন না, বিশেষ নজরও দিতেন না।

স্থলতান আলা-উদ-দীন রোগে পড়লেন। তার স্ত্রী মাহক নিজের ছেলে

খিজর খানকে সুলতান করার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন। এজন্য সে তার ভাই সঞ্জরকে ভেড়ালেন তার দলে। সুলতানের আমীরদের প্রধান মালিক নায়েব (যার অপর নাম আলফী) তা জানতে পেরে সুলতানের কাছে ফাঁস ক'রে দিলেন। তিনি এক ফাঁদ পেতে সঞ্জরকে খতম করলেন। পরে খিজর খানকেও তিনি হাতে পায়ে শিকল বেঁধে মালিক নায়েবের হাতে তুলে দেন ও গোয়ালিয়র দুর্গে পাঠাবার আদেশ দেন। এই দুর্গটি হিন্দু বসতির মাঝে, নির্জন ও দুরারোহ স্থানে। দিল্লী থেকে দশদিনের পথ। গোয়ালিয়রে নিয়ে দুর্গ রক্ষক বা কোতোয়ালের জিম্মায় তাকে রাখা হলো। মালিক নায়েব তাকে বললেন: 'সুলতানের ছেলে বলে খিজর খানকে সেই তোয়াজ দেখিও না। সুলতানের সব থেকে বড়ো শত্রু মনে ক'রে, শত্রুর মতো বন্দী রাখ।'

আমি নিজে কিছুদিন এই দুর্গে বাস করেছি।

সুলতানের অসুখ যখন খুব বেড়ে গেল, তিনি মালিক নায়েবকে বললেন: 'খিজর খানকে নিয়ে এসো। আমি তাকেই আমার উত্তরাধিকারী ঘোষণা ক'রে যাব।' মালিক খান মুখে সম্মতি জানালেও কাজে তা করলেন না। যখনই সুলতান ছেলের খোঁজ নিতেন, মালিক উত্তর দিতেন: 'এই তো এলো বলে'। সুলতানের মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এই খেলাই তার সঙ্গে খেললেন। ভগবান যেন তাকে করুণা করেন!

সুলতান আলা-উদ-দীন মারা যাবার পর তার ছোট ছেলে শিহাব-উদ-দীনকে মালিক নায়েব সুলতানের গদীতে বসালেন। সবাই তার প্রতি আনুগত্য দেখালেন। কিন্তু মালিক নায়েব তার ওপর প্রভুত্ব ক'রে চললেন। তিনি আবুবকর ও শাদী খানকে অন্ধ ক'রে গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী ক'রে রাখলেন। বন্দী খিজর খানকেও অন্ধ ক'রে দেবার আদেশ হলো। কুতব-উদ-দীনকে বন্দী করা হলেও, অন্ধ করা হলো না।

আলা-উদ-দীনের দু'জন প্রিয় ক্রীতদাস ছিল। বশীর আর মুবাশশীর। আলা-উদ-দীনের প্রধানা মহিষী, সুলতান মুয়িজ্জ-উদ-দীনের মেয়ে, এই দু'জন দাসকে দিয়ে মালিক নায়েবকে খুন করালেন। কুতব-উদ-দীনকে গোয়ালিয়র দুর্গ থেকে মুক্ত করিয়ে আনালেন। কুতব-উদ-দীন কিছুকাল সুলতান ভাইয়ের কাছে থেকে তার নায়েবের কাজ চালালেন। তারপর ভাইকে হটিয়ে দেবার মতলব নিয়ে সেইমতো কাজ করলেন।

শিহাব-উদ্-দীনকে গদীচ্যুত ক'রে কুতব-উদ-দীন তার একটি আঙুল কেটে নিলেন। সেই গোয়ালিয়র দুর্গেই বন্দী ক'রে রাখলেন তাকে। নিজের শাসন বেশ জমে ওঠার পর তিনি গেলেন রাজধানী দিল্লী ছেড়ে দৌলতাবাদ। দিল্লী থেকে সেখানকার দূরত্ব ৪০ দিনের পথ। এই পথ উইলো ও অন্য গাছপালায় এমন ভাবে সাজানো ও ছায়া ঘেরা, মনে হবে যেন বাগানের কোল দিয়ে পথ চলেছি। পথে প্রতি মাইলে একটি ক'রে বরীদ বা ডাকঘর। প্রত্যেকটি ডাকঘরে একজন ভ্রমণকারীর যা যা দরকার হতে পারে তার সবকিছুই পাওয়া যাবে। তাই, এপথে যাবার সময় মনে হবে, চল্লিশ দিন লম্বা এক হাট-বাজারের পথ ধরে যেন চলেছি। দিল্লী থেকে তিলিং (তেলেঙ্গানা) ও মবর (করমণ্ডল উপকূল) পর্যন্ত রাস্তাও ঠিক একই রকম। যেতে, হাঁটা পথে ছ'মাস লাগবে।

প্রতিটি ডাকঘরে সুলতানের জন্য একটি ক'রে প্রাসাদ ও পর্যটকদের জন্য একটি ক'রে অতিথিশালা রয়েছে। ফলে, গরীব পর্যটকদের সে-পথে কোনকিছু নিয়ে যাবার দরকার হয় না। কুতব-উদ-দীন যখন দৌলতাবাদ যাবার আয়োজন করলেন, কতক আমীর তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রে, তার ভাই খিজর খানের দশ বছর বয়সের ছেলেকে গদীতে বসাবার মতলব করলেন। সুলতান সে খবর জানতে পেরে সেই ভাইপোকে দু'পা ধরে পাথরে মাথা আছড়ে মেরে ফেললেন। মালিক শাহ নামে এক আমীরকে গোয়ালিয়র দুর্গে পাঠালেন খিজর খান অন্য ভাইদের ধরাধাম থেকে সরিয়ে ফেলার জন্য।

এই দুর্গের বিচারক কাজী জইন-উদ্-দীন মুবারক আমায় জানালেন: 'একদিন সকাল বেলা আমি যখন খিজর খানের কাছে তার বন্দী কুঠুরিতে, তখন মালিক শাহ এলেন। খিজর খান তার আসার খবর শুনে ভয় পেয়ে গেলেন, মুখ তার শুকিয়ে গেল। আমীর যেই ঘরে ঢুকলেন তাকে প্রশ্ন করলেন: 'কেন এসেছেন?' তিনি জবাব দিলেন: 'সুলতানের কিছু হুকুম তামিল করার জন্য'।

গোয়ালিয়র দুর্গটি একটি উঁচু পাহাড়ের মাথায়। দেখলে মনে হবে যেন পাহাড় কেটে বানানো হয়েছে। কাছে আর কোন পাহাড় নেই। এখানে একটি জলাধার ও কুড়িটির মতো কূয়া আছে। তাকে ঘিরে দুর্গের দেয়াল। দেয়ালে আগুন ও পাথর ছোঁড়ার কামান বসানো। যে পথটি দুর্গের দিকে গেছে সেটি বেশ চওড়া, একটি হাতী ও একটি ঘোড়া সহজেই পাশাপাশি চলতে পারে। দুর্গের দরজায় পাথরে খোদাই একটি হাতীর মূর্তি, তার ওপর একজন

মাহুত বসা। দূর থেকে জীবন্ত হাতী বলে মনে হবে। দুর্গের নিচে একটি সুন্দর ছোট্ট শহর। পুরোটা সাদা পাথর কেটে তৈরী। মসজিদ ও বাড়িগুলো এই একই ভাবে তৈরী হয়েছে। দরজা ছাড়া আর কোথাও কাঠ ব্যবহার করা হয়নি। রাজপ্রাসাদ, স্মৃতি সৌধ, প্রমোদ কক্ষ (মজলিস)-ও এভাবেই বানানো। এখানকার প্রায় সবাই কাফের। দুর্গে ৬০০ জন অশ্বারোহী সেনা বাস করে। জায়গাটির চারিদিকে কাফেরদের বাস থাকায় প্রায় সময়েই লড়াই লেগে থাকতো।

পথের কাঁটা ভাইদের এ জগত থেকে সরিয়ে ফেলতে পেরে কুতব-উদ-দীন নিশ্চিন্ত হয়ে নিজের শাসন জমজমাট ক'রে তুললেন। তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার মতো আর কেউ রইলো না। হায়রে! সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তার বিরুদ্ধে তারই প্রিয় পাত্র ও আমীরদের মধ্যে প্রধান ও সব থেকে শক্তিশালী নাসির-উদ-দীন খুসরভ খানকে মাতিয়ে তুললেন। তিনি অসতর্ক মুহূর্তে আক্রমণ ক'রে কুতব-উদ-দীনকে খুন করলেন ও তার রাজ্য অধিকার ক'রে বসলেন। আবার তাকেও প্রাণ দিতে হলো তুঘলকের হাতে।

খুসরভ খান কুতব-উদ-দীনের প্রধান আমীরদের একজন। তিনি খুব সাহসী ও সুদর্শন ছিলেন। চান্দেরী ও মবর রাজ্য তিনি অধিকার করেন। এদু'টি ভারতের সব থেকে উর্বর দেশগুলির অন্যতম। দিল্লী থেকে এর দূরত্ব ছ'মাসের পথ। কুতব-উদ-দীন তাকে খুব পছন্দ করতেন ও নানা রকম বিশেষ অনুগ্রহ দেখাতেন।

সুলতানের শিক্ষক কাজী খান খুসরভকে পছন্দ করতেন না। খুসরভের হিন্দু প্রীতি ও তাদের প্রতি আকর্ষণকেও তিনি ভালো চোখে দেখতেন না। এজন্য কাজী খান প্রায়ই কুতব-উদ-দীনকে খুসরভ সম্বন্ধে সাবধান ক'রে দিতেন। স্মরণ করিয়ে দিতেন যে, খুসরভ আগে হিন্দুদেরই স্বধর্মীয় ছিলেন। কিন্তু সুলতান তার কথা গায়ে মাখতেন না। বলতেন: সে যা ভালো মনে করে তাই করুক।

একদিন খুসরভ এসে সুলতানকে জানালেন, একদল হিন্দু মুসলমান হতে চান। ভারতে এরকম প্রথা ছিল যে, যখন কোন হিন্দু মুসলমান হতেন তখন তাকে সুলতানের কাছে নিয়ে যাওয়া হতো। তিনি তাকে ভালো পোষাক আশাক পরতে দিতেন। তার সামাজিক মর্যাদা অনুসারে একটি

সোনার গলবন্ধ ও অঙ্গদাদি উপহার দিতেন। সুতরাং সুলতান বললেন: তাদের আমার কাছে নিয়ে এসো। তিনি বললেন: তারা তাদের আত্মীয় স্বজনদের ও স্বধর্মীদের জন্য দিনের বেলা আসতে লজ্জা পাচ্ছেন। সুলতান তাদের রাতের দিকে নিয়ে আসতে বললেন। খুসরভ খান একদল সাহসী ও পরাক্রমী হিন্দুদের জড়ো করলেন। তাদের সঙ্গে তার ভাই খান খানান-ও [১০] রইলেন। তখন সবে গ্রীষ্মকাল শুরু হয়েছে। সুলতান একা প্রাসাদের ছাদে ঘুমাতেন। মাত্র কয়েকজন বাচ্চা চাকর তার সঙ্গে থাকত। অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত দলটি যখন প্রাসাদের চারটি ফটক পেরিয়ে পঞ্চম ফটকে এলো, তখন তাদের চালচলন দেখে কাজী খানের সন্দেহ হলো। তিনি তাদের ভেতরে ঢুকতে বাধা দিয়ে বললেন: সুলতান নিজে অনুমতি দিলে তবে এরা প্রবেশ করতে পারে। বাধা পেয়ে তারা তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে হত্যা করলো। ফটকের কাছে হইচই পড়ে গেলো। সুলতান কী হয়েছে জানতে চাইলেন। খুসরভ খান উত্তর দিলেন: যে হিন্দুরা মুসলমান হতে চায়, তারা এসেছে। কিন্তু কাজী খান তাদের আটকে রেখেছে। চীৎকার বাড়ল। সুলতান সতর্ক হলেন। প্রাসাদের ভেতরে যাবার জন্য তিনি উঠে দাঁড়ালেন। কিন্তু দরজা বন্ধ। মাত্র কজন দেহরক্ষী তার পাশে। সুলতান দরজায় ধাক্কা দিলেন। খুসরভ খান এসে পিছন থেকে তার হাত ধরে ফেলল। সুলতানের গায়ে তার চেয়ে বেশি জোর থাকার দরুন তিনি তাকে নিচে ফেললেন। হিন্দুরা এগিয়ে এলো। খুসরভ খান তখন বললেন: সুলতান আমার ওপরে, একে মেরে ফেলো। তারা সুলতানকে হত্যা করলো। তার মাথাটা কেটে ছাদ থেকে বাগানের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিল। সময় নষ্ট না ক'রে তখনই আমীর ও মালিকদের ডেকে পাঠানো হলো। তারা এর বিন্দুবিসর্গও জানতেন না। যখন এলেন দেখতে পেলেন খুসরভ খান সিংহাসনে বসে। তারা তাকে অভিবাদন জানালেন। সকালে তার অভিষেক ঘোষিত হলো। প্রত্যেক প্রদেশে সেই মতো ঘোষণা পাঠানো হলো। প্রত্যেক আমীরকে তিনি সম্মানী পোষাক উপহার দিলেন। তুঘলক শাহ বাদে আর সকলেই তার আধিপত্য মেনে নিলেন।

১০। খান খানান উপাধি। এর মানে, সর্বপ্রধান বা সর্বাধিনায়ক। তার প্রকৃত নাম জানা যায় না।

তুঘলক শাহ তখন সিন্ধু প্রদেশের দীপালপুরের আমীর। খুসরভ খানের পাঠানো পোষাক যখন তার কাছে পৌঁছালো, তিনি তা মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তার ওপর বসলেন। খুসরভ খান তা শুনে চটে আগুন, তুঘলক শাহকে উচিৎ শিক্ষা দেবার জন্য আপন ভাই খান খানানকে সসৈন্যে পাঠালেন। তুমুল লড়াই বাধল। খান খানান গো হারান হেরে গেলেন। ক্রমে ঘটনা এমন বাঁক নিল যে তুঘলকের হাতেই খুসরভ খানকে জীবন খোয়াতে হলো।

খুসরভ খান সুলতান হয়ে হিন্দুদের প্রতি বেশি দরদ দেখাতে গিয়ে নিজের পতন ডেকে আনলেন। তিনি গো হত্যা নিষেধ ক'রে দিলেন। হিন্দুরা গরুকে দেবতা তুল্য অপরিসীম ভক্তি করে। অসুখ-বিসুখে পড়লে ভালো হবার জন্য ও দৈব কৃপালাভের আশায় গরুর পেচ্ছাপ পর্যন্ত খায়। এমনকি তার গোবর দিয়ে তাদের ঘরদোর দেয়াল উঠান লেপে। গো হত্যা তাদের ধর্মে মানা। হিন্দুরা খুসরভের এই কাজে খুশী হলেও, মুসলমানরা গেলো চটে। তারা তার পক্ষ ছেড়ে তুঘলকের দলে ভিড়ল। ফলে খুসরভ খান সুলতানের গদীতে টিঁকে থাকতে পারলেন না।

প্রধান ইমাম শেখ রুকন-উদ-দীন মুলতানে তার অতিথিশালায় বসে আমায় তুঘলকের কাহিনী শোনান। তুঘলক করুনা উপজাতির তুর্কী। করুনা উপজাতির লোকেরা তুর্কীস্তান ও সিন্ধু অঞ্চলের মাঝে থাকা পাহাড়ী অঞ্চলে বাস করে। প্রথম জীবনে তুঘলক অতি দীনহীন মানুষ ছিলেন। পেটের দায়ে সিন্ধুতে এসে বণিকদের ঘরে ঘোড়া রাখালির কাজ নেন। সে-সময় সুলতান আলা-উদ-দীনের রাজত্ব চলছে। সুলতানের ভাই উলুঘ খান সিন্ধুর শাসনকর্তা। তুঘলক রাখালি ছেড়ে তার কাছে কাজ করার সুযোগ পেলেন। উলুঘ খান তাকে নিজের খাস পেয়াদার দলে ভর্তি ক'রে নিলেন। সে-কাজে প্রতিভার পরিচয় দিয়ে তুঘলক অশ্বারোহী সৈন্যের পদ পেলেন। তা থেকে ধাপে ধাপে তিনি অশ্বারোহী বাহিনীর প্রধান হলেন। ঐ পদে বিশেষ বীরত্ব দেখিয়ে অল্পকালের মধ্যেই তিনি একজন নামজাদা আমীর হলেন। পেলেন মালিক-উল-ঘাজী উপাধি। মুলতানের জুমা মসজিদটি তুঘলকের তৈরী। সেই মসজিদে তুঘলকের একখানি খোদাই লিপি আমি দেখেছি। তাতে তিনি জানিয়েছেন: 'আমি তাতারদের সঙ্গে মোট উনত্রিশ বার যুদ্ধ করেছি ও তাদের পরাজিত করেছি। এ কৃতিত্বের জন্য আমায় মালিক-উল-ঘাজী খেতাব দেয়া হয়।'

কুতব-উদ-দীন গদ্দিনসীন হলে তুঘলককে দীপালপুর শহর ও তার সন্নিহিত অঞ্চলের শাসনকর্তা পদে বসান। তার ছেলে, বর্তমান ভারত সম্রাটকে, রাজকীয় অশ্বারোহী বাহিনীর প্রধান করা হয়। তার নাম ছিল তখন 'জউন'। সিংহাসনে বসার পর জউন মুহম্মদ শাহ নাম নেন।

কুতব-উদ-দীনকে হত্যা ক'রে খুসরভ খান সুলতান হলে, জউনকে তার অশ্বারোহী প্রধান বা আমীর-উল-খলিল পদে রেখে দেয়। তুঘলক যখন বিদ্রোহ করার সিদ্ধান্ত করেন, তখন তার যুদ্ধক্ষেত্রে নির্ভর করার মতো মাত্র তিনশো জন লোক ছিল। তিনি তাই কিজলু খানকে চিঠি দিলেন কুতব-উদ-দীনের হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য তার সাহায্য চেয়ে। কিজলু খান তখন দীপালপুর থেকে তিনদিনের পথ দূরে মুলতানে থাকেন। তার ছেলেও সে সময় দিল্লীতে। তিনি তাই জানালেন: যদি আমার ছেলে আমার কাছে থাকতো আমি নিশ্চয়ই লক্ষ্য পূরণের জন্য তোমায় সাহায্য করতাম। তুঘলক জউন খানের কাছে নিজের উদ্দেশ্যের কথা জানিয়ে তাকে সেখান থেকে পালিয়ে আসতে লিখলেন। সঙ্গে কিজলু খানের ছেলেকেও আনতে বলেন। জউন খান কিজলু খানের ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে পালিয়ে এলেন। তুঘলক তখন বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। তিনি সৈন্য সংগ্রহ ক'রে, কিজলু খানের সঙ্গে একত্রে এগিয়ে চললেন। সুলতান তার ভাই খান খানানকে পাঠালেন এদের দু'জনকে হটিয়ে দেবার জন্য। তারা তাকে বেদম ভাবে পরাস্ত করলেন। খান খানান ভাইয়ের কাছে ফিরে এলেন। তার কর্মচারীরা মারা গেছে, ধন-সম্পদ ও সঙ্গের যাকিছু কেড়ে নেওয়া হয়েছে।

তুঘলক দিল্লীর দিকে এগিয়ে চললেন এবার। সুলতান খুসরভ খান তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে শুরু করলেন তাদের বাধা দেবার জন্য তোড়জোড়। দিল্লীর বাইরে, আসীয়াবাদ নামে এক জায়গায় সৈন্য সমাবেশ করলেন। দিলেন কোষাগার খুলে দেবার আদেশ। গুনে বা ওজন ক'রে নয়, থলিতে ভরে টাকা দিতে লাগলেন। তার ও তুঘলকের মধ্যে লড়াই শুরু হলো। হিন্দুরা তার পক্ষে জোর লড়াই করলো। তুঘলক পরাস্ত হলেন। তার শিবির ছারখার ক'রে দেয়া হলো। পুরানো তিনশো সঙ্গী নিয়ে তিনি ফাঁপরে পড়লেন। তিনি তাদের বললেন: 'কোথায় পালানো যায়? যেখানেই যাই আমাদের ধরা হবে, মেরে ফেলা হবে।' এর মধ্যে খুসরভ খানের সৈন্যরা লুটপাটে মন দিয়ে

চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে। সামান্য কিছু সৈন্য তার নিজের কাছে। এমন সময় তুলঘক তার সঙ্গীদের নিয়ে তার শিবিরে হানা দিলেন। ভারতে সুলতানকে সহজেই চেনা যায় তার মাথার ওপর ধরে থাকা ছত্র থেকে। ভারতে ও চীনে এটি সদা-সর্বদা রাজার মাথার ওপর ধরা থাকে, তা তিনি বাইরে থাকুন আর ঘরেই থাকুন।

মরণপণ যুদ্ধ হলো তুঘলকের মুসলমান সঙ্গীদের সাথে সুলতানের হিন্দু সঙ্গীদের। সুলতানের সঙ্গীরা হেরে গেল। সঙ্গের কেউ আর রইলো না। তিনি পালালেন। ঘোড়া, সাজ-পোষাক, অস্ত্রশস্ত্র সব ছেড়ে সাধারণ বেশে, হিন্দু সন্ন্যাসীর মতো কাঁধ পর্যন্ত চুল ঝুলিয়ে কাছের একটি বাগানে লুকিয়ে রইলেন।

তুঘলক এবার শহরের পানে এগিয়ে চললেন। তার পিছু পিছু লোকেরা ভিড় বাড়িয়ে চললো। কোতোয়াল শহরের চাবি এনে তার হাতে তুলে দিলেন। তিনি প্রাসাদে গিয়ে উঠলেন, তার একাংশে বাস শুরু করলেন।

কিজলু খানকে সুলতান হবার প্রস্তাব দিলেন তুঘলক। কিজলু খান তাকেই রাজা হতে বললেন। এবার, রাজা কে হবে তাই নিয়ে দু'জনে সমস্যায় পড়লেন। শেষে কিজলু খান বললেন: 'বেশতো, তোমার যদি ইচ্ছা না থাকে, তবে তোমার ছেলে রাজা হোক।' এ প্রস্তাব তুঘলকের মনে ধরলো না, তখন তিনি নিজেই রাজা হতে রাজী হলেন। গণ্যমান্য, সাধারণ মানুষ, সবাই তার আনুগত্য মেনে নিলেন।

এদিকে খুসরভ খান খিদের জ্বালায় কাতর হয়ে তিনদিন পর বাধ্য হয়েই সেই বাগান থেকে বেরিয়ে এলেন। এদিক ওদিক খানিক ঘুরে শেষে সেই বাগানের মালীর কাছে কিছু খেতে চাইলেন। মালী তাকে খাবার মতো কিছুই দিতে পারল না। তখন খুসরভ খান তাকে একটি আংটি দিয়ে বললেন: 'যাও, এটি বাঁধা রেখে খাবার মতো কিছু নিয়ে এসো।' আংটি নিয়ে মালী বাজারে বাঁধা দেবার চেষ্টা করতে লোকের মনে তার প্রতি সন্দেহ দেখা দিল, তাকে ধরে হাকিমের কাছে নিয়ে এলো। হাকিম মালীকে সুলতানের কাছে হাজির করলেন। সুলতানের কাছে মালী সব কথা খুলে বললো। তুঘলক তার ছেলে মুহম্মদকে তার সঙ্গে পাঠালেন খুসরভকে ধরে আনার জন্য। মুহম্মদ তাকে ধরে টাট্টু ঘোড়ায় চাপিয়ে নিয়ে এলেন। তিনি সুলতানের কাছে এসে প্রথমেই কিছু

খেতে চাইলেন। সুলতান তাকে খেতে দিলেন। খাওয়া শেষ ক'রে দাঁড়িয়ে পড়ে খুসরভ বললেন: 'তুঘলক, আমায় তুমি অপমান ক'রো না, রাজার মতো ব্যবহার ক'রো।' তুঘলক বললেন: 'তাই হবে।' তিনি তার মাথা কেটে ফেলার আদেশ দিলেন। যে জায়গাটিতে সুলতান কুতব-উদ-দীনের মাথা কাটা হয়েছিল, ঠিক সেইখানেই তার মাথা কাটা হলো। ঠিক যেমন ক'রে কুতব-উদ-দীনের ধড় ও মুণ্ড প্রাসাদের ছাদ থেকে বাগানে ছুঁড়ে ফেলেছিল, সেই ভাবেই তার ধড়-মুণ্ডও ছুঁড়ে ফেলা হলো। এরপর খুসরভ খান নিজের জন্য যে সমাধি তৈরী ক'রে রেখেছিলেন, সেখানেই প্রথামতো তাকে কবর দেয়া হলো।

সুলতান তুঘলক ন্যায়নিষ্ঠ, সুদক্ষ শাসক হয়ে চার বছর কাল দাপটের সঙ্গে জাঁকিয়ে রাজত্ব ক'রে যান।

রাজধানীতে জাঁকিয়ে বসার পর সুলতান তুঘলক তিলিং বা তেলিঙ্গানা জয় করার জন্য মহম্মদকে পাঠালেন। দিল্লী থেকে তেলিঙ্গানা তিনমাসের পথ। সেখানে পৌঁছে মহম্মদের মনে বিদ্রোহ করার তাড়না জাগল। মহম্মদের সঙ্গে উবাইদ নামে একজন আইনজ্ঞ কবি ছিলেন। তাকে তিনি সুলতানের মৃত্যুর গুজব ছড়াবার নির্দেশ দিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, সুলতানের মৃত্যুর খবর পেয়ে সবাই তাড়াতাড়ি তার আনুগত্য মেনে নেবে। কিন্তু তার ধারণার চাকা উলটো দিকে ঘুরলো। গুজবে কান না দিয়ে আমীররা তারই বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রে বসলো। তাকে হত্যা করতে চাইল তারা। কিন্তু মালিক তমুর মাঝে পড়ে তাদের আটকে দিলেন। মুহম্মদ দশজন অশ্বারোহীকে সঙ্গে নিয়ে পিতার কাছে পালিয়ে এলেন। সুলতান তুঘলক সবই বুঝতে পারলেন। অর্থ ও সৈন্য দিয়ে মুহম্মদকে ফের তিনি তেলিঙ্গানায় যাবার হুকুম দিলেন। কবি উবাইদকে কোতল করা হলো। আমীরদের মধ্যে 'মুহবদার' মালিক কাফুরকে শূলে চড়ালেন। আর সব বিদ্রোহী আমীররা পালিয়ে বাঙলার সুলতান শামস-উদ-দীনের কাছে ঠাঁই নিলেন।

অল্পকাল মধ্যেই বাঙলার সুলতান শামস-উদ-দীনের মৃত্যু হলো। মনোনীত উত্তরাধিকারী শিহাব-উদ-দীন মসনদে বসলেন। কিন্তু ছোট ভাই ঘিয়াস-উদ-দীন বাহাদুর ভূর তাকে হটিয়ে রাজ্য দখল ক'রে নিলেন। ভাইদের মধ্যে কতলু খান ও আরো অনেকে তার হাতে মারা পড়লো। শিহাব-উদ-দীন ও নাসির-উদ-দীন এ দু'ভাই কোনমতে তুঘলকের কাছে পালিয়ে গেলেন। তার সাহায্য

চাইলেন রাজ্য উদ্ধারের জন্য দু'ভাই। তুঘলক ঘিয়াস-উদ-দীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করলেন। সঙ্গে চললেন শিহাব-উদ-দীন ও নাসির-উদ-দীন। সাম্রাজ্য দেখাশোনার জন্য প্রতিনিধি রূপে দিল্লীতে রেখে গেলেন ছেলে মুহম্মদকে। সুলতান তুঘলক ঝড়ের বেগে এগিয়ে গিয়ে লক্ষ্মণাবতীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে দখল ক'রে নিলেন। ঘিয়াস-উদ-দীন বাহাদুর ভূর তার হাতে বন্দী হলেন। তুঘলক নিয়ে এলেন তাকে রাজধানী দিল্লীতে।

বুদাউনের এক বিশিষ্ট ফকীর নিজাম-উদ-দীন এসময়ে দিল্লীতে থাকতেন। দৈব কৃপালাভের আশায় তুঘলকের ছেলে মুহম্মদ প্রায়ই ধরনা দিতেন তার কাছে। এই ফকীর মাঝে মাঝে গভীর ভাবাবেগে আচ্ছন্ন হয়ে পড়তেন। ফকীরের চেলাদের মুহম্মদ বলে রেখেছিলেন যে, যখনই ফকীরের ভাবাবেশ দেখা দেবে, তাকে যেন খবর দেয়া হয়। সেই মতো, একবার ফকীরের ভাবাবেশ দেখা দিতেই মুহম্মদের কাছে খবর গেল। তিনি চটপট তার কাছে ছুটে এলেন। ফকীর তাকে দেখা মাত্র বলে উঠলেন: 'তোমার হাতে আমরা রাজদণ্ড তুলে দিলাম।'

সুলতান তুঘলক যখন একবার দিল্লীর বাইরে, তখন এই ফকীর মারা গেলেন। মুহম্মদ ফকীরের শবাধার নিজের কাঁধে ক'রে বইলেন। ফিরে এসে তুঘলক যখন এ খবর শুনলেন, তিনি ছেলের ওপর খুব চটে গেলেন। ছেলেকে ডেকে বকাবকি ক'রে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক ক'রে দিলেন।

প্রকৃতপক্ষে ছেলের নানা চালচলন, কাজকর্মে সুলতানের ঘোর আপত্তি ছিল। মুহম্মদ প্রচুর সংখ্যায় ক্রীতদাস কিনতেন। লোকের মন কাড়ার জন্য দিল-দরিয়া ভাবে উপহার ও সাহায্য বিলোতেন। ছেলের এই ধরন-ধারন সুলতানের মনে সন্দেহ জাগিয়ে তুলেছিল। মুহম্মদের প্রতি বিরাগও দিন দিন তাই যেন তার বেড়ে চলছিল। তার উপর ইদানিং তার কানে এসেছিল যে, জ্যোতিষীরা মনে করেন, সুলতান এবারকার যাত্রার পর আর দিল্লী শহরে ঢুকতে পারবেন না। একথা শুনে তিনি জ্যোতিষীদের ওপরেও আগুন হয়ে যান।

যাই হোক, লক্ষ্মণাবতী জয় ক'রে ফেরার বেলা দিল্লীর কাছাকাছি পৌঁছে, সুলতান তুঘলক ছেলে মুহম্মদকে আদেশ পাঠালেন, আফঘানপুরে একটি 'কুশক' ধাঁচের প্রাসাদ বানিয়ে দেবার জন্য। মুহম্মদ তিনদিনের মধ্যেই সে প্রাসাদ

বানিয়ে দিলেন। প্রাসাদটির থাম, কড়ি, বরগা থেকে প্রায় সব কিছুই কাঠ দিয়ে তৈরী। সরকারী স্থপতি-প্রধান মালিকজাদা আহম্মদ-এর চতুর নক্সা মতো তারই তত্ত্বাবধানে এই প্রাসাদটি তৈরী হলো। এমন কুটিল কায়দায় একে তৈরী করা হয় যে, এর কোন একটি বিশেষ অংশে হাতীর পা পড়লেই পুরো প্রাসাদটি ভেঙে পড়বে।

স্থলতান তুঘলক সেই প্রাসাদে এলেন। ভোজ দিয়ে অতিথিদের আদর আপ্যায়ন করলেন। খানাপিনা শেষ ক'রে একে একে তারা বিদায় নিলে। মুহম্মদ এসে পিতা তুঘলকের কাছে অভিবাদন জানাবার জন্য প্রাসাদ মধ্যে হাতী নিয়ে আসার অনুমতি চাইলেন। তিনি সম্মতি দিলেন। সেই মুহূর্তে স্থলতানের সঙ্গে ছিল তার প্রিয় ছেলে মামুদ আর শেখ রুকন-উদ-দীন।

শেখ রুকন-উদ-দীন আমায় তার পরের কাহিনী বললেন: "মুহম্মদ এসে আমায় বললো: 'মৌলানা সাহেব, অসর নমাজের সময় হয়েছে, আসুন নমাজ পড়বেন।' আমি চলে এলাম। এবার হাতীর দলকে পরিকল্পনা মতো এক বিশেষ জায়গা দিয়ে ঢোকান হলো। হাতীর দল সেখানে পা ফেলতেই পুরো প্রাসাদটি স্থলতান ও মামুদের মাথায় ভেঙে পড়লো। সে আওয়াজ শুনে, আমি নমাজ না পড়েই ছুটে এলাম। দেখি, পুরো প্রাসাদটিই ধ্বসে পড়েছে। মুহম্মদ লোকজনকে হুকুম দিচ্ছে শাবল, কুড়ুল নিয়ে এসে ভাঙা স্তূপের ভেতর থেকে স্থলতানকে বের ক'রে আনতে। কিন্তু তার গোপন ইঙ্গিত অনুসারে পরের দিন সন্ধ্যার আগে কেউই যন্ত্রপাতি নিয়ে এলো না।

শেষ পর্যন্ত ধ্বংস-স্তূপ সরিয়ে স্থলতানকে বার করা হলো। দেখা গেল, তিনি তার প্রিয় ছেলে মামুদকে বাঁচাবার জন্য তার ওপর ঝুঁকে নিজের শরীর দিয়ে তাকে আড়াল দিয়ে রেখেছেন। কেউ কেউ মনে করেন যে, স্থলতানকে মৃত অবস্থায় বার করা হয়। কতকের ধারণা তখনো তার প্রাণ ছিল, পরে মেরে ফেলা হয়। নিজের নামে তৈরী তুঘলুকাবাদ শহরের বাইরে নিজের জন্যে যে সমাধি-সৌধটি স্থলতান তুঘলক বানিয়ে রেখেছিলেন, সেখানেই রাতারাতি তাকে কবর দেয়া হলো।"

তুঘলুকাবাদ শহর বানানোর ইতিহাস আগেই বলেছি। সেখানেই স্থলতান তুঘলকের ধনাগার ও প্রাসাদ। দিল্লী নগরীর মধ্যে তার গড়া প্রাসাদটিই সব থেকে বড়ো। এর ইটগুলি সোনায় মোড়া। ভোরবেলা প্রাসাদের গায়ে আলো

পড়লে এমন ঝকমক করতে থাকে যে, তার দিকে চেয়ে থাকা কষ্ট। এখানে তিনি অফুরান সম্পদ জমা ক'রে যান। শোনা যায়, প্রাসাদের ভেতরে তিনি একটি পুকুর তৈরী করেন। তার মধ্যে গলানো সোনা ঢেলে তাকে জমাট ক'রে রেখেছিলেন। ছেলে মুহম্মদ সুলতান হবার পর তার সবটাই খরচ ক'রে ফেলেছেন।

দিল্লীর রাজতালিকা

পাঠকদের সুবিধার্থে সুলতান মুহম্মদ পর্যন্ত দিল্লীর মুসলমান সুলতানদের একটি ক্রমিক তালিকা এখানে দেয়া হলো।—সংকলক

খ্রীষ্টাব্দ ১১৯২	দ্বিতীয় তরাইয়ের যুদ্ধে দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজের পরাজয় ও মৃত্যু।
	—মামলুক সুলতানগণ—
„ ১১৯৩	কুতব-উদ-দীন আইবক কর্তৃক দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তর
„ ১২০৮-১০	স্বাধীন সুলতান রূপে কুতব-উদ-দীন আইবকের রাজত্ব
„ ১২১০-১১	কুতব-উদ-দীনের পুত্র আরাম শাহের লাহোরে সিংহাসন আরোহণ ও আটমাসকাল রাজত্বের পর দিল্লী অভিযান কালে মৃত্যু
„ ১২১০-৩৬	দিল্লীতে কুতব-উদ-দীনের জামাতা ইলতুতমিশের সিংহাসন আরোহণ ও রাজত্ব
„ ১২৩৬	ইলতুতমিশের জীবিত-পুত্রদের মধ্যে জেষ্ঠ ফিরোজের নিজেকে সুলতান রূপে ঘোষণা। সাতমাস ব্যর্থ রাজত্বের পর বন্দী ও নিহত
„ ১২৩৬-৪০	ইলতুতমিশের কন্যা সুলতান রজিয়ার রাজত্বকাল
„ ১২৪০-৪২	ইলতুতমিশের তৃতীয় পুত্র মুইজ্জ-উদ-দীন বহরামের রাজত্ব
„ ১২৪২-৪৬	ইলতুতমিশের পৌত্র আলা-উদ-দীন মাসুদের রাজত্ব

খ্রীষ্টাব্দ ১২৪৬-৬৫	ইলতুতমিশের কনিষ্ঠ পুত্র নাসির-উদ-দীন মাহমুদের রাজত্বকাল
„ ১২৬৫-৮৭	নাসির-উদ-দীনের ক্রীতদাস ও নায়েব ঘিয়াস-উদ-দীন বলবনের ক্ষমতা অধিকার ও রাজত্ব
„ ১২৮৭-৮৯	বলবনের পৌত্র কৈকুবাদের রাজত্ব
„ ১২৮৯-৯০	কৈকুবাদের তিন বছর বয়স্ক পুত্র কয়ুনরস বা শমস-উদ-দীনের রাজ্যলাভ
	—খলজী বংশ—
„ ১২৯০-৯৬	জলাল-উদ-দীন ফিরোজের সিংহাসন অধিকার ও রাজত্ব
„ ১২৯৬	রুকন-উদ-দীন ইব্রাহীমের রাজত্ব
„ ১২৯৬-১৩১৬	আলা-উদ-দীন মুহম্মদের রাজত্ব
„ ১২১৬	শিহাব-উদ-দীনের রাজত্ব
„ ১৩১৬-২০	কুতব-উদ-দীন মুবারকের রাজত্ব
	—তুঘলক বংশ—
„ ১৩২০-২৫	ঘিয়াস-উদ-দীন তুঘলকের রাজত্ব
„ ১৩২৫-৫১	মুহম্মদ-এর রাজত্ব

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সুলতান তুঘলক মারা গেলে মুহম্মদ মসনদে বসলেন। কেউ তার পথের কাঁটা হলো না। কোন রকম প্রতিরোধ, প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঘূর্ণীপাকে পড়তে হলো না। এতোদিন লোকে তাকে 'জউন' বলেই জানত। মসনদে বসার বেলা নাম নিলেন 'মুহম্মদ'। বিশেষণ, আবুল মুজাহিদ।

মালিক-জাদা আহমদ কাঠের প্রাসাদটি বানাতে যে প্রতিভার পরিচয় দেন তার পুরস্কার দিতে মুহম্মদ কোন কৃপণতা দেখালেন না। ওই ঘটনার পর থেকে তিনি তাকে খুব কদর দেখাতে থাকলেন। অল্পকালের মধ্যে সে প্রধান উজীরের পদ পেয়ে গেল, খাজা-জহান বিশেষণও লাভ করলো। সুলতান মুহম্মদ শাহ তাকে যতটা শ্রদ্ধা করেন, অন্য আর কাউকে অতোটা করেন কিনা সন্দেহ।

বিগত সুলতানদের যে কাহিনী এতক্ষণ এর আগে শুনিয়েছি তার বেশির ভাগই প্রধান কাজী শেখ কমাল-উদ-দীনের কাছ থেকে শোনা। কিন্তু এবার, বর্তমান সুলতানের কথা যা কিছু বলছি তার প্রায় সবটাই তার রাজ্যে থাকাকালে আমার নিজের চোখে দেখা।

এই সুলতান লোককে দান-ধ্যান করতে, উপহার দিতে সবার চেয়ে বেশি ভালোবাসেন। আবার মানুষের রক্ত ঝরিয়েও যে-কোন লোকের চেয়ে বেশি আনন্দ পান। তার দুয়ারে সব সময়েই এমন কোন না কোন লোককে দেখা যাবে যার তিনি গরীবি দূর করছেন। আবার, এমন লোকও দেখা যাবে যার তখুনি মুণ্ড কোতল হতে চলেছে। তার উদারতা নিয়ে, অন্যায় ও অপরাধকারীদের প্রতি তার নিষ্ঠুর, নির্মম ও হিংস্র আচরণ নিয়ে লোকের মুখে মুখে নানা কাহিনী শোনা যাবে। এ সত্ত্বেও তিনি একজন নম্র, অমায়িক মানুষ। সত্য ও ন্যায় বিচারের দিকে তার অপার অনুরাগ। ইসলামের পতাকা ও সাধ-স্বপ্নকে তিনি এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। নিয়মিত নমাজ পড়ার দিকে তিনি খুব জোর দেন, এদিকে কেউ অবহেলা দেখালে তাকে শাস্তি দিতে কসুর করেন না। তিনি নিঃসন্দেহে ভাগ্যবান রাজাদের একজন, নিজেকে জাহির করার ক্ষমতা অসাধারণ। তবে উদারতাই হলো তার আসল গুণ।

দিল্লীতে সুলতান যেখানে থাকেন সে প্রাসাদটির নাম 'দারসরা'। এতে অনেকগুলি ফটক রয়েছে। প্রথম ফটকটিতে অনেক পাহারাদার। এ ছাড়া আছে ভেরী ও বাঁশী (? সানাই) বাজিয়ের দল। কোন আমীর বা নামী মানুষ এলে বাজনা বাজিয়ে তার আগমন ঘোষণা করা হয় 'অমুক এসেছেন, ...অমুক এসেছেন'। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ফটকেও এ রকম একই ঘটনার আবৃত্তি চলে। প্রথম ফটকের বাইরে একটি মঞ্চের ওপর ঘাতকের দল বসে থাকে। তাদের কাজ হলো মানুষ কোতল করা। কাউকে মেরে ফেলার হুকুম হলে চলতি নিয়ম মতো তাকে প্রাসাদের ফটকের কাছে কোতল করা হয়। তিনদিন কাল তার ধড় মুণ্ড সেখানেই পড়ে থাকে। প্রথম ও দ্বিতীয় ফটকের মাঝে একটি বিরাট মণ্ডপ। তার দুদিকে বাজিয়েদের বসার জন্যে মঞ্চ রয়েছে।

দ্বিতীয় ফটকেও রক্ষীর দল রয়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ফটকের মাঝেও একটি বিরাট মণ্ডপ। সেখানে প্রাসাদ-প্রধান বসে থাকেন। তার হাতে একটি সোনার ছড়ি, মাথায় সোনার টুপী। টুপীটিতে নানারকমের রত্ন বসানো, ময়ূরের পালক আঁটা। তার সামনে প্রাসাদ-কর্মাধ্যক্ষরা দাঁড়িয়ে থাকেন। প্রত্যেকের মাথায় সোনার টুপী, কোমরে বন্ধনী, হাতে একটি ক'রে সোনা বা রূপার হাতলওয়ালা চাবুক। দ্বিতীয় দরজাটি দিয়ে একটি মহাকক্ষে যাওয়া যায়। বাইরের লোকেরা এখানে অপেক্ষা করে।

তৃতীয় ফটকের কাছে একটি মঞ্চে দ্বার-সচিবেরা বসেন। তাদের কাজ হলো সুলতানের অনুমতি ছাড়া কেউ যাতে ভেতরে যেতে না পারে সেদিকে চোখ রাখা। এ ছাড়া, যিনি ভেতরে যাবেন তিনি কতজন সঙ্গী ও সেবক নিয়ে যেতে পারবেন তা ঠিক ক'রে দেয়া। এ ফটকে কেউ এলে দ্বার-সচিবেরা সাথে সাথে তার নাম ধাম, আসার সময় লিখে রাখেন। রাতে, শেষ নমাজের পর সুলতান সেই লেখায় চোখ বোলান। ফটকে দিনভর কি কি ঘটলো তাও লিখে রাখা হয়। কতক মালিকের ছেলের ওপর সুলতানের কাছে তার বিবরণ পেশ করার ভার রয়েছে।

যদি কোন কর্মচারী পর পর তিনদিন বা তার বেশি হাজির না থাকে তবে কাজে যোগ দেবার আগে সেজন্য সুলতানের অনুমতি নিতে হয়। অসুখ বা ওই রকমের কোন কারণে গরহাজির থাকলে আবার কাজে যোগ দেবার সময়ে সুলতানের কাছে নিরাময়-ভেট নিয়ে আসার চল রয়েছে। দূর ভ্রমণের

পর কেউ এলেও এই একই নিয়ম। আইনবেত্তা বা ফকীরেরা এ উপলক্ষে কোরাণ বা ওই ধরণের কিছু উপহার দেন। ফকীরেরা নমাজ পড়ার মাদুর, জপমালা বা দাঁত-মাজনী দেয়। আমীর বা তাদের সমগোত্রীয়রা দেন ঘোড়া, উট, অস্ত্রশস্ত্র।

তৃতীয় ফটক দিয়ে একটি বিরাট দর্শক-মহাকক্ষে যাওয়া যায়। এর নাম 'হাজার-উস্তান' বা হাজার স্তম্ভ। এর থামগুলি সব কাঠের। ছাতও কাঠ দিয়ে তৈরী ও সুন্দর ছবি আঁকা, মেঝেতে মোজাক করা। দর্শনপ্রার্থীরা এখানে অপেক্ষা করে, সুলতান সকলের সঙ্গে এখানে বসে দেখা-সাক্ষাৎ করেন।

চলিত প্রথামতো এই দর্শন-দরবার সাধারণতঃ বিকালের দিকে বসে। সুলতান কিন্তু প্রায়ই সকালের দিকে এই দরবার বসিয়ে থাকেন। সাদা কাপড়ে ঢাকা একটি মঞ্চের ওপর সিংহাসন পাতা। সিংহাসনের ওপর ডাইনে বাঁয়ে পিছনে তাকিয়া রাখা। ভারতীয়রা প্রার্থনার সময় যে ভঙ্গীতে বসে তেমন ক'রে সুলতান এই সিংহাসনে এসে বসেন।

সুলতান আসন নিলে উজীর সামনে এসে তার দিকে মুখ ক'রে দাঁড়ান। উজীরের পিছনে কর্ম-সচিবেরা। তার পিছনে প্রধান ব্যক্তিগত সচিব ও ব্যক্তিগত কর্মচারীরা। তারপর একশো জনের মতো নকীব বা প্রাসাদ-অধ্যক্ষ। ব্যক্তিগত কর্মচারী ও নকীবেরা তারস্বরে 'বিসমিল্লা' ধুয়ো তোলে। মহামালিক (মহারাজ) কবুলা একটি মাছি তাড়ানো চামর নিয়ে এরপর সুলতানের পিছনে এসে দাঁড়ান। একশো জন সেনা ঢাল-তলোয়ার তীর-ধনুক হাতে সুলতানের দু'পাশে খাড়া হয়। অপরাপর সব কার্য-নির্বাহক ও মানীগুণীরা মহাকক্ষের ডাইনে বাঁয়ে সার বেঁধে দাঁড়ান।

এরপর রাজকীয় জিন লাগাম আঁটা ৬০টি ঘোড়া সেখানে হাজির করা হয়। দরবারের দুপাশে দু'ভাগে তাদের এমন ভাবে দাঁড় করিয়ে দেয়া হয় যাতে সুলতান সেগুলি দেখতে পান। এরপর আসে পঞ্চাশটি হাতী। প্রত্যেকটিকে সোনা ও রেশমের কাপড় দিয়ে সাজানো, শুঁড়ে লোহার কণ্টক আটকানো—যাতে সহজেই তারা অপরাধীকে মেরে ফেলতে পারে। প্রত্যেকটির পিঠে বিরাট এক কাঠের বাক্সের মতো হাওদা বসানো, যাতে কম বেশি কুড়ি জন যোদ্ধা বসতে পারে। হাওদার চার কোণে চারটি পতাকা।

প্রত্যেক হাতীর ওপর এক একজন মাহুত বসে। এই হাতীদের মাথা নিচু ক'রে সম্রাটকে অভিবাদন জানাতে শেখানো হয়েছে। যখন তারা সেলাম জানায় তখন ব্যক্তিগত কর্মচারীরা জোর 'বিসমিল্লা' ধুয়ো তোলে। হাতীগুলিকে ঘোড়াগুলোর মতোই দুদিকে দুভাগ ক'রে দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়। মাঝখানে দর্শনপ্রার্থী। ব্যক্তিগত কর্মচারীরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে গিয়ে তারা সুলতানকে অভিবাদন জানায়। সঙ্গে সঙ্গে সেই কর্মচারীরা 'বিসমিল্লা' ধুয়ো তোলে। এই ধুয়ো কোন সরগম পর্যন্ত চড়বে তা নির্ভর করে অভিবাদনকারী লোকটির মর্যাদার ওপর। যার মর্যাদা যতো উঁচু তার অভিবাদন সময়ে ধুয়োর সরগমও ততো উঁচু। অভিবাদন শেষে লোকটি এসে আবার নিজের জায়গায় দাঁড়ায়। যদি কোন হিন্দু কাফের অভিবাদন জানায় তবে 'হদাকুল্লাহ্' বা 'আল্লা তোমায় পথ দেখাক' ধুয়ো তোলা হয়। সুলতানের ক্রীতদাসেরা ঢাল-তলোয়ার নিয়ে প্রত্যেকটি লোকের পিছনে দাঁড়িয়ে থাকে।

কোন লোক উপহার দিতে এলে সে লোকটির মর্যাদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ব্যক্তিগত কর্মচারীদের একজন সুলতানের কাছে পর পর তিনবার কুর্নিশ জানিয়ে সে খবর পেশ করে। সে লোককে দরবারে আনার হুকুম দেয়া হলে তার নিয়ে আসা উপহার তারা একদল চাকরের হাতে তুলে দেয়। তারা সে-সব এমন ভাবে লোকজনের সামনে মেলে ধরে যাতে সুলতানও তা ভালভাবে দেখতে পান। এরপর যিনি সেই উপহার দিয়েছেন তাকে দরবারে আনা হয়। তিনি ভেতরে এসে সুলতানকে তিনবার কুর্নিশ জানান। তিনি কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি হলে আমীর হাজীবের সারিতে দাঁড়ান। নয়তো, তার পিছনে। সুলতান অমায়িক ভাবে তাকে স্বাগত জানান, কথাবার্তা বলেন। বিশেষ মানী লোক কেউ হলে তিনি তার হাতে ঝাঁকুনী দিয়ে শুভেচ্ছা জানান, এমন কি জড়িয়েও ধরেন। হয়ত তার আনা উপহারের মধ্যে কতক দেখতে চান। উপহার পোষাক বা অস্ত্র হলে সুলতান তা উলটে পালটে দেখেন। লোকটিকে খুশী করার জন্য মুখে আনন্দ প্রকাশ করেন বা জিনিষটির তারিফ করেন। এরপর প্রচলিত প্রথা মতো তাকে একটি পোষাক ও মাথা ধোয়ার খরচ হিসেবে কিছু টাকা দেন। এ টাকার পরিমাণ লোকটির প্রতিভা ও মর্যাদার ওপর নির্ভর করে।

প্রতিবছর দুটি ঈদ উৎসবই মহা-ধুমধামের সঙ্গে পালন করা হতো। উৎসবের

আগের দিন রাজ্যের বিশিষ্ট কর্মচারী ও ব্যক্তিবর্গকে পাঠাতেন সম্রাট পোষাক উপহার। আমীর, সভাসদ, অইজ্জ, বিভাগীয় সচিব, ঘরোয়া-কর্মচারী, প্রাসাদ-কর্মী বা নকীব, সমর বিভাগীয় প্রধানরা, সংবাদ পরিবেশক, ক্রীতদাস—কেউই বাদ পড়তো না। ঈদের প্রভাতে সবগুলি হাতীকে রেশম বস্ত্র, সোনা ও রত্ন আভরণে সাজানো হতো। এর মধ্যে ষোলটি হাতী ছিল শুধু সম্রাটের ব্যবহারের জন্য পৃথক করা, অন্য কেউই পেতেন না সেগুলি ব্যবহারের কোন সুযোগ। এই রাজ-হাতীগুলির প্রতিটিকে করা হতো রাজছত্র-শোভিত। প্রত্যেকটি রাজছত্রই রত্ন খচিত। বাঁটগুলি নিখাদ সোনা দিয়ে তৈরী। প্রতিটি হাতীর পিঠেই বসানো হতো একটি হাওদা। হাওদাটি রেশমী বস্ত্র দিয়ে মোড়া, সুন্দরভাবে রত্ন খচিত। এই ষোলটি হাতীর মধ্যে আপন পছন্দ মতো যে কোন একটিতে সম্রাট চড়তেন। সেটির আগে আগে বয়ে নিয়ে যাওয়া হতো অতি মূল্যবান নানা রত্ন খচিত একটি ঘাসিয়া। রাজ-হাতীটির পিঠে বসে থাকা সম্রাটের আগে আগে চলতেন তার ভৃত্য ও ক্রীতদাসের দল। প্রত্যেকের মাথায় একটি ক'রে সোনার টুপি, কোমরে একটি ক'রে সোনার কোমরবন্ধনী। কারো কারো বন্ধনীটি আবার রত্ন খচিত। নকীবরাও যেতেন সম্রাটের আগে আগে। প্রায় তিনশো জনের কাছাকাছি তারা। প্রত্যেকের মাথায় সোনার পশু-লোমে ঢাকা টুপি, কোমরে সোনার কোমর বন্ধনী, হাতে একটি ক'রে সোনার দণ্ড। চলেছেন তাদের সাথে সাথে রাজ্যের প্রধান কাজী বা সদর ঘজনা নিবাসী সদর-ই জহান কমাল-উদ-দীন। চলেছেন খওয়ারিজম-বাসী প্রধান কাজী সদর-ই জহান নাসির-উদ-দীন। এ ছাড়াও চলেছেন খুরাসান, ইরাক, সিরিয়া, মিশর ও পশ্চিম দেশবাসী (উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা) কাজী ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। প্রত্যেকেই এক একটি হাতীতে চেপে। হিন্দুস্তানে সব বিদেশীকেই খুরাসানী বলা হয়ে থাকে। মুয়জ্জিনরাও যান হাতীতে চেপেই। যান সারা পথ আল্লা-হো-আকবর ধ্বনি দিতে দিতে।

প্রত্যেক আমীর তার অধীন সেনাবাহিনী নিয়ে প্রাসাদের বাইরে সম্রাটের প্রতীক্ষা ক'রে চলেন। প্রত্যেকেই তারা নিজ নিজ বাহিনীর পুরোভাগে। সাথে নিজস্ব নাকাড়া, নিজস্ব পতাকা। সম্রাট শোভাযাত্রা ক'রে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এলে তার পুরোভাগে চলতে থাকেন তারা। একেবারে সকলের পুরোভাগে থাকেন কাজী ও মুয়জ্জিনরা। আগের মতোই সারাপথ তারা ঈশ্বরের মহিমা-ধ্বনি-

দিতে দিতে এগিয়ে চলেন। সম্রাটের পিছু পিছু বয়ে চলা হয় তার প্রতীক-চিহ্নগুলি। অর্থাৎ রাজ পতাকা ও নাকাড়া বা ভেরি, দামামা, তুরী, শিঙা, শানাই প্রভৃতি। তার পিছু পিছু তার পারিষদবর্গ। এরপর চলেন সম্রাট-অনুজ মুবারক খান। সঙ্গে তার আপন প্রতীক-চিহ্নাদি, কর্মী ও সেনাবাহিনী। এরপর সম্রাটের সৎ-ভাই বহরাম খান, তার প্রতীক ও অনুগামীদের নিয়ে। তার পিছু পিছু সুলতানের খুড়তুতো ভাই মালিক ফিরোজ। তার পিছু ওয়জীর। এরপর ধুরিজার পুত্র মালিক মনজুর। তার পিছে মালিক-উল-কবীর কবুল। প্রত্যেকেরই সঙ্গে তার প্রতীক, অনুচর ও সেনাবাহিনী।

ওপরে নাম করা মালিক কবুলকে সম্রাট বিশেষভাবে শ্রদ্ধা করতেন। বেশ উঁচু পদে আসীন ছিলেন তিনি, ছিলেন প্রচুর ধনসম্পদের অধিকারী। তার প্রধান দীওয়ান সিকৎ-উল-মুল্ক আলা-উদ-দীন আলী ছিলেন মিশরের অধিবাসী। সাধারণতঃ সবাই তাকে ইবন শরাবিশী বলে ডাকতেন। তার কাছে শুনেছি, কর্মচারী-বাহিনীর বেতন ও ভাতা সহ মালিক কবুলের বার্ষিক খরচ ছিল ৩৬ লক্ষ তঙ্কা।

এই ঈদ শোভাযাত্রায় মালিক কবুলের পর স্থান নিতেন আপন প্রতীক ও অনুগামী-সহ মালিক নুকবীয়া। তারপর প্রতীক ও সেনাদল সহ যথাক্রমে মালিক বুঘরা, মালিক মুখলিস ও মালিক কুতব-উল-মুল্ক। এই প্রধান আমীররা শুধু ঈদ-শোভাযাত্রাতেই নয়, সর্বদাই সম্রাটের সঙ্গে সঙ্গে থাকতেন। কখনো কাছ ছাড়া হতেন না তার। এদের পিছু পিছু যেতেন অন্যান্য আমীররা তাদের সেনাদল নিয়ে। কিন্তু এদের কোন পতাকা ও নাকাড়া বা প্রতীক ছিল না। প্রত্যেক ঘোড় সওয়ারই বর্ম-সাজে সেজে শোভাযাত্রায় অংশ নিতেন। ঘোড়া-গুলিকেও পরানো হতো তাদের বর্মসাজ। এই ঘোড়সওয়ারদের মধ্যে অধিকাংশই সম্রাটের ক্রীতদাস।

মসজিদের ফটকে পৌঁছে থেমে যেতেন সম্রাট। কাজী ও প্রধান আমীরদের ভেতরে প্রবেশের নির্দেশ দিতেন। প্রবেশের অনুমতি দেয়া হতো বিশিষ্ট অইজ্জদেরও। এরপর হাতীর পিঠ থেকে নেমে নিজে মসজিদের ভেতরে যেতেন। ইমাম এরপর প্রার্থনা অনুষ্ঠান শুরু করতেন, শোনাতেন ধর্মোপদেশ।

পর্বটি ঈদ-উল-অজ্জহা হলে সম্রাট একটি উট সঙ্গে নিয়ে আসতেন। বর্শা, হিন্দুস্তানে যাকে নেজা বলা হয়, তাই দিয়ে হত্যা করতেন সেটিকে। এসময়ে

পোষাকে যাতে রক্তের ছিটা না লাগে সেজন্য একটি পৃথক রেশম বস্ত্র দিয়ে নিজের পোষাক ঢেকে নিতেন তিনি।

অনুষ্ঠান শেষে আবার একটি হাতীতে চেপে ফিরে যেতেন তিনি আপন প্রাসাদে।

উৎসব উপলক্ষে সমগ্র প্রাসাদ এলাকা মনোরম ক'রে সাজান হতো। ঝোলানো হতো দেয়ালে দেয়ালে অপূর্ব সব চারুকলা শোভিত পর্দা। খাটানো হতো দরবার-কক্ষ পর্যন্ত সারাপথ জুড়ে সুদীর্ঘ এক শামিয়ানা। তার দুপাশের ফাঁকা জায়গায় সারি সারি মাথা তুলতো অসংখ্য তাঁবু। দরবার মহাকক্ষটিকে সাজানো হতো বিভিন্ন রঙা রেশম বস্ত্র দিয়ে তৈরি তিন সারি নকল গাছ দিয়ে। প্রতিটি গাছে কুঁড়ি ও ফুলের চোখ-জুড়ানো সমারোহ। প্রতি জোড়া গাছের ঠিক মাঝখানে একটি ক'রে চৌকি। সোনার চৌকি। তার ওপর একটি ক'রে কোমল আসন পাতা। একেবারে সুমুখে একটি উঁচু রাজ-সিংহাসন। পুরোটাই তার বিশুদ্ধ সোনা দিয়ে গড়া। প্রতিটি পায়া নিপুণভাবে রত্ন-খচিত। সিংহাসনটি তেইশ বিঘত দীঘল। প্রস্থ তার আধেক। এর প্রতিটি অংশ আলাদা আলাদা ক'রে তৈরী। তাই, যখন খুশী জোড়া যায় আবার দরকার মতো খুলে রাখা যায়। একেবারে খাঁটি সোনায় তৈরী বলে, প্রতিটি অংশই বেশ ভারি। জোড়া কি খোলার সময়ে সেগুলি ওঠা-নামা করার জন্য বেশ কয়েকজন ক'রে লোকের দরকার হয়। সিংহাসনের ওপর একটি নরম গদী বিছানো। মাথার ওপরে একটি রত্ন-খচিত রাজছত্র।

সম্রাট সিংহাসনে বসা মাত্র তার ঘরোয়া ও প্রাসাদ কর্মচারীর দল তারস্বরে 'বিসমিল্লা' ধ্বনি তোলেন। তারপর শুরু হয় তাকে অভিবাদন জানাবার পালা। প্রথমে কাজীরা। এরপর খতীব-রা। এরপর উলেমারা। তাদের পর সঈদরা। তাদের পর সন্ত বা মশাইখরা। এদের অভিবাদন জানানো শেষ হবার পর শুরু হয় সম্রাটের ভাই, জ্ঞাতি ও শ্যালকদের অভিবাদন জানানোর পালা। একের পর আর, তারা অভিবাদন শেষ করলে শুরু করেন ক্রমান্বয়ে অভিবাদন জানাতে অইজ্জ, ওয়জীর ও সমর-বিভাগীয় প্রধানরা। এরপর অভিবাদন জানায় প্রবীণ ক্রীতদাসদের মধ্যে যারা বয়োবৃদ্ধ, তারা। তারপর সেনাবাহিনীর নায়কের দল। প্রত্যেকেই তার ক্রম অনুসারে একের পর এক শৃঙ্খলা মেনে অভিবাদন ও অভি-নন্দন জানিয়ে চলেন সম্রাটকে। ঈদ উৎসবের এই বিশেষ দিনটিতে আরো একটি

বিশেষ প্রথার চল রয়েছে হিন্দুস্তানে। যিনিই একটি গ্রামের অধিকারী, তিনিই এদিন সম্রাটকে কিছু না কিছু পরিমাণ সোনা-মোহর নজরানা দিয়ে থাকেন। প্রত্যেকেই তা একখণ্ড রুমালে বেঁধে, তার ওপর নিজের নাম ধাম লিখে নিয়ে আসেন। সম্রাটের সুমুখে থাকা একটি সোনার থালায় সেগুলি রেখে তারা তাকে অভিবাদন জানায়। এভাবে বিপুল সম্পদ সংগৃহীত হয় সেদিনটিতে। সম্রাটও আপন খুশী মতো এ সম্পদ বিলিয়ে দেন।

অভিবাদন পর্ব শেষ হলে আরম্ভ হয় ভোজ পর্ব। উপস্থিত প্রত্যেককে তাদের পদমর্যাদা অনুযায়ী খাদ্য পরিবেশন করা হয়। দরবারে স্থাপনা করা হয় এদিন বিরাট একটি ধুনুচী। এটি আকৃতিতে একটি গম্বুজের মতো। খাঁটি সোনা দিয়ে তৈরী। প্রতিটি অংশ আলাদা আলাদা ভাবে। ইচ্ছামতো যখন খুশী জুড়ে নেয়া যায়। জোড়া দেয়ার সময় প্রতিটি অংশ তোলার জন্য জনাকয়েক লোকের প্রয়োজন হয়। ধুনুচীর ভেতরটি তিনটি খোপে বিভক্ত। সুগন্ধি দাহক সেই পথ দিয়ে ভেতরে গিয়ে কমারী, কাকুলী, প্রভৃতি সুগন্ধি কাঠ, তিমি মাছের অন্ত্রজাত সুরভি, গুগ্‌গুল ইত্যাদি পোড়ায়। তাঁর সুগন্ধিতে সারা দরবার তখন সুরভিত হয়ে ওঠে। বালক ভৃত্যেরা সোনা ও রূপার আধারে গোলাপ জল ও সুগন্ধি পুষ্পজল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। প্রত্যেকের গায়ে উদারভাবে ছিটিয়ে চলে তা। এই সিংহাসন ও ধুনুচী দুটিই এই দুই ঈদ পর্ব উপলক্ষেই মাত্র বার করা হয়ে থাকে। পরবর্তী দিনগুলিতে অন্য একটি সোনার সিংহাসনে বসেন সুলতান। সিংহাসন থেকে কিছুটা দূরে তিন দরজা-অলা একটি ঘেরা-শামিয়ানা খাটানো হয়। তার ভেতরেই বসেন সম্রাট। প্রথম দরজাটিতে দাঁড়িয়ে থাকেন ইমাম-উল-মুল্‌ক সরতেজ। দ্বিতীয় দরজাটিতে দাঁড়ান মালিক নুকবীয়া। আর তৃতীয়টিতে ইউসুফ বুঘরা। সুলতানের ডান ও বামে দাঁড়ান অস্ত্রধারী ক্রীতদাস-দের প্রধানরা। উপস্থিত অন্যান্য ব্যক্তিরা প্রত্যেকে তার পদমর্যাদা অনুসারে নির্দিষ্ট ক'রে দেয়া স্থানটিতে দাঁড়িয়ে থাকেন। এই শামিয়ানা নিয়ামক মালিক তঘী উপস্থিত থাকেন সেখানে একটি সোনার দণ্ড হাতে নিয়ে। তার সহকারীর হাতে থাকে একটি রূপার দণ্ড। উপস্থিত দর্শকেরা যাতে সরল রেখায় সারিবদ্ধ হয়ে স্বস্থানে দাঁড়িয়ে থাকে সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন তারা। ওয়জীর ও বিভাগীয় সবিচরা তার সহকারীর পিছনে দাঁড়ান। ঘরোয়া ও প্রাসাদ কর্মচারীরাও তাই।

এরপর শুরু হয় অনুষ্ঠান। উপস্থিত করা হয় গায়িকা ও নর্তকীদের। প্রথম

দলটিতে থাকে সেইসব কাফের বা হিন্দু রাজাদের কন্যারা যাদের চলতি বছরের যুদ্ধে বন্দিনী ক'রে আনা হয়েছে। ক'রে চলে তারা নাচ ও গান। এরপর আমীর ও অইজ্জদের মধ্যে এদের বিলিয়ে দেন সম্রাট। উপস্থিত করা হয় এরপর অন্যান্য কাফের কন্যাদের। ক'রে চলে তারাও নাচ ও গান। এরপর সুলতান এদের বিলিয়ে দেন তার ভাই, জ্ঞাতি, শ্যালক ও মালিক-পুত্রদের মধ্যে।

এই দরবার বসে সাধারণতঃ বিকালের দিকে। দ্বিতীয় দিনেও আগের দিনের মতো একই সময়ে শুরু হয় অনুষ্ঠান। একই ক্রম অনুসারে উপস্থিত করা হয় গায়িকা ও নর্তকীদের। তারা নাচ-গান পরিবেশন করার পর সুলতান তাদের বিলিয়ে দেন প্রধান ক্রীতদাসদের মধ্যে। তৃতীয় দিনে সুলতান তার আত্মীয় স্বজনদের বিবাহ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। দেন নব-দম্পতিদের নানারকম উপহার-সামগ্রী। চতুর্থ দিনে দেয়া হতো ক্রীতদাসদের দাস-জীবন থেকে অব্যাহতি। পঞ্চমদিনে মুক্ত ক'রে দেয়া হতো ক্রীতদাসীদের। ষষ্ঠ দিনে দেয়া হতো পুরুষ দাসদের সাথে মেয়ে-দাসদের বিবাহ। এরপর সপ্তম দিনে চলতো অতি ব্যাপক আকারে দান ও বিতরণ।

প্রত্যেক মুসলমান নাগরিক যাতে নিয়মিত ভাবে নমাজে যোগ দেন সেদিকে কঠোর দৃষ্টি দিতেন সুলতান। কেউ যাতে নমাজে যোগদানে কোনরকম শৈথিল্য না দেখান সেজন্য তিনি এক স্থায়ী নির্দেশ জারী করেন। করা হয়েছিল অবহেলা-কারীদের জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা। একবার এই অপরাধের দরুন একটি দিনে নজনকে হত্যার আদেশ দেন। এদের মধ্যে একজন ছিলেন সঙ্গীতজ্ঞ। কেউ এ বিষয়ে তার আদেশ অমান্য করছে কিনা তা দেখার জন্য দিনের বিশেষ বিশেষ সময়ে বিভিন্ন মহল্লায় পরিদর্শক পাঠানো হতো। যদি দেখা যেত, কোন মুসলমান নমাজে যোগ না দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে বা অন্য কোন কাজে মগ্ন রয়েছে, অমনি দণ্ড দেয়া হতো তাদের। সকলেই সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো এর ফলে। পরিস্থিতি এতদূর গড়ালো যে যে-সব সহিস ও ভৃত্যরা দরবার মহাকক্ষে উপস্থিত কর্মচারীদের বাহন দেখা-শোনা করতো তারাও শাস্তির ভয়ে বাহন ফেলে নমাজে যোগ দেয়ার জন্য ছুটতে শুরু করলো। প্রত্যেক মুসলমান যাতে ওজু ও নমাজের বিধি-নিয়ম ও ইসলাম ধর্মের মূলতত্ত্ব ও অনুশাসনগুলি আয়ত্ত করেন সে জন্যও সুলতান ফরমান জারী করেন। এবং প্রায়ই তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হতো এ সব সম্পর্কে। যারা সন্তোষজনক উত্তর দিতে ব্যর্থ হতো', জুটতো তাদের ভাগ্যে শাস্তি। ফলে, কি

মহল্লার অধিবাসীরা, কি দরবার কর্মীরা সকলেই লেখা-পড়া শিখে এসব চর্চার দিকে মনোযোগী হয়ে ওঠেন।

আইনের শাসন বলবৎ করার দিকেও তার কঠোর আগ্রহ ছিল। এবিষয়ে তার চালু করা রীতি-নীতিগুলির মধ্যে নিচেরটি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ভাই মুবারক খানকে সুলতান নির্দেশ দিয়েছিলেন, তিনি যেন নিয়মিত ভাবে পরিষদ মহাকক্ষে প্রধান কাজী কমালউদ্দীনের পাশে বসেন। সেখানে কাজীর জন্য ঠিক সুলতানের মতো সম্পূর্ণ গদী মোড়া একটি বিশেষ মঞ্চ ছিল। তাতে বসতেন কাজী কমাল-উদ-দীন। সুলতানের ভাই বসতেন তার ডাইনে। তার জন্য করা হয়েছিল কার্পেট মোড়া পৃথক একটি উচু মিনারের আকৃতির মঞ্চের ব্যবস্থা। তার গোমস্তা ন্যায় বিচারের জন্য কাজীর কাছে বিভিন্ন অভিযোগ উপস্থাপিত ক'রে চলতেন। কোন আমীর, তিনি যতো বিরাটই হোন না কেন, যদি কোন পাওনাদারেকে তার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করতেন তবে সে সম্পর্কিত অভিযোগও বিচারের জন্য পেশ করা হতো এখানে।

উদার সম্রাট যে কতো লোকের ওপর অযাচিত অনুগ্রহ বর্ষণ করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। ন্যায় বিচারের প্রতিও তার আগ্রহ ছিল তুলনাহীন। একবার একজন বিশিষ্ট হিন্দু তার বিরুদ্ধে মামলা আনলেন। অভিযোগ—তিনি তার ভাইকে বিনা অপরাধে হত্যা করেছেন। কাজীর এজলাসে সুলতানকে ডাকা হলো। তিনি পায়ে হেঁটে সেখানে উপস্থিত হলেন। আসার আগেই তিনি কাজীকে নির্দেশ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি এজলাসে উপস্থিত হলে কাজী যেন তার প্রতি সম্রাটের সম্মান না দেখান। তাই হলো। বিচার শেষে কাজী সম্রাটের বিরুদ্ধে রায় দিলেন। বিনা অপরাধে ভাইকে হত্যা করার জন্য উপযুক্ত খেসারত দিয়ে বাদীপক্ষকে সন্তুষ্ট করার আদেশ দিলেন। সম্রাট সে রায় মাথা পেতে মেনে নিলেন, সেইমতো খেসারতও দিলেন।

আর একবার একজন মুসলমান টাকা দাবী ক'রে একটি মামলা আনলো। সে মামলারও বিচার হলো কাজীর এজলাসে। কাজী সুলতানের বিপক্ষে রায় দিলেন। দাবী মতো বাদীকে খেসারত দেবার আদেশ হলো সম্রাটের প্রতি। তিনি বিনা ওজরে তা পালন করলেন।

মালিক বা রাজাদের ছেলেদের মধ্য থেকে একজন একবার একটি মামলা দায়ের করলো। তার অভিযোগ, সম্রাট তাকে বিনা অপরাধে মেরেছেন। বিচার শেষে

কাজী রায় দিলেন—হয় সুলতান টাকা দিয়ে বাদীর সঙ্গে নিষ্পত্তি করুক নয়তো বাদী সুলতানকে মেরে তাকে মারার প্রতিশোধ নিক। আদালত থেকে ফিরে এসে আমার সামনে সুলতান সেই ছেলেটিকে ডেকে পাঠালেন। সে এলে তার হাতে একটি বেত তুলে দিয়ে তিনি বললেন—আমার মাথার দিব্বি দিয়ে তোমাকে বলছি, তোমাকে ঠিক যেভাবে আমি মেরেছিলাম, আমাকেও তুমি ঠিক তেমনি ক'রে মারো।' হতভম্ব ছেলেটি তখন কী আর করে! বেতটি নিয়ে সম্রাটকে ২১ বার আঘাত করলো। আঘাতের ফলে সম্রাটের মাথা থেকে উষ্ণীষ খসে পড়লো।

সেবার সিন্ধ ও হিন্দের সব দেশ জুড়ে মন্বন্তর দেখা দিল, জিনিষপত্রের দাম ক্রমে ক্রমে আগুন হয়ে উঠলো। এক মণ (বর্তমান ১৪ সের) গম ৬ দীনার (৬ টাকায়) মূল্যে বিক্রী শুরু হলো। সুলতান আদেশ দিলেন, দিল্লীর প্রত্যেক নাগরিককে দৈনিক ১২ ছটাক হারে ছ'মাস খাদ্য জুগিয়ে যাওয়া হোক। বড়-লোক, গরিব, স্বাধীন, দাস কেউ যেন বাদ না যায়। আইনবেত্তা ও বিচারকেরা বিভিন্ন রাস্তায় ঘুরে সকলের নাম তালিকা করলেন। ভিক্ষুকদের এক ঠাঁই করা হলো। প্রত্যেককে বিনা পয়সায় ছ'মাস ধরে খাবার যুগিয়ে যাওয়া হলো।

হিজরী ৭৪১ অব্দে (১৩৪০-৪১ খ্রীষ্টাব্দ) সুলতান তার রাজ্যে (ব্যবসায়ীদের ওপর থেকে) সব রকম শুল্ক তুলে নিলেন। ঘোষণা করলেন, এবার থেকে (মুসলমানদের) জকাৎ ও (বিধর্মীদের) উশর ছাড়া দিতে হবে না আর কোনরকম শুল্ক।

পরিষদ-মহাকক্ষের সামনে প্রশস্ত এক খোলা উঠানে তিনি নিজে প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার অল-নজর ফিল মজালিস বা সর্বোচ্চ ফৌজদারী আদালত বসাতেন। এ দুটি দিন পেত না তার আছে অন্য আর কেউ দাঁড়াবার সুযোগ। শুধু যা আমীর হাজিব, খাস হাজিব, সঈদ-উল-হাজিব ও সরথ-উল-হাজিবই সুমুখে দাঁড়িয়ে থাকতেন। যিনিই কোন অভিযোগ জানাতে চাইতেন বিনা বাধায় তিনি উপস্থিত হওয়ার সুযোগ পেতেন সুলতানের কাছে। অভিযোগ-কারীদের কাছ থেকে আবেদন গ্রহণের জন্য পরিষদ মহাকক্ষের চারটি ফটকে চারজন প্রধান আমীরকে তিনি নিযুক্ত করেন। এদের মধ্যে চতুর্থ-জন ছিলেন সম্রাটের খুড়তুতো ভাই মালিক ফিরোজ। প্রথম ফটকে উপস্থিত আমীর যদি

অভিযোগকারীর কাছ থেকে আবেদন গ্রহণ করেন, ভালো কথা ; নয়তো সুযোগ পেতেন অভিযোগকারী সেটি দ্বিতীয়, তৃতীয় অথবা চতুর্থ ফটকের যে কোনটিতে জমা দেয়ার। যদি কোন কারণে চার ফটকের চার আমীরই তা গ্রহণে অস্বীকার করতেন, অভিযোগকারী সুযোগ পেতেন তা সদর-ই জহান কাজী-উল-মমালিক (রাজ্যের প্রধান কাজী)-এর কাছে পেশ করার। যদি শেষোক্ত জন তা গ্রহণ করেন ভালো, নাহলে পেত অভিযোগকারী তা সরাসরি সুলতানের কাছে পেশ করার সুযোগ। সুলতান তখন তদন্ত ক'রে দেখতেন সত্যিই তাদের কারো কাছে উপস্থিত হয়েছিল কিনা অভিযোগকারী। এবং সে তার আবেদন গ্রহণে অস্বীকার করেছে কিনা। তখন দোষী কর্মচারীকে এজন্য উপযুক্ত শাস্তি পেতে হতো। সোম বৃহস্পতি ছাড়া অন্য দিনগুলিতে যে সব অভিযোগপত্র জমা পড়তো সেগুলি সম্রাট ইশা বা রাতের শেষ প্রার্থনার পর পরীক্ষা ক'রে দেখতেন।

অসামান্য উদারতা, গরিবদের প্রতি মায়ামমতা, সাম্য ও ন্যায়বিচার-প্রাণতা এবং বিনয় ভাব সত্ত্বেও সুলতানের মধ্যে রক্ত পিপাসার যেন শেষ ছিল না। তার দুয়ার কদাচিত মৃতদেহ-শূন্য দেখা যেত। প্রায়ই দেখতাম, একদল লোককে ফটকের কাছে কোতল ক'রে তাদের ধড়মুণ্ড ফেলে রাখা হয়েছে। একদিন ঘোড়ায় চড়ে ফটকের কাছে আসতে মাটিতে কতক সাদা পদার্থ পড়ে থাকতে দেখে চমকে গেলাম। এগুলো কি জানতে চাইলে এক সহচর বললো —এটি একজন মানুষের মুণ্ড-হাত-পা হীন ধড়, লোকটাকে তিন টুকরো ক'রে কেটে ফেলা হয়েছে।

ছোট-বড় সব রকম দোষেই সুলতান শাস্তি দিতেন। বিদ্বান, সাধু, অভিজাত কেউ-ই রেহাই পেত না। প্রতিদিন শয়ে শয়ে লোককে শিকল দিয়ে দু'হাত ঘাড়ের সঙ্গে বাঁধা, দু'পা আঁটা অবস্থায় দরবার কক্ষে নিয়ে আসা হতো। তাদের কারো ভাগ্যে জুটতো কোতল আদেশ, কারো ভাগ্যে চাবুক মারা, কারো ওপর নিপীড়ন। শুক্রবার ছাড়া অন্য সবদিনই এ দৃশ্য দেখা যেত।

সুলতানের এক ভাই ছিল। নাম মাসুদ খান। তার মা সম্রাট আলা-উদ-দীনের মেয়ে। মাসুদ খানের চেহারা খুব সুন্দর ছিল। এতো সুন্দর লোক পৃথিবীতে আর দেখিনি। সুলতান তাকে বিদ্রোহের দায়ে অভিযুক্ত করেন। যার বিরুদ্ধে সুলতান কোন অভিযোগ আনতেন তিনি তা অস্বীকার করলে তার

ওপর অশেষ নির্যাতন চালানো হতো। এজন্য অনেকেই ওই নির্যাতনের চেয়ে মৃত্যুকে শ্রেয় মনে করতো। মাসুদ খানও তাই তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ স্বীকার ক'রে নিলেন। সুলতান তখন তার মাথা কেটে ফেলার হুকুম দিলেন। বাজারের মধ্যে তাকে কেটে ফেলা হলো। তার ধড়মুণ্ড নিয়মমতো তিনদিন সেখানে পড়ে রইলো।

এ ঘটনার দু বছর আগে তার মাকেও এই একই জায়গায় অসতীত্বের অপরাধ স্বীকার ক'রে নেয়ার ফলে পাথর ছুঁড়ে ছুঁড়ে মেরে ফেলা হয়। কাজী কমাল-উদ-দীন তার ওপর পাথর ছোঁড়েন।

দিল্লী প্রদেশের প্রান্তসীমানার পাহাড়গুলিতে থাকা কাফেরদের দমন করার জন্য সুলতান একবার মালিক ইউসুফ বুখারার অধীন এক সৈন্য বাহিনীর ওপর আদেশ দেন। মালিক ইউসুফ আদেশ মতো সৈন্যদল নিয়ে গেলেন। বাহিনীর বেশির ভাগ সৈন্যই তার সঙ্গে গেল। কিন্তু কতক সে আদেশ মানল না। সুলতানের কানে সে খবর পৌঁছল। তিনি দিল্লী ঘেরাও ক'রে ওই সব সৈন্যদের খুঁজে বের করার আদেশ দিলেন। তাই করা হলো। মোট ৩৫০ জন সৈন্য ধরা পড়লো। সুলতান সবাইকে কেটে ফেলার হুকুম করলেন। এক ঘণ্টার মধ্যে সে কাজ সমাধা হলো।

যে কিজলু খানের জন্য পিতা তুঘলক দিল্লীর সিংহাসন দখল করতে পেরেছিলেন, সুলতান তাকেও হত্যা করতে দ্বিধা করেননি।

প্রত্যেক আমীরের পিছনে সম্রাট তার একজন বান্দাকে গুপ্তচর হিসাবে রাখতেন। সে আমীর ছোটই হোক আর বড়োই হোক। এই বান্দারা সম্রাটের কাছে তার বিষয়ে সব খবরাখবর যোগান দিত। গোপন খবর সংগ্রহের জন্য তিনি আমীরদের বাড়িতে বাঁদীও নিযুক্ত করতেন। খবর আদান-প্রদানের মাধ্যম হিসাবে মেথরাণী, ঝাড়ুদারণীদেরও তিনি কাজে লাগাতেন। তারা কোন অছিলায় বাড়ীর মধ্যে ঢুকে বাঁদীদের কাছ থেকে খবর সংগ্রহ ক'রে আনতো। শোনা যায়, একবার এক আমীর রাতে স্ত্রীর কাছে সহবাসের ইচ্ছা প্রকাশ করে। স্ত্রীর সে-রাতে অনিচ্ছা থাকায় সুলতানের মাথার দিব্বি দিয়ে তাকে নিরস্ত থাকতে বলে। কিন্তু উদ্দীপিত আমীর সে-কথা কানে তুললো না। পরের দিনই সুলতান তাকে তলব করলেন ও সেজন্য কৈফিয়ৎ চাইলেন। এই ঘটনাটিই শেষ পর্যন্ত সে-আমীরের সর্বনাশের কারণ হলো।

মন্বন্তরের সময়ে সুলতান শহরের বাইরে কুয়া খোঁড়ার ও ওই জলের সাহায্যে চাষবাসের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেন। এজন্য লোকদের বীজ ও প্রয়োজনীয় টাকা দেবার ব্যবস্থাও করলেন। এভাবে চাষবাস করিয়ে তিনি শস্যের সরকারী মজুদ ভাণ্ডার অক্ষুণ্ণ রাখতে চেয়েছিলেন। তার পরিকল্পনার কথা কানে যেতে আইনবেত্তা আফীফ-উদ-দীন মন্তব্য ক'রে বসলেন যে এ ধরনের চাষ ব্যবস্থা ক'রে কোন সুরাহা-ই হবে না। এ কথা সুলতানের কানে পৌঁছতে দেরি হলো না। তিনি তাকে আটক করলেন। বললেন—সরকারের কাজে আপনি নাক গলাতে আসেন কেন? যাই হোক, অল্প কিছুদিন পরে তাকে খালাস ক'রে দেয়া হলো। ছাড়া পেয়ে যখন তিনি ঘরে ফিরছেন পথে অন্য দুই আইনবেত্তার সঙ্গে দেখা। তারা তাকে দেখে বললেন—আপনি যে ছাড়া পেয়েছেন এ জন্য আল্লাকে ধন্যবাদ। তিনি জবাব দিলেন—'স্বেচ্ছাচারীর হাত থেকে আমাদের রক্ষা করছেন বলে আল্লাকে ধন্যবাদ।' এর পর তারা যে যার পথে গেলেন। তারা বাড়ি পৌঁছবার আগেই এ খবর সম্রাটের কানে গেল। তিনি তিনজনকেই ধরে এনে কোতল করলেন।

সুলতানের বিরুদ্ধে সব থেকে বড়ো অভিযোগ হলো: তিনি জোর ক'রে দিল্লীর সব অধিবাসীদের নির্বাসিত করেন। দিল্লীর কতক অধিবাসী নানারকম গালাগালি ও কুৎসা ভরা চিঠি লিখে রাতের বেলায় পর্যৎ মহাকক্ষে ফেলে আসত। আঠা দিয়ে আঁটা এই সব চিঠির ওপর লেখা থাকতো 'সুলতানের মাথার দিব্যি সে ছাড়া আর কেউ এ চিঠি খুলতে পারবে না'। তিনি এসব চিঠি পড়ে ক্ষেপে গিয়ে দিল্লীর সব অধিবাসীদের তাড়িয়ে দেবেন ঠিক করলেন। তাই, প্রত্যেকের জমিজমা বাড়িঘর কিনে নিয়ে তিনি সবাইকে তার দাম চুকিয়ে দিলেন। তারপর হুকুম জারী করলেন দিল্লী ছেড়ে সবাইকে দৌলতাবাদ চলে যেতে। তারা যেতে অস্বীকার করলো। তখন তিনি ঘোষক দিয়ে শহরময় ঘোষণা ক'রে দিলেন যে তিনদিন পর কেউ আর দিল্লী শহরে থাকতে পারবে না। বাধ্য হয়ে সব লোক যে যার মতো অন্য জায়গায় চলে গেল। কিছু লোক বাড়ির মধ্যে আত্মগোপন ক'রে রইলো। সুলতান প্রত্যেকটি বাড়ি তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে দেখার হুকুম দিলেন। দাসেরা সেই মতো খুঁজে পেতে শেষ অবধি দু'জন লোককে ধরে আনল। একজন পঙ্গু, অন্যজন অন্ধ। সুলতান পঙ্গু লোকটিকে পাথর ছোঁড়া কামান দিয়ে শূন্যে ছুঁড়ে দেবার নির্দেশ

দিলেন। আর অন্ধ লোকটিকে বলা হলো দড়ি বেঁধে টেনে টেনে দৌলতাবাদ নিয়ে যেতে। তাই করা হলো। ওই ভাবে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাবার ফলে অন্ধ লোকটি পথেই শেষ হয়ে গেল, শুধু তার একখানি ঠ্যাং শেষমেশ দৌলতাবাদ পৌঁছল।

এরপর তিনি অন্য সব শহরের লোকদের দিল্লীতে এসে বসবাসের আহ্বান জানালেন। ফলে অন্যান্য প্রদেশের অনেকগুলি শহর জনশূন্য হয়ে গেল। অথচ দিল্লীতেও আগের মতো জন বসতি গড়ে উঠলো না। আমরা যখন প্রথম এখানে আসি তখন এ কারণে দিল্লী প্রায় খাঁ খাঁ করছে।

শেখ শিহাব-উদ-দীন ছিলেন শেখ উল-জামের ছেলে। তাদের আদি নিবাস খুরাসান; খুরাসানের জাম শহরটির নাম তার ঠাকুরদার নামে রাখা হয়েছে। শিহাব-উদ-দীন একজন বিশিষ্ট সাধু পুরুষ ছিলেন। যেমন ধর্মপ্রাণ তেমনি কর্মদক্ষ। লাগোয়া ১৫ দিন উপোষ ক'রে থাকতেন। সুলতান কুতব-উদ-দীন ও তুঘলক দুজনেই তাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন। প্রায়ই তারা তার সঙ্গে দেখা ক'রে আশীর্বাদ চাইতেন. মুহম্মদ মসনদে বসে তাকে সরকারী কাজে নিয়োগ করতে চাইলেন। আদি মুসলিম শাসকেরা আল্লার কৃপা ও সুখ-শান্তি লাভের জন্য শিক্ষিত ও সাধুসন্তদের সরকারী কাজে নিয়োগ করতেন। মুহম্মদও সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আইনবেত্তা, সুফী সাধুসন্তদের সরকারী কাজে লাগাতে চাইতেন। শেখ শিহাব-উদ-দীন চাকরী নিতে রাজী হলেন না। একদিন খোলা দরবারে সুলতান এ নিয়ে তার সঙ্গে আলোচনা করলেন। কিন্তু শিহাব-উদ-দীন সমানে অমত জানিয়ে চললেন। সুলতান আর রাগ সামলাতে পারলেন না। ক্ষেপে গিয়ে বিশিষ্ট আইনবেত্তা শেখ জিয়া-উদ-দীনকে আদেশ দিয়ে বললেন শিহাব-উদ-দীনের দাড়ি উপড়ে ফেলতে। তিনি সে-কাজ করতে রাজী হলেন না। তখন দু'জনেরই দাড়ি উপড়ে ফেলার হুকুম হলো ও তা কাজে পরিণত করা হলো। এরপর শিহাব-উদ-দীনকে নির্বাসিত করা হলো দৌলতাবাদে। তিনি সাত বছর সেখানে কাটালেন। এরপর সুলতান তাকে দিল্লী ফিরিয়ে আনলেন, সম্মান দেখালেন ও 'দীওয়ান-উল-মুস্তখরজ'-এর প্রধান ক'রে দিলেন। এ দপ্তরটির কাজ হলো রাজস্ব-কর্মচারীদের কাছ থেকে বকেয়া আদায় করা। এ জন্য তাদের ওপর নানারকম ভাবে নির্যাতন চালান হতো, এমন কি পায়ের তালুতে লোহার

দিক দিয়ে পর্যন্ত পেটানো হতো। যাই হোক, এরপর থেকে শিহাব-উদ-দীনকে সুলতান আরো বেশি মান মর্যাদা, সম্মান দেখাতে আরম্ভ করলেন। এমনকি আমীরদেরও তার প্রতি সব থেকে বেশি মর্যাদা দেখাতে ও তার উপদেশ নিতে বললেন। ক্রমে, রাজ দরবারে তার চেয়ে সম্মানীয় ব্যক্তি আর কেউ রইলো না।

এই সময়ে সুলতান গঙ্গার কূলে 'স্বর্গদ্বার' নাম দিয়ে একটি প্রাসাদ বানালেন নিজের বসবাসের জন্য। অন্যান্য লোকদেরও সেখানে ঘরবাড়ি বানাবার জন্য বললেন। শেখ শিহাব-উদ-দীন রাজধানীতে থাকার অনুমতি চাইলেন। সুলতান সে আবেদন মঞ্জুর করলেন। দিল্লী থেকে ছয় মাইল দূরে এ-জন্য তাকে কিছু অনাবাদী জমি দিলেন। শিহাব-উদ-দীন সেখানে মাটির নিচে একটি বিরাট গুহাকক্ষ বানিয়ে তার ভেতর থাকার ঘর, গোলা ঘর, রান্নাঘর ও স্নানাগার প্রভৃতি গড়লেন। যমুনা থেকে খাল কেটে জল এনে জমিতে চাষআবাদ শুরু করলেন। এর ফলে বিরাট ধন-সম্পদ উপার্জন করলেন তিনি। কেননা, এই বছরগুলিতেই সেখানে খরা ও দুর্ভিক্ষ চলছিল। তিনি সেখানে আড়াই বছর থাকেন। সুলতান এ সময়ে দিল্লীতে ছিলেন না। শিহাব-উদ-দীনের বান্দারা সারাদিন কাজকর্ম ক'রে রাতে গুহার মধ্যে এসে নিরাপদ আশ্রয় নিত। কেননা, কাফের লুঠতরাজকারীরা প্রায়ই সেখানে হানা দিত। কাছের এক দুরারোহ পর্বত ছিল তাদের আস্তানা।

সুলতান রাজধানী ফিরে এলে শিহাব-উদ-দীন তার সঙ্গে দেখা করলেন। সুলতানও তাকে যথারীতি সম্মান দেখালেন। দেখা ক'রে তিনি আবার তার গুহা-বাড়িতে ফিরে এলেন। দিন কয়েক বাদে সুলতান তাকে ডেকে পাঠালেন। কিন্তু এবার সে তার সঙ্গে দেখা করতে অস্বীকার ক'রে বসলো। সুলতান নন্দারবরের মুখলিস-উল-মুল্ককে তার কাছে পাঠালেন। তিনি তখন প্রধান মালিকদের মধ্যে একজন। তিনি শিহাব-উদ-দীনকে নানাভাবে বোঝালেন, এমন কি সুলতানের কোপে পড়ার ভয়ও দেখালেন। কিন্তু শিহাব-উদ-দীন বলে বসলেন—'আমি কোন স্বৈরাচারীর অধীনে কাজ করব না'।

সুলতান এ কথা শুনে তাকে ধরে নিয়ে আসার আদেশ দিলেন। আনা হলে তাকে প্রশ্ন করলেন—'আপনি আমাকে স্বৈরাচারী বলেছেন?' হ্যাঁ,

জবাব দিলেন তিনি। তারপর একে একে তার স্বৈরাচারীতার দৃষ্টান্ত দিতে থাকলেন। এই দৃষ্টান্তগুলির একটি হলো অধিবাসীদের নির্বাসিত ক'রে দিল্লীকে মৃত নগরীতে পরিণত করা। সুলতান তার অভিযোগ শুনে নিজের তরবারী সদর-ই-জহানের হাতে তুলে দিয়ে বললেন—আপনি এখুনি এখানে প্রমাণ করুন যে আমি একজন স্বৈরাচারী ও এই তলোয়ার দিয়ে আমার মাথা কেটে ফেলুন। শিহাব-উদ-দীন জবাব দিলেন—যে লোক-ই আপনার বিপক্ষে সাক্ষী দেবে তাকেই তো প্রাণ খোয়াতে হবে। আপনি আপনার অন্তরের অন্তরতম অনুভূতি থেকে ভাল ক'রেই জানেন যে আপনি একজন স্বেচ্ছাচারী। সুলতানের আদেশে এরপর চারিটি শিকল দিয়ে তাকে বেঁধে রাখা হলো। তিনি ওই অবস্থায় ১৫ দিন নির্জলা উপবাস ক'রে থাকলেন। এসময়ে প্রতিদিন তাকে সভাকক্ষে নিয়ে যাওয়া হতো। আইনবেত্তা ও সুফীরা প্রতিদিন সেখানে তাকে অভিযোগ প্রত্যাহার ক'রে নেবার উপদেশ দিতেন। তিনি কিছুতেই রাজী হলেন না। বললেন—'আমি শহীদ হতে চাই। পৃথিবীতে আমার জন্য আল্লার দেয়া খাদ্যের মেয়াদ ফুরিয়ে গেছে।' চৌদ্দ দিনের দিন সুলতান তাকে মুখলিস-উল-মুল্কের হাতে খাবার পাঠালেন। তিনি খেলেন না। সুলতান ক্ষেপে গিয়ে তাকে দেড় তোলা মানুষের মল জোর ক'রে খাইয়ে দেবার আদেশ দিলেন। একদল হিন্দুর ওপর এ কাজের ভার চাপান হলো। তারা তাই করলো। পরদিন তাকে কাজী সদর-ই-জহানের বাড়ি পাঠান হলো। সবাই মিলে সেখানে তাকে বোঝালেন। কারো কথা তিনি কানে তুললেন না। শেষমেশ তাকে কোতল করা হলো।

সুলতান তুঘলকের এক ভাগনে ছিল। নাম বাহা-উদ-দীন গুস্তাব। তিনি তাকে একটি প্রদেশের শাসনকর্তা ক'রে দেন। তুঘলক মারা গেলে বাহা-উদ-দীন সুলতান মুহম্মদের আনুগত্য স্বীকার ক'রে নিতে রাজী হলো না। মুহম্মদ তখন তার বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠালেন। বাহা-উদ-দীন বেশ সাহসী ও বীর ছিলেন। অতএব, ঘোর যুদ্ধ হলো। শেষ পর্যন্ত এঁটে উঠতে না পেরে তিনি পালিয়ে গিয়ে কম্পিলার হিন্দু রাজার কাছে আশ্রয় নিলেন। কম্পিলা রাজ্যটি দুরারোহ পর্বতমালার মাঝে। এর রাজা তখন বড়ো বড়ো হিন্দু রাজাদের একজন। বাহা-উদ-দীনকে তিনি আশ্রয় দিতে সুলতানের সৈন্যরা তার রাজ্য অবরোধ করলো। তিনি তার সমস্ত শক্তি দিয়ে, সব সম্পদ ব্যয়

ক'রে, প্রতিরোধ ক'রে চললেন। কিন্তু শেষরক্ষার আশা নেই দেখে তিনি বাহা-উদ-দীনকে অপর এক হিন্দু রাজার নাম ক'রে (তৃতীয় বল্লাল) তার কাছে চলে যেতে বললেন।

এরপর রাজার নির্দেশে আগুন জ্বালান হলো। রাজার স্ত্রীরা ও কন্যারা একে একে সে আগুনে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ বিসর্জন দিল। মন্ত্রী, আমাত্য ও অনেক সাধারণ নাগরিকের স্ত্রী, মেয়েরাও তাদের অনুসরণ করলো। এরপর রাজা মরণ প্রতিজ্ঞা নিয়ে যুদ্ধে এলেন। অনেক নাগরিক ও অনুচরও তার সঙ্গী হলেন। আপ্রাণ যুদ্ধ ক'রে সকলে মৃত্যুবরণ করলেন। সুলতান-সৈন্যরা রাজ্য দখল ক'রে নিল। রাজার এগারো জন ছেলেকে বন্দী ক'রে সুলতানের কাছে আনা হলো। তারা সকলেই মুসলমান হলেন। তাদের ভালো বংশধারা ও পিতার মহৎ গুণের কথা স্মরণ ক'রে সুলতান সবাইকে সম্মান দেখালেন, আমীর ক'রে দিলেন। আমি এদের তিন ভাইকে দরবারে দেখেছি। একজনের সঙ্গে আমার বিশেষ বন্ধুত্বও হয়েছিল।

বাহা-উদ-দীন যে হিন্দু রাজার কাছে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন এবার সে রাজার রাজধানী (দ্বার সমুদ্র) অবরোধ করা হলো। তা দেখে রাজা বললেন—কম্পিলার অধিপতি যা করেছেন আমার পক্ষে তা করা সম্ভব নয়। বাহা-উদ-দীনকে তিনি সুলতান সৈন্যের হাতে তুলে দিলেন। শিকল দিয়ে বেঁধে তাকে সুলতানের কাছে আনা হলো। তিনি তাকে মেয়েমহলে আত্মীয় কুটুমদের কাছে পাঠালেন। তাকে তারা গালাগালি করলো, গালে থাপ্পড় কষাল। সুলতানের নির্দেশে এরপর জীবন্ত অবস্থায় তার গা থেকে চামড়া ছাড়িয়ে নেয়া হলো। তার মাংস দিয়ে বিরিয়ানী রান্না ক'রে তা পাঠিয়ে দেয়া হলো তার স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েদের কাছে। বাকিটা একটি পাত্রে ক'রে খেতে দেয়া হলো এক হস্তিনীকে। কিন্তু সে খেল না।

এরপর বাহা-উদ-দীন ও বাহাদুর ভূর-এর গায়ের চামড়ায় খড় ভর্তি ক'রে —সেই মূর্তি প্রদেশে প্রদেশে ঘোরানো হতে থাকল। সিন্ধুর শাসনকর্তা কিজলু খানের কাছেও একসময়ে তা পৌঁছল। দিল্লীর মসনদ দখলের জন্য তিনি তুঘলককে সাহায্য করেছিলেন। সুলতান মুহম্মদও তাকে খুব শ্রদ্ধা ও সম্মান করতেন। চাচা বলে ডাকতেন। তিনি দিল্লী এলে এগিয়ে গিয়ে তাকে সম্বর্ধনা জানাতেন। চামড়ার মূর্তি দুটি কিজলু খানের কাছে পৌঁছতে তিনি সে দুটিকে কবর দেবার নির্দেশ দিলেন।

খবর পেয়ে সুলতান কিজলু খানের প্রতি বিরূপ হয়ে তাকে ডেকে পাঠালেন। সুলতানের কোপে পড়েছেন বুঝতে পেরে তিনি গেলেন না, করলেন বিদ্রোহ ঘোষণা। সুলতান নিজে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলেন। বাধলো ঘোর লড়াই। সুলতানের যুদ্ধ কৌশলে কিজলু খান পরাস্ত ও নিহত হলেন। মুলতানে প্রবেশ ক'রে সুলতান সেখানকার কাজী করিম-উদ-দীনের শরীর থেকেও জীবন্ত অবস্থায় চামড়া ছাড়িয়ে নিলেন।

এরপর সুলতান তার উজীর খাজা-জহানকে সৈন্য নিয়ে কমালপুর যাবার নির্দেশ দিলেন। এটি সমুদ্র তীরে গড়ে ওঠা একটি বড়ো শহর। এর অধিবাসীরাও বিদ্রোহ করলো। খাজা-জহান শহর মধ্যে প্রবেশ করলেন। সেখানকার কাজী ও খতীবকে ধরে এনে জীবন্ত গায়ের চামড়া ছাড়িয়ে নেয়া হলো।

এভাবেই সিন্ধুর বিদ্রোহ দমন করলেন সুলতান।

কুরাজিল এক বিরাট পর্বতমালা। এটি লম্বায় এত বড়ো যে একে পার হতে তিনমাস সময় লাগে। দিল্লী থেকে এটি দশ দিনের পথ দূরে। এ অঞ্চলের রাজা সব থেকে শক্তিশালী হিন্দু রাজাদের একজন। সুলতান প্রধান দবাদার মালিক হুবিয়াকে তার বিরুদ্ধে অভিযানে পাঠালেন। সঙ্গে গেল এক লক্ষ অশ্বারোহী ও বিরাট পদাতিক বাহিনী।

মালিক হুবিয়া পাহাড়ের কোলে গ'ড়ে ওঠা জিদ্দা শহর ও তার অধীন অঞ্চল দখল ক'রে নিলেন। অগুণতি লোক বন্দী হলো। পুরো দেশটিকে ধ্বংস ক'রে আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করা হলো। কাফেররা রাজ্য, বিষয়-আশয়, ধন-সম্পদ ফেলে পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নিল। সে পাহাড়ে যাবার একটি-ই মাত্র পথ। পথের নিচে গভীর উপত্যকা। সে পথ এতো সরু যে পাশাপাশি একজনের বেশি অশ্বারোহীর যাবার উপায় নেই। সম্রাটের সেনাবাহিনী এ পথ দিয়ে পাহাড়ে উঠে ওয়ারঙ্গল শহর দখল করল, সেখানে যা কিছু ছিল সব বাজেয়াপ্ত ক'রে নিল। সম্রাটের কাছে পাঠান হলো এ বিজয়-সংবাদ। তিনি সেখানকার জন্য একজন কাজী ও একজন খতীবকে পাঠালেন। এদিকে বর্ষা দেখা দিতে সেনাদলের মধ্যে রোগ ছড়িয়ে পড়লো। তারা হয়ে যেতে থাকল দুর্বল। মারা পড়তে সুরু করলো ঘোড়াগুলোও। আমীররা বেগতিক দেখে পাহাড় থেকে নিচে নেমে আগের জায়গায় ফিরে আসার জন্য সাম্রাটের কাছে অনুমতি চেয়ে পাঠালেন। সম্রাট মত দিলেন।

মালিক নুবিয়া সেইমতো সমস্ত ধনরত্ন, ধাতু সম্পদ ভাগ ভাগ ক'রে সৈন্যদের কাছে দিয়ে পাহাড় থেকে নিচে নামার তোড়জোড় করলেন। কাফেররা আগে থাকতে সে খবর পেয়ে গিরিপথ ঘিরে ফেলল। গাছ কেটে তার বড়ো বড়ো খণ্ড পাহাড়ের ওপর থেকে সুলতান-সৈন্যদের ওপর অবিরাম বর্ষণ ক'রে চললো। ফলে অধিকাংশ সৈন্যই পড়লো মারা। বন্দী হলো বাকি সবাই। কাফের সেনারা সব ধনসম্পদ, ঘোড়া, অস্ত্রশস্ত্র দখল ক'রে নিল। পুরো সৈন্য-বাহিনীর মধ্যে তিনজন মাত্র উচ্চপদস্থ কর্মচারী পালাতে পারলেন। মালিক নুবিয়া, মালিক দৌলত শাহ ও আর একজন যার নাম এখন ভুলে গেছি।

এই বিরাট পরাজয়ে সম্রাটের সৈন্যবাহিনীর মনোবল একেবারে ভেঙে পড়লো। সুলতান শেষে পর্বতবাসীদের সঙ্গে সন্ধি করলেন। ঠিক হলো তারা সম্রাটকে নির্দিষ্ট পরিমাণ কর দেবে। কেননা, তাদের বিষয় সম্পত্তি, জমিজমা সবই পর্বতের নিচে আর সম্রাটের অনুমতি ছাড়া সেখানে যাওয়া সম্ভব নয়।

সুলতান যেবার বিদ্রোহ দমনের জন্য মবর যাত্রা করেন ওই সময়ে তার অনুপস্থিতিতে মন্বন্তর দেখা দেয়। এই মন্বন্তর এত উগ্র হয়ে ওঠে যে এক মণ (১৪ সের) গমের দাম ৬০ দিরহাম পর্যন্ত চড়ে যায়। কিছু দিন পরে দর দাম আরো আগুন হলো। পরিস্থিতি বেশ ঘোরালো হয়ে উঠলো। মনে আছে, একদিন আমি উজীরের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি, পথে দেখি তিন জন স্ত্রীলোক কয়েক মাস আগে মারা যাওয়া একটি ঘোড়ার চামড়া কুচি কুচি ক'রে কেটে তাই খাচ্ছে। তখন চামড়া পর্যন্ত রান্না ক'রে বাজারে বেচা হতো। ষাঁড় কাটা হলে লোকে তার রক্ত পর্যন্ত খেত। খুরাসানের কতক ছাত্র আমায় জানায় যে তারা হানসী ও সরস্বতীর মাঝে অকরোহ শহরে (হিসার থেকে ১৩ মাইল দূরে; বর্তমানে একটি গ্রাম) গিয়ে দেখে সেটির পুরো নির্জন, পরিত্যক্ত অবস্থা। তারা একটি ফাঁকা বাড়িতে ঢুকে রাত কাটায়। ওই সময়ে সেই বাড়ির একটি ঘরে তারা একজন লোককে দেখতে পায়। লোকটি আগুন জ্বালিয়ে তাতে মানুষের ঠ্যাং পুড়িয়ে খাচ্ছিল।

যখন দুর্ভিক্ষ অসহ্য হয়ে উঠলো, সুলতান দিল্লীর সব লোককে ছ'মাস খাদ্য দেবার নির্দেশ দিলেন। কাজী, আমীর ও করণিকেরা রাস্তায় ও দোকানে অধিবাসীদের তালিকা তৈরী করলেন। দৈনিক ১২ ছটাক হিসাবে প্রত্যেককে ছ' মাসের খাবার দেয়া হলো। সুলতান কুতব-উদ-দীনের সমাধি সৌধে আমি রান্না করিয়ে খাবার খাওয়াতাম। লোকেরা এতে অনেক উপকৃত হয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

নিজের কথায় ফিরে যাই এবার। যখন দিল্লী আসি, আগেই জানিয়েছি, স্থলতান মুহম্মদ শাহ সেখানে ছিলেন না। আমরা সদলবলে তাঁর প্রাসাদ দেখতে গেলাম। একে একে তিনটি ফটক পার হবার পর প্রধান নকীব সবাইকে একটি বিরাট মহাকক্ষ মধ্যে নিয়ে এলেন। উজীর আমাদের জন্য সেখানে অপেক্ষা করছিলেন। তাঁর সঙ্গে আলাপ পরিচয় হলো। তিনি আমাদের নিয়ে গেলেন 'হাজার উস্তান'-এ। স্থলতান এখানেই আম-দরবার বসান। উজীর স্থলতানের সিংহাসনকে মাটি পর্যন্ত মাথা হুইয়ে অভিবাদন জানালেন। তাঁর দেখাদেখি আমরাও হাঁটু পর্যন্ত মাথা ঝুঁকিয়ে আঙুল দিয়ে তল ছুঁয়ে কুর্নিশ করলাম। ঘোষকেরা তারস্বরে 'বিসমিল্লা' ধ্বনি তুলল।

স্থলতানের মা মখদুম-ই-জহান বেজায় ধর্মপ্রাণা মহিলা। প্রচুর দান-ধ্যান করেন, অনেক পুণ্যশালা বানিয়েছেন। সে-সব পুণ্যশালায় পর্যটক ও ফকীরদের বিনা খরচে খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। তিনি চোখে দেখেন না। ছেলে যেদিন স্থলতান হলো, সেই উৎসবের দিনে সবাই তাঁকে সম্মান জানাতে এলেন। রত্ন বসিয়ে কারুকাজ করা একটি সোনার আসনে তিনি বসা। এমন সময় হঠাৎ গেল তাঁর দৃষ্টিশক্তি নিভে। হাজার চিকিৎসা করিয়েও তা আর ফেরানো গেল না। ছেলে মুহম্মদ মাকে অপার ভক্তি করেন। মা ও ছেলে মিলে একবার বাইরে বেড়াতে যান। ফেরার বেলা ছেলে মুহম্মদ খানিক আগে ফিরলেন। তারপর সসম্মানে মাকে অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে আসার জন্য এগিয়ে গেলেন। মা দোলায় ক'রে আসছিলেন। সব লোকের সামনে মুহম্মদ মায়ের পায়ে মাথা লুটিয়ে চুমু খেলেন তাঁর পায়ের পাতায়।

আমরা এরপর মায়ের প্রাসাদে এলাম। মাকে আমাদের উপহার পাঠালাম। মায়ের তরফ থেকে আমাদের জোর আদর অভ্যর্থনা জানানো হলো, খুব খাওয়ালেন, উপহার দিলেন। সেখান থেকে আমরা দিল্লীর পালম ফটকের কাছে একটি বাড়িতে এলাম। এখানেই আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ফিরে দেখি, আমাকে যে বাড়িটি দেয়া হয়েছে সেখানে বিছানাপত্তর, গালিচা, মাদুর, বাসন-কোসন ও চারপাই ইত্যাদি যা কিছু দরকার হতে পারে

সবই যুগিয়ে দেয়া হয়েছে। ভারতীয়দের এই চারপাই খুবই হাল্কা, যে কোন লোক আনয়াসে বয়ে নিয়ে যেতে পারে। বাইরে বেড়াতে যাবার বেলা প্রত্যেকে নিজ নিজ চারপাই সঙ্গে নিয়ে যান। তার বান্দা সেটি মাথায় ক'রে বয়ে নিয়ে চলে। এই চারপাইতে চারটি পায়ার ওপরে চারখানি সরু কাঠ লাগানো থাকে, মাঝের ফাঁকা জায়গায় রেশম বা স্থতীর ফিতে দিয়ে জালি বোনা। এজন্য শোবার সময় এর ওপরে আর মোলায়েম কিছু বিছানোর দরকার হয় না, এই জালিটিই যথেষ্ট মোলায়েম ও আরামের।

চারপাইয়ের সঙ্গে দু'খানা চাদর, দু'টি বালিশ, একখানা লেপ দেয়া হয়েছে। সবগুলিই রেশমে তৈরী। ভারতে লেপ ও তোষকের ওপর সাদা কাপড়ের ওয়াড় দেয়ার নিয়ম। যখন ওয়াড় ময়লা হয়ে যায় তাকে কেচে পরিষ্কার ক'রে নেয়। ফলে, ভেতরের মূল জিনিষটি ময়লা হবার স্থযোগ পায় না।

পরের দিন আমরা প্রাসাদে গিয়ে উজীরের সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি আমায় দু'টি থলি দিলেন। প্রত্যেকটিতে এক হাজার ক'রে রূপোর দীনার। বললেন: এ আপনার মাথা ধোয়ার খরচা। এছাড়া মিহি ছাগলের লোমে তৈরী একটি পোষাকও দিলেন। আমার সঙ্গীদের, চাকর ও বান্দাদের কৌলীন্য অনুসারে চার দলে ভাগ করা হলো। চার দলের প্রত্যেককে যথাক্রমে ২০০, ১৫০, ১০০ ও ৬৫ দীনার ক'রে দিল। তারা চল্লিশ জন মতো ছিল। সবাই মিলে চার হাজারের ওপর পেল। এরপর স্থলতানের তরফ থেকে অতিথিদের আহার্য বা সিধের ব্যবস্থা করা হলো। ভারতীয় রটলের এক হাজার রটল ময়দা, এক হাজার রটল মাংস, বেশ কয়েক রটল চিনি, ঘি, মধু, স্থপারী ও এক হাজার পান। ভারতীয় রটল মরোক্কোর ২০ ও মিশরের ২৫ রটলের সমান।

দিল্লী আসার দেড় মাস বাদে আমার মেয়েটি মারা গেল। তার বয়স তখনো বছর পোরেনি। খবর পেয়ে উজীর আদেশ দিলেন: পালম ফটকের কাছে শেখ ইব্রাহীম কুনভীর সমাধিসৌধের ধারে তিনি যে পুণ্যশালাটি করেছেন তার মধ্যে যেন তাকে কবর দেয়া হয়। তাই করা হলো।

এদিকে স্থলতান আমাকে বছরে পাঁচ হাজার টাকা আয়ের গ্রাম দেয়ার জন্য বরাত দিলেন। সেই মতো আড়াইখানা গ্রাম পেয়ে গেলাম। বদলী ও বসাহি গ্রাম আর বলর গ্রামের আধখানা। গ্রামগুলি দিল্লী থেকে ষোল

ক্রোশ দূরে, হিন্দপত সদীতে। এক একটি 'সদী' একশত গ্রাম নিয়ে গড়া। প্রত্যেকটি শহরের অধীনে থাকা অঞ্চলকে কয়েকটি সদীতে ভাগ করা হয়। এক একটি সদী এক একজন চৌধুরীর অধীন। চৌধুরী সাধারণতঃ স্থানীয় কাফেরদের প্রধান। একজন মুতাশরীফের ওপর কর আদায়ের ভার দেয়া হয়।

এ সময়ে দিল্লীতে কতক কাফের মেয়ে-বন্দী আনা হলো। উজীর দশটি মেয়েকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। যে লোকটি নিয়ে এল তাকে একটি মেয়ে দিয়ে দিলুম। সে কিন্তু এতে খুশী হলো না। আমার সঙ্গীরা যুবতী দেখে তিনজনকে বেছে নিল। বাকীদের কী হলো জানিনা।

ভারতে মেয়ে বন্দীরা খুব শস্তা। কেন না, তারা নোংরা, শহরের চাল চলন কিছু জানে না। এমন কি যারা লেখাপড়া জানে তাদেরও শস্তা দামে পাওয়া যায়। এ জন্য কেউ মেয়ে বন্দী কিনতে গরজ দেখায় না।

কাফেররা একটানা এক একটি অঞ্চল জুড়ে বাস করে। এগুলি মুসলমান অঞ্চলের লাগোয়া। মুসলমানেরাই তাদের ওপর আধিপত্য করে। কতক কাফের আবার পাহাড়-পর্বতের অসমতল অঞ্চলে ও বাঁশবনগুলিতে জোট বেঁধে সুরক্ষিত ভাবে থাকে।

এখানকার বাঁশগুলি ফাঁপা নয়, লম্বায়ও অনেক বড়ো। মজবুতও বেশ। গাঁটগুলি এমন শক্ত যে আগুনেও কিছু করতে পারে না। কাফেররা এই সব বাঁশ-বনের মাঝে বাস করে। এই বন তাদের দুর্গ-প্রাকারের কাজ করে। বনের মাঝেই তাদের গরু-বাছুর, ফসল। জলের ব্যবস্থাও আছে। বৃষ্টির জলকে সেখানে ধরে রাখে। এই কারণে শক্তিশালী সৈন্যদল ছাড়া তাদের বশে আনা দুষ্কর। এইসব সেনারা বনে ঢুকে একটি বিশেষভাবে তৈরী হাতিয়ার দিয়ে বাঁশঝাড় কেটে ফেলে।

৮ই জুন ১৩৩৪ সুলতান তালপত (তালবত)-এ থাকা প্রাসাদে এসে পৌঁছলেন। এটি রাজধানী থেকে সাত মাইল দূরে। উজীর আমাদের সুলতানের সঙ্গে দেখা করার নির্দেশ দিলেন। আমরা সুলতানের জন্য ঘোড়া, উট, খুরাসানী ফল-ফলাদি, মিশরীয় তলোয়ার, তুর্কীস্তান থেকে আনা দাস ও ভেড়া উপহার নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। নবাগতদের মর্যাদা অনুসারে পর পর তাঁর কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। প্রত্যেককে তিনি সোনার

কাজ করা সূতীর পোষাক সম্মানী দিলেন। আমার পালা এলে আমিও দেখা করতে গেলাম। একখানি কুরসীতে তিনি বসে আছেন। আমি প্রথমে তাকে একজন সভাসদ বলে ভেবেছিলাম। পরে প্রধান সভাসদ (মালিক-উন-নুদমা) তাকে কুর্নিশ করছেন দেখে আমিও কুর্নিশ করলাম। এরপর সুলতানের ঘরোয়া কর্মচারীদের প্রধান, সুলতান মুহম্মদের খুড়তুতো ভাই ফিরোজ, এগিয়ে এসে আমায় স্বাগত জানালেন। আমি আবার কুর্নিশ করলাম। মালিক-উন-নুদমা ঘোষণা করলেন 'বিসমিল্ল', মৌলানা বদরুদ্দীন'। তারা আমায় বদরুদ্দীন নামে ডাকতেন। সব শিক্ষিত লোককেই তারা মৌলানা বলতেন। সুলতান আমার হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে স্বাগত জানালেন। তারপর আমার হাত দুটি তার দু'হাতের মধ্যে ধরে রেখে খুব অমায়িকভাবে কথা বলতে থাকলেন। তিনি আমায় পার্শীতে বললেন: 'আপনার ওপর আসমান থেকে আশীর্বাদ ঝরে পড়ুক। আপনি যে এসেছেন এ আমার পরম সৌভাগ্য। নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি আপনার জন্য যা পারি করব। আপনাকে আমি এমন সব চমৎকার জিনিষ দেব যে আপনার দেশের লোকজনের মধ্যে তার খবর ছড়িয়ে পড়বে। তারা (সেসব দেখতে) আপনার কাছে ছুটে আসবে।' তারপর তিনি আমার দেশ কোথায় জানতে চাইলেন। 'পশ্চিমের দেশ' আমি উত্তর দিলাম। 'আবদুল মুমিনের দেশ?' প্রশ্ন করলেন তিনি। বললাম: 'হ্যাঁ'। তিনি যখনই আমায় কোন ভালো কথা বলছেন, আমি তার হাতে চুমু খেতে থাকলাম। এভাবে সাতবার চুমু খেলাম আমি। এরপর তিনি আমায় সম্মানী পোষাক দিলেন। তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাইরে এলাম।

দর্শনপ্রার্থীরা এরপর এক ঠাঁই হলেন। খাবার কার্পেট বিছিয়ে সবাইকে খানাপিনা করানো হলো।

পরের দিন ভোরে আমাদের সবাইকে একটি ক'রে সুসজ্জিত ঘোড়া দেয়া হলো। সুলতান রাজধানী ফিরে চললেন। আমরাও তার আগে আগে সদর-ই-জহানের সঙ্গে চললাম। সুলতানের আগে আগে হাতীর দল চলেছে। পতাকা ও ষোলটি ছত্র তাদের সঙ্গে। প্রত্যেকটি ওপর দিকে তোলা। তার কতকগুলিতে সোনার কাজ করা, কতকগুলিতে রত্ন বসানো। সুলতানের মাথার ওপরেও একটি ছত্র। সুলতানের ঠিক আগে আগে সোনা ও দামী দামী

রত্ন-খচিত একখানি জিন আবরক বা ঘাসিয়া চলেছে। কতক হাতীর পিঠে বসানো রয়েছে ছোট ছোট রিয়াদ বা পাথর ছোঁড়া যন্ত্র।

সুলতান শহরের কাছাকাছি হতেই পাথর ছোঁড়া যন্ত্রগুলি দিয়ে দিরহম ও দীনার ছোঁড়া শুরু হলো। সুলতানের আগে আগে যারা চলছিল, তারা ও আশে পাশের লোক তা কুড়াতে থাকলো। প্রাসাদে না পৌঁছান অবধি এরকম চললো। হাজার হাজার লোক সুলতানের আগে আগে।

পরের দিনটি শুক্রবার। আমরা সুলতানের প্রাসাদে গেলাম। আমাকে আটজন সঙ্গী নিয়ে ভেতরে যাবার অনুমতি দেয়া হলো। তারপর প্রধান কাজী ও রাজ কর্মচারীরা একে একে বিদেশীদের ডাক দিতে থাকলেন। প্রত্যেককে একটি ক'রে টাকার থলি দেয়া হলো। আমি পেলাম পাঁচ হাজার দীনার। ছেলের ফিরে আসা উপলক্ষে সুলতানের মা এদিন এক লক্ষ দীনার বিলোলেন।

সুলতান আমাদের প্রায়ই ডেকে পাঠাতে থাকলেন তার সঙ্গে খানা-পিনা করার জন্যে। অমায়িকভাবে তিনি আমাদের সাথে কথাবার্তা বলতেন, সুবিধা অসুবিধার খোঁজ খবর নিতেন।

এরপর আমাদের প্রত্যেকের জন্য মাসোহারা ধার্য হলো। আমার জন্য মঞ্জুর হলো বার্ষিক ১২ হাজার দীনার। আগের আড়াইখানা গ্রাম ছাড়া সুলতান আমাকে আরো দু'খানি গ্রাম দিলেন। একটির নাম জউজা, অপরটির নাম মলকপুর (দিল্লীর উত্তর দিকে)।

একদিন খুদাবন্দজাদা ঘিয়াস-উদ-দীন ও মুলতানের শাসনকর্তা কুতব-উল-মুল্ক এলেন। বললেন: 'আপনাদের মধ্যে যার যার উজারত (মন্ত্রীত্ব), কিতাবত (কর্মসচিবগিরি), ইমারত (প্রশাসনিক কাজ), কজা (বিচারকের কাজ), তদরী (অধ্যাপনার কাজ), মসীখাত (পুণ্যশালার প্রশাসন)-এর কাজ করার যোগ্যতা আছে বলুন। খুন্দ-আলম জানিয়েছেন এই সব পদগুলিতে তিনি আপনাদের নিয়োগ করবেন।'

একথা শুনে সকলেই চুপ ক'রে রইল। আসলে সবারই লক্ষ্য ছিল সুলতানের কাছ থেকে টাকা বাগিয়ে যে যার দেশে সরে পড়া। শুধু আমীর বখত বললেন: 'উজারতের কাজ আমার বংশীয় পরম্পরা, কিতাবত অবশ্য আমার নিজ পেশা। এ দুই ছাড়া আর আমার কোন কাজ জানা নেই।'

হিবাতউল্লাও ওই একই কথা বললেন। আমি জানালাম: 'উজারত ও কিতাবত আমার পেশা নয়। কজা বা মসীখাতের কাজই আমার পছন্দ। তাই-ই আমাদের বংশীয় পরম্পরা। আর প্রশাসনের কথা যদি বলেন, তবে মনে করিয়ে দিই, যেদিন থেকে আরবরা তলোয়ার হাতে নিয়েছে সেদিন থেকেই অন্য জাতিরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ শুরু করেছে।'

সুলতান যখন আমার এ কথাগুলি শুনলেন, খুব তারিফ করলেন। দিল্লী শহরের কাজীর পদে নিযুক্ত করলেন আমায়। মাইনে ধার্য হলো বছরে বারো হাজার দীনার। করা হলো সমমূল্যের জায়গীরও মঞ্জুর। বারো হাজার টাকা নগদও দিলেন। আরো বরাদ্দ করা হলো একটি সুসজ্জিত ঘোড়া ও মহরীবী পোষাক, এই পোষাকের সামনে ও পেছনে একটি ক'রে বিজয়তোরণ আঁকা।

কাজীপদ পাবার পর একদিন পর্ষদ-মহাকক্ষে গিয়েছি। একটি গাছতলায় আমি বসে, পাশে পণ্ডিত ধর্ম-প্রবক্তা তিরমিধের নাসির-উদ-দীন। এক ঘরোয়া কর্মচারী আমায় এসে বললেন: 'কিছু নজরানা দিন, তাহলে খুন্দ-আলম আপনাকে যে বারো হাজার দীনার দেবার বরাত দিয়েছেন তার হুকুমনামা এখুনি এনে দেব।' তার কথায় কান দিলাম না। ভাবলাম, বুঝিবা মস্করা করছে। সে কিন্তু আদপেই মস্করা করছিল না। আমার এক বন্ধু তখন বললো: 'আচ্ছা আমিই না হয় কিছু দিচ্ছি তাকে।' এই বলে সে তার হাতে দু'তিন দীনারের মতো গুঁজে দিল। তখন কর্মচারীটি 'খত্ত-ই-খুর্দ' নামে তার নাম লেখা থাকা একটি চিঠা এনে আমার হাতে দিল।

যে এ ধরনের চিঠা এনে দেয় তার নাম তাতে লেখা থাকে। তারপর তিনজন আমীরের সই থাকে। (এক) সুলতানের শিক্ষক খান-ই-আজম কুতলুঘ (কতলু খান), (দুই) খরিতদার বা নথীরক্ষক, (তিন) দবাদার। এরপর তা চলে যায় মন্ত্রীর দপ্তরে। সেখানে কর্ম-সচিব তার একটি নকল রাখেন। তারপরে তা দীওয়ান-উল-ইসরাফ (Dept. of Control) ও দীওয়ান-উল-নজর (Dept. of Inspection)-এ পর পর নথীভুক্ত করা হয়। এ সব চুকে গেলে খাজাঞ্চীকে টাকা দেবার জন্য উজীর 'পরোয়ানা' জারী করেন। সুলতান কোষাগার থেকে যেদিন যত টাকা দেবার আদেশ দেন, তার একটি চিঠা তৈরী ক'রে উজীর তা প্রতিদিন সুলতানের কাছে পেশ করেন। তিনি যদি সঙ্গে সঙ্গে

টাকা দিতে চান, তবে সেই মতো আদেশ দেন। আর যদি পরে দিতে চান, তবে আদেশ দিতে দেরী করেন। কিন্তু যত দেরীতেই হোক না কেন টাকা অবশ্যই দেয়া হবে। যেমন—আমার এই এবারকার বারো হাজার দীনার পেতে ছ'মাস দেরী হয়ে গেল। অবশ্য অন্যান্য আরো নানা টাকার সাথে এটাকা আমি একসঙ্গে পেয়েছিলাম।

ভারতের একটি নিয়ম হলো সুলতান যাকে যা দেবার জন্য মঞ্জুর করেন তা থেকে দশ ভাগ কেটে রাখা। যেমন ধরুন: যাকে একলক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে, তিনি পাবেন নব্বই হাজার; যাকে দশ হাজার টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে, তিনি পাবেন ন'হাজার।

আগেই বলেছি, এখানে আমার আসার খরচ, সুলতানের জন্য উপহার কেনা ও দিল্লীতে থাকার বাড়ির ব্যবস্থা করার জন্য আমাকে ধার করতে হয়েছিল। যে বণিকদের কাছ থেকে ধার করি, তারা দেশে ফিরে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছিল। তাই, দেনা শোধের জন্য তারা এবার চাপ দিতে শুরু ক'রে দিলেন। তখন আমি সুলতানের স্তুতি ক'রে একটি লম্বা কবিতা লিখে, তাকে উপহার দিলাম। তিনি সানন্দে সেটি নিলেন। সকলেই আমার খুব প্রশংসা করলেন। কিছুদিন অপেক্ষা করার পর আমি একটি আবেদন লিখে সুলতানের কাছে পাঠালাম। তিনি উজীরকে আমার দেনা শোধ ক'রে দেবার আদেশ দিলেন। উজীর তা দিতে দেরী ক'রে দিলেন। ইতিমধ্যে তার দৌলতাবাদ যাবার আদেশ হলো। সুলতান গেছেন শিকারে, উজীরও বাইরে, তাই কিছুকাল ধরে আমি কিছুই পেলাম না। পাওনাদারেরা এদিকে চলে যাবার জন্য পুরো তৈরী। আমি তখন তাদের বললাম: 'যখন আমি প্রাসাদে যাবো তখন এদেশের রীতি অনুযায়ী আপনারা আমার কাছে টাকা দাবী করুন।' কারণ, আমি জানতাম, সুলতান যখুনি এ খবর জানতে পারবেন সাথে সাথে তিনি টাকা দিয়ে দেবেন। এ ব্যাপারে তাদের রীতি এ রকম। দেনাদার সুলতানের কোন প্রিয়পাত্র হলে, পাওনাদার দেনাদারের জন্য প্রাসাদের ফটকের কাছে অপেক্ষা করে। দেনাদার প্রাসাদে ঢুকতে গেলেই সে তাকে উদ্দেশ্য ক'রে বলে: 'আমি সুলতানের কাছে ন্যায়বিচার চাইছি, আর তোমাকে সুলতানের মাথার দিব্যি দিচ্ছি, আমার টাকা শোধ না করা পর্যন্ত ভেতরে যেতে পারবে না। যতক্ষণ না টাকা শোধ হয়, বা সেজন্য সময়

মেলে, ততক্ষণ পর্যন্ত দেনাদার সে জায়গা ছেড়ে চলে যেতে পারে না। পরামর্শ মতো পাওনাদাররা তাই করলেন। কর্মচারীরা সুলতানকে তখন খবর দিলেন। বণিকদের কাছে আমার দেনার পরিমাণ জানতে চাইলেন সুলতান। তারা জানালেন: পঞ্চান্ন হাজার দীনার। সুলতান তা শুনে কর্মচারীদের দিয়ে বলে পাঠালেন: 'তোমাদের টাকার জন্য আমি দায়ী রইলাম। যাতে তোমরা ন্যায়বিচার পাও তা আমি দেখব। এর কাছে তোমরা আর সে টাকা দাবী ক'রো না।' এরপর তিনি দু'জন কর্মচারীকে তাদের দলিল পরীক্ষা ক'রে দেখতে বললেন। তারা দলিল ঠিকঠাক আছে দেখে রাজাকে তা জানালেন। সুলতান হেসে বললেন: 'ও একজন কাজী, সুতরাং কোন গলদ রেখে কাজ করেনি।' যাই হোক, খাজাঞ্চীকে তিনি টাকা দেবার হুকুম দিলেন। খাজাঞ্চী ঘুষ দাবী ক'রে বসলেন। তা না পাওয়া পর্যন্ত খত্ত-ই খুর্দ দিতে রাজী হলেন না। আমি তাকে দু'শো টাকা পাঠালাম। তিনি নিলেন না, পাঁচশো দাবী করলেন। আমি দিতে রাজী হলাম না। ঘটনাটি ইমাদ-উদ-দীন সিমনানীর ছেলে আমিদ-উল-মুল্‌ক-এর কানে তুললাম। সে তার বাবাকে জানাল। ফলে উজীরের সাথে খাজাঞ্চীর বিরোধ দেখা দিল। উজীর বিষয়টি সুলতানের কানে তুললেন। এই সুযোগে তার আরো নানা দুষ্কর্মের ফিরিস্তি পেশ করলেন। সুলতান খাজাঞ্চীর ওপর রেগে আগুন। তাকে শহরে অন্তরীণ ক'রে রাখার আদেশ দিয়ে বললেন: 'সে (ইবন বাতুতা) তাকে ওই টাকাই-বা দিতে গেল কেন? টাকা দেয়া বন্ধ রাখো। সবাই জানুক আমি যদি টাকা দিতে না চাই খুদাবন্দজাদার তা দেবার ক্ষমতা নেই। আর আমি যদি দিতে চাই তবে কারো সাধ্য নেই তা আটকায়।' কাজেই, ঋণ শোধ হতে দেরী হতে থাকল। পরে শিকার থেকে ফিরে তিনি সে টাকা আমায় দিয়ে দিলেন। আমার বারো হাজার টাকার যে খত্তখানি আটকে ছিল তা ও এই সঙ্গে পেয়ে গেলাম।

একুশে অক্টোবর তেরশো একচল্লিশ, সুলতান এক বিদ্রোহ দমন করার জন্য মবর যাত্রা করলেন। আমারও তার সঙ্গে যাবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু সুলতানের কাছ থেকে আদেশ এলো আমি যেন এ সময় দিল্লী ছেড়ে কোথাও না যাই। যে এ আদেশ নিয়ে এলো, সে এ আদেশ জারীর প্রমাণ রূপে আমার কাছ থেকে সই করিয়ে নিয়ে গেল। পাছে কেউ পাইনি বলে ছুতো দেখায়

সেজন্য ভারতে এরকম নিয়ম। যাবার আগে সুলতান আমার জন্য ছয় হাজার টাকা দেবার ব্যবস্থা ক'রে গেলেন। তিনি সুলতান কুতব-উদ-দীনের সমাধি সৌধ দেখাশোনার ভারও আমার ওপরেই চাপালেন। কুতব-উদ-দীনের কাছে একদা কাজ করতেন বলে সুলতান তার স্মৃতিনিদর্শনগুলির ওপর বিশেষ যত্ন নিতেন। যখনই তিনি তার সৌধে আসতেন, আমি দেখেছি, তিনি কুতব-উদ-দীনের জুতায় চুমু খেতেন ও তা মাথায় রাখতেন। ভারতীয়দের মধ্যে মৃত লোকের জুতা তার সৌধের পাশে একটি বালিশের ওপর রাখার নিয়ম। যখনই তিনি তার কবরখানা দেখতে আসতেন, জীবিতকালে যেভাবে তাকে কুর্নিশ জানাতেন তখনো সেই মতোই করতেন। তার বিধবা পত্নীকেও তিনি খুব শ্রদ্ধা করতেন ও বোন বলে ডাকতেন। তাকে তিনি নিজের মহলে থাকার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিলেন। পরে ইবন কাজী মিশর-এর সঙ্গে তার বিয়েও দেন। প্রতি শুক্রবার তার সাথে তিনি দেখা করতে যেতেন।

মবর রওনা হবার আগে আমাদের কাছ থেকে বিদায় নেবার জন্য সুলতান, সবাইকে ডেকে পাঠালেন। আমার কিছু বলার আছে কিনা তাও জানতে চাইলেন। আমার ছয়টি প্রার্থনা লেখা কাগজখানি বের করলাম। সুলতান বললেন: 'যা বলার আছে মুখে বলুন।' আমি প্রথমে বললাম: 'আপনি আমাকে কাজী পদে রেখেছেন, কিন্তু একদিনও আমি সে পদে কাজ করিনি। কাজ না ক'রে আমি কাজী পদ ভোগ করতে চাই না।' তখন তিনি আমায় দু'জন সহকারী নিয়ে বিচারে বসার জন্য অনুমতি দিলেন। তারপর আমি বললাম: 'সুলতান কুতব-উদ দীনের সৌধের তদারকির জন্য আমি ৪৬০ জন লোক রেখেছি। কিন্তু এর সম্পত্তি থেকে যা আয় হয় তা দিয়ে এদের মাইনেপত্তর, খোরাকি হয় না।' সুলতান উজীরকে এজন্য ৫০ হাজার (তঙ্কা) দেবার আদেশ দিলেন। দিলেন লাখ মণ শস্য দেবারও নির্দেশ। এরপর জানালাম: 'সুলতান আমায় যে গ্রামগুলি দিয়েছেন, তা অন্য গ্রামের সঙ্গে বদল করায় আমার সঙ্গীদের কয়েদ করা হয়েছে। এ থেকে যে টাকা আমি এ পর্যন্ত পেয়েছি সরকারী লোকেরা তা ফেরৎ দেবার বা আপনার কাছ থেকে রেহাই আদেশ দেখাবার কথা বলেছে।' 'তুমি তা থেকে কত নিয়েছ এ পর্যন্ত?' 'পাঁচ হাজার দীনার।' 'ঠিক আছে, আমি সে টাকা তোমায় দিয়ে দিচ্ছি।'—সুলতান বললেন। তারপর বললাম: 'সুলতান যে বাড়ী আমায় থাকার জন্য দিয়েছেন, তার

মেরামত দরকার।' সুলতান উজীরকে বললেন: 'মেরামত করিয়ে দিন।' তারপর সুলতান আমায় বললেন: আমার একটি উপদেশ দেবার আছে তোমাকে ; দেনা কোরো না। কোন্ দিন হয়তো সেজন্য তোমায় আইনের প্যাঁচে পড়তে হবে। তখন সে খবর আমাকে দেবার জন্য হয়তো কেউ গরজ করবে না। আমি যে টাকা তোমায় বরাদ্দ করেছি তার মধ্যে খরচ খরচা চালাবার চেষ্টা ক'রো।

চার হাজার খরচ ক'রে আমি বাড়ি মেরামত করালাম। কোষাগার থেকে এজন্য মাত্র ছ'শো দেয়া হলো। বাড়ির পাশে একটি মসজিদও তৈরী করালাম। তারপর কুতব-উদ-দীনের সৌধের কাজকর্মের দিকে মন দিলাম। এখানকার কর্মচারীদের খোরাকির জন্য সুলতানের দৈনিক বরাদ্দ ছিল ১২ মণ ময়দা ও ১২ মণ মাংস। আমার মনে হলো এ খুব কম। আর পুরো বরাদ্দের পরিমাণ এবার যখন অনেক, তখন দৈনিক বরাদ্দ বাড়িয়ে দেয়া যাক। তাই দৈনিক ৩৫ মণ ময়দা, ৩৫ মণ মাংস ও সেই অনুপাতে চিনি, ঘি ও পানের বরাদ্দ করলাম আমি। কর্মচারীদের ছাড়া পথচারীদেরও খাওয়াতে শুরু করলাম। তখন জোর মন্বন্তর চলছিল। এই খাদ্য-ব্যবস্থার ফলে তারা খুব উপকৃত হলো, এর খবর অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়লো।

মালিক সবিহ যখন দৌলতাবাদে সুলতানের কাছে গেলেন তখন তিনি তার কাছে এখানকার লোকদের অবস্থা জানতে চান। মালিক সবিহ জবাব দেন: 'যদি এই মানুষটির মতো (ইবন বাতুতা) আরো দু'জন লোক থাকতো তবে জনসাধারণকে কোনরকম দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হতো না।' শুনে সুলতান খুব খুশী হলেন। নিজের পোষাকভাণ্ডার থেকে আমায় একটি পোষাক উপহার পাঠিয়ে দিলেন।

মবর যাবার পথে সুলতানের সৈন্যরা যখন তেলিঙ্গানা পৌঁছাল তখন মহামারী আকারে তাদের মধ্যে প্লেগ দেখা দিল। তাই সুলতান প্রথমে দৌলতাবাদ ও পরে সেখান থেকে গঙ্গানদীর কাছে ফিরে এলেন। আমি সেখানে তার শিবিরে চলে গেলাম। এদিকে আইন-উল-মুল্ক ও অযোধ্যার শাসনকর্তা ওই সময়ে বিদ্রোহ ক'রে বসেছেন। এই দিনগুলিতে আমি আইন-উল-মুল্ক বন্দী হওয়া পর্যন্ত সুলতানের সঙ্গে কাটালাম। তারপর গঙ্গা ও সরযূ পার হয়ে সুলতানের সঙ্গে সালার মাসুদের আস্তানায় তাকে

শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য যাত্রা করলাম। ভ্রমণ শেষে সুলতানের সঙ্গেই ফিরে এলাম দিল্লী শহরে।

এরপরেই আমার ওপর সুলতানের রোষদৃষ্টি পড়লো। ঘটনা আর কিছুই না। শেখ শিহাব-উদ-দীনের সঙ্গে আমি তার দিল্লীর বাইরে থাকা গুহাঘরে দেখা করেছিলাম। তিনি যখন তাকে কয়েদ করলেন তখন তার ছেলেদের জেরা ক'রে জানতে পারলেন আমি তার সঙ্গে দেখা করতে যেতাম। সুলতান তার চারজন দাসকে আমার ওপর দরবার গৃহে সব সময় দৃষ্টি রাখার আদেশ দিলেন। সুলতান যদি কারো প্রতি একবার এরকম ব্যবহার শুরু করেন, তবে তার পক্ষে পার পাওয়া কষ্টকর। আমি ভগবানকে স্মরণ ক'রে উপবাস ক'রে চললাম। এক নাগাড়ে পাঁচদিন উপবাসের পর কিছু খেয়ে আবার চারদিন উপবাস করলাম। যাহোক, শেখকে কোতল করার পর আমি ছাড় পেলাম।

কিছুদিন পর আমি সুলতানের চাকরি ছেড়ে দিলাম। ঘর-সংসার ত্যাগ ক'রে পবিত্র ও জ্ঞানী 'গুহা মানব' ইমাম কমাল-উদ-দীনের সাগরেদ হলাম। সুলতান সে সময়ে সিন্ধুতে ছিলেন। ফকীর হয়েছি শুনে ডেকে পাঠালেন আমাকে। ফকীরের বেশেই গেলাম তার কাছে। তিনি অতি মোলায়েমভাবে আমার সাথে কথাবার্তা বললেন, আবার তার কাজে যোগ দিতে বললেন। আমি রাজী হলাম না। তার কাছে মক্কা যাবার অনুমতি চাইলাম। ১৩৪১ সালের ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিকে তা মঞ্জুর করা হলো।

চল্লিশ দিন যেতেই সুলতান আমার কাছে কয়েকটি ঘোড়া, কয়েকজন বাঁদী ও বালক বান্দা আর কিছু টাকা ও পোষাক পাঠালেন। আমি পোষাক পরে তার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। সুলতানের সঙ্গে দেখা করতে তিনি বললেন: 'তোমাকে আমি চীনের রাজার কাছে দূত হিসেবে পাঠাতে চাই বলে ডেকে পাঠিয়েছি। আমি জানি তুমি বেড়াতে ভালোবাস।' আমি তার প্রস্তাবে মত দিলাম। তিনি সব কিছু দরকারী ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। আমার সহচর হবার জন্য আরো কিছু লোক দিলেন।

চীনের রাজা ১০০ জন মেয়ে ও পুরুষ ক্রীতদাস, ৫০০ ভেলভেটের পোষাক, পাঁচ মণ কস্তুরী সুগন্ধি, পাঁচটি রত্ন-খচিত পোষাক, সোনার বুটি তোলা সুন্দর তূণীর কয়েকটি ও পাঁচখানি তরবারী উপহার পাঠিয়েছেন। এইসঙ্গে দূত

পাঠিয়ে সুলতানের কাছে করেছেন একটি দেব-মন্দির তৈরীর অনুমতি প্রার্থনা। করাজিল পর্বতের কাছে 'সমহল'-এ এই মন্দিরটি বানাতে চেয়েছেন তিনি। চীনের অধিবাসীরা এখানে তীর্থ করতে আসতো। ভারতের মুসলমান সৈন্যেরা একে অবরোধ ক'রে ধ্বংস ও লুটতরাজ করে।

সুলতান উপহার ও পত্র পেয়ে জানালেন: 'ইসলাম এধরনের কার্যকলাপের জন্য অনুমতি দেয় না। যারা জিজিয়া কর দেয় তারাই একমাত্র মুসলমান রাজ্যে কনীসা বা মন্দির গড়ার অনুমতি পায়। যদি আপনি সে কর দিতে রাজী থাকেন তবে আপনাকেও মন্দির গড়ার অনুমতি দেয়া যেতে পারে।'

উপহারের বেলা সুলতান তাদের থেকে বেশি আর অনেক ভালো জিনিষ পাঠালেন। জিন-বলগা সহ একশো ভাল জাতের ঘোড়া, ভারতীয় কাফেরদের মধ্য থেকে একশো পুরুষ বান্দা, একশো গায়িকা ও নর্তকী বাঁদী, একশোখানি অতি মিহি ও সুন্দর সূতীর কাপড়—যার প্রত্যেকখানির দাম ১০০ দীনার ক'রে, বহুবর্ণের একশোখানি রেশমী কাপড়, একশো প্রস্থ সলাহিয় কাপড়, কাশ্মীরী পশমে তৈরী পাঁচশোটি গরম পোষাক, একশোখানি আলোয়ান, আরো তিনশো প্রস্থ বিভিন্ন রকমের দামী কাপড়, ছয়টি তাঁবু ও একটি তাঁবুর ঘের, চারটি সোনার ও ছয়টি রূপার পানীয় পাত্রসম্ভার এবং আরো নানা রকমের দামী দামী জিনিষ সহ পনেরোটি বালক বান্দা।

দোসর হিসাবে আমার সঙ্গে দেয়া হলো অতি বিশিষ্ট পণ্ডিত আমীর জহীর-উদ-দীনকে। এর আদি নিবাস ইরানের জানজান শহর। কাফুর নামে এক যুবককে দেয়া হলো উপহার সামগ্রীর খবরদারীর জন্য। এছাড়া এক হাজার অশ্বারোহী সাথে নিয়ে হীরাটের আমীর মুহম্মদও চলেছেন আমাদের নিরাপদে জাহাজে তুলে দিতে। চীনের রাজার প্রতিনিধিরাও তাদের দলবল নিয়ে আমাদের সঙ্গে ফিরে চললেন। তারা পনেরো জন। দলপতির নাম 'তুরসী'। সঙ্গে তাদের একশো জনের মতো চাকর বাকর।

বিরাট দলবল নিয়ে ১৩৪২ সালের ২২শে জুলাই আমরা রওনা হলাম। ভারত সম্রাটের আদেশ, তার সাম্রাজ্য মধ্যে যেখানেই আমরা যাব রাজঅতিথিরূপে যেন আমাদের আদর-আপ্যায়ন করা হয়।

প্রথমে আমরা তিলবত (তিলপথ) এসে থামলাম। দিল্লী থেকে এর দূরত্ব ২½ পরসাঙ্গ। এরপর অউ আর হিলু। তারপর এলাম বয়ান।

এটি একটি বড়ো শহর। বাড়িঘর রাস্তাঘাট বেশ সুন্দর। শহরের জামী মসজিদটি সব থেকে সুন্দর মসজিদগুলির একটি। দেয়াল, ছাদ সব কিছু পাথরে তৈরী। এই শহরের বর্তমান আমীর মুজাফ্ফর। আগে ছিলেন মালিক মুজির। ইনি কুরাইশ-এর বংশধর বলে দাবী করতেন। খুব রুক্ষ স্বভাবের লোক ছিলেন, অনেক স্বেচ্ছাচারিতা করেছেন। মেরে ফেলেছেন এ শহরের অগুণতি লোককে। একজন অধিবাসীকে আমি দেখলাম। ইনি দেখতে বেশ সুন্দর। ঘরের দাওয়ায় বসে আছেন। তার হাত পা দুই-ই কেটে ফেলা হয়েছে।

একবার সুলতান শহরটি দেখতে এলে অধিবাসীরা মালিক মুজিরের নামে নালিশ জানাল। সুলতান মুজিরের গলায় বেড়ি পরাবার হুকুম দিলেন। এই ভাবেই তাকে সুলতানের হুকুমে পরিষদ মহাকক্ষে এসে উজীরের সামনে বসতে হতো। অধিবাসীরা লিখিতভাবে তার নামে অভিযোগ জানাত। সুলতান তাদের ক্ষতি পূরণ করার জন্য তাকে আদেশ দিলেন। তিনি সেইমতো তাদের টাকা দিয়ে ক্ষতিপূরণ করলেন। এরপর তাকে প্রাণদণ্ড দেয়া হলো।

এলাম এবার কয়াল শহরে (আলিগড়)। এটিও বেশ চোখ ভোলানো শহর। অনেক বাগ-বাগান রয়েছে। গাছের মধ্যে বেশির ভাগই আম। শহরের বাইরে এক বিরাট খোলা-মেলা জায়গায় আমরা শিবির গাড়লাম। এখানে আমরা বিশিষ্ট সাধক শেখ সামস-উদ-দীনের দেখা পেলাম। তিনি অন্ধ, খুব বুড়ো হয়ে পড়েছেন। পরে সম্রাট একে বন্দী করেন ও সেই অবস্থাতেই তিনি মারা যান।

যখন আমরা কয়েল এর কাছাকাছি, শুনতে পেলাম কতক হিন্দু কাফের জলালী শহর অবরোধ ক'রে-রয়েছে (আলিগড়ের ১১ মাইল দূরে বর্তমানে একটি গ্রাম)। জলালী কয়েল থেকে ৭ মাইল দূরে। তাই আমরা সেদিকে এগিয়ে চললাম। দেখলাম, কাফেররা জলালীর বাসিন্দাদের সঙ্গে লড়াই ক'রে চলেছে ও জলালী-বাসীরা প্রায় শেষ হবার মুখে। আমরা আক্রমণ করার আগ পর্যন্ত কাফেররা আমাদের কথা কিছুই জানতে পারেনি। তারা সব মিলিয়ে হাজারের মতো অশ্বারোহী আর হাজার খানেক পদাতিক। আমরা তাদের পুরোপুরি নির্মূল ক'রে তাদের ঘোড়া ও অস্ত্রশস্ত্র দখল ক'রে নিলাম।

আমাদের ২৩ জন অশ্বারোহী ও ৫৫ জন পদাতিক শহীদ হলো। উপহার সামগ্রীর ভারপ্রাপ্ত যুবক কাফুরও তাদের একজন। সম্রাট মুহম্মদের কাছে তার মৃত্যুর খবর পাঠিয়ে আমরা তার উত্তরের জন্য অপেক্ষা করতে থাকলাম। এর মধ্যে কাফেররা দুরারোহ এক পর্বত থেকে নেমে এসে জলালী শহরের আশে পাশে হামেশা হানা দিতে থাকলো। আমাদের লোকেরা স্থানীয় সামরিক শাসনকর্তার সাথে প্রতিদিন গিয়ে শত্রুদের হটিয়ে দিতে সাহায্য ক'রে চললো।

একদিন কতক সহচর নিয়ে আমি ঘোড়ায় চড়ে ঘুরতে বের হলাম। গরমের দরুন দুপুর বেলায় এক বাগানের মধ্যে ঢুকে সেখানে ঘুম লাগালাম। হঠাৎ একটা সোরগোল শুনে ভেঙে গেল ঘুম। দেখি, কাফেররা একটি গ্রামে হানা দিয়েছে। আমরা ঘোড়ায় চড়ে তাদের বাধা দেবার জন্য ছুটলাম। আমাদের তাড়া খেয়ে তারা পালাতে লাগল। আমরাও তাদের পিছু ভাগ ভাগ হয়ে ছড়িয়ে পড়লাম। আমার সাথে রইলো মাত্র ৫ জন সহচর। হঠাৎ জঙ্গল থেকে একদল অশ্বারোহী ও পদাতিক আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। তারা দলে ভারী হওয়ায় এবার আমরাই দিলাম পালাবার জন্য ছুট। জনা দশেক আমাদের পিছু তাড়া ক'রে এলো। পথ এবড়ো খেবড়ো পাথর-ভরা। আমার ঘোড়াটার পা সে-পথে ছুটতে গিয়ে একটা পাথরের খাঁজে গেল আটকে। আমি নেমে তার পা ছাড়ালাম, আবার ঘোড়ায় চেপে ছুটলাম। একবার ঘোড়ার জিনের সঙ্গে ঝোলানো খাপ থেকে সোনায় বাঁধানো তলোয়ারখানা খসে পড়লো। আবার নেমে গিয়ে তা তুলে আনলাম, খাপে ভরলাম। তখনো তিনজন লোক আমাদের তাড়া ক'রে চলেছে। একটা বিরাট খানার কাছে পৌঁছে ঘোড়া থেকে নেমে তার ভেতরে লুকোলাম।

এর পর অজানা জায়গায় পথ হারিয়ে ঘুরতে থাকলাম। ঘুরতে ঘুরতে পেলাম এক উপত্যকার মাঝে এক বিরাট জঙ্গলের মধ্য দিয়ে এঁকে বেঁকে চলা একটা পথের দেখা। কোথায় এ পথ গেছে কিছুই জানি না। সেই পথ ধরেই একা একা এগিয়ে চললাম বাধ্য হয়ে। পথে চল্লিশ জনের মতো কাফের তীর ধনুক নিয়ে আমায় ছেঁকে ধরলো। প্রাণ বাঁচাবার জন্য আমি তাদের প্রথা মতো মাটিতে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে আত্মসমর্পণ করলাম। এ ভাবে কেউ আত্মসমর্পণ করলে তাকে তারা প্রাণে মারে না। পাতলুন, সার্ট আর আলখাল্লা বাদে আর যাকিছু সঙ্গে ছিল সব তারা আমার কাছ থেকে কেড়ে নিল। তারপর

বনের মধ্য দিয়ে আমায় নিয়ে গেল একটি বড়ো গাছ-গাছালি ভরা বাগানের ভেতর। এখানে একটি পুকুর পাড়ে তাদের আস্তানা। আমায় সেখানে খানকয়েক জোয়ারের রুটি খেতে দিল। সেই রুটি আর কয়েক ঢোক জল খেয়ে আমি খিদে-তেষ্টা মেটালাম। তার পরে আমাকে মেরে ফেলার জন্য তিনজন লোকের হাতে সঁপে দেয়া হলো। এদের একজন দুষ্ট প্রকৃতির নিগ্রো, একজন বুড়ো লোক, অপর জন তারই ছেলে। এই বুড়ো লোকটি ও আর একজন সুদর্শন যুবকের সহৃদয়তায় শেষ পর্যন্ত বেঁচে গেলাম আমি। তারা ছেড়ে দিল আমায়। সুদর্শন যুবকটিকে আমি আমার আলখাল্লাটি দিয়ে তার বদলে তার ছেঁড়া-ফাটা কোটটি নিলাম। সে আমায় রাস্তা দেখিয়ে দিল। সেই পথ ধরে আমি দ্রুত হাঁটা দিলাম।

কিছুক্ষণ চলার পর আমার ভয় হলো, ছেড়ে দিলেও যদি আবার তারা আমায় বন্দী করে। আমি একটি বাঁশবনে ঢুকে সেখানে সারাদিন লুকিয়ে রইলাম। রাতের আঁধার নেমে এলে শুরু করলাম পথ চলা। তখন পথের এক ধারে একটি প্রস্রবণের দেখা পেয়ে খেয়ে নিলাম সেখানে জল। এক তৃতীয়াংশ রাত হেঁটে চলার পর একটি পাহাড়ের গোড়ায় পৌঁছে সেখানে শুয়ে পড়লাম। খুব ভোরে উঠে আবার শুরু হলো পথ চলা। কড়া রোদ ওঠার আগেই একটি বড়ো পাহাড়ে উঠে পড়লাম। এটির ওপরে অনেক অ্যাকেশিয়া ও লোট গাছ ছড়ানো। আমি লোট গাছ থেকে কতক ফল তুলে খেতে থাকলাম। আমার হাতে অনেক কাঁটা ফুটলো। এখনো তার দাগ রয়ে গেছে।

পাহাড় থেকে নেমে একটি তুলোর বাগিচায় এসে পড়লাম। সেখানে চোখে পড়লো একটি ভেরেণ্ডা বা এরণ্ড গাছও। দেখলাম একটি বাঁধানো পুকুর বা বাইন। এগুলি খুব গভীর ও প্রশস্ত কুয়ো। পাড় পাথরের দেয়াল দিয়ে বাঁধানো। ধাপ ধাপ সিঁড়ি জলের কিনার পর্যন্ত নেমে গেছে। কতক বাইন-এর মাঝে ও পাশে পাথরের গম্বুজ, মহাকক্ষ ও বসার আসন রয়েছে। যেসব অঞ্চলে জল নেই, মালিক ও আমীররা সেখানে এগুলি তৈরী ক'রে একে অন্যের চেয়ে বেশি নাম কেনার চেষ্টা করে। এই বাইনে জল খাবার সময় দেখতে পেলাম কতক সরষে গাছ। কেউ সেগুলি ধোবার সময় কিছু খসে পড়ে গেছে। আমি সেগুলি কুড়িয়ে কিছুটা খেলাম, বাকীটা কাছে রেখে

দিলাম। তারপর ভেরেণ্ডা গাছের নিচে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু সেখানে সশস্ত্র লোকের আনাগোনা দেখে শেষে সারাদিন লুকিয়ে রইলাম তুলোর বাগিচা-টিতেই। রাত হতে ঘোড়ার পায়ের খুরের দাগ লক্ষ্য ক'রে চলতে থাকলাম। চলতে চলতে হাজির হলাম আর একটি বাইনের ধারে। দেখলাম এখানে একটি গম্বুজও রয়েছে। জল খেয়ে, বাকী সরষে পাতা থেকে কতক খেয়ে মেটালাম খিদে। তারপর গম্বুজের মধ্যে ঢুকলাম। ভেতরটা সবুজ ঘাস কুটোয় ভরাট। বোধহয় পাখিরা এনে ছড়িয়েছে। সেখানেই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। একবার মনে হলো কোন কিছু যেন ঘাসের মধ্যে নড়া চড়া ক'রে বেড়াচ্ছে, হয়তো বা সাপ। কিন্তু আমি তখন এতো ক্লান্ত যে সেদিকে মন দেবার মতো অবস্থা নেই।

সকাল বেলা একটা বড়ো রাস্তা ধরে হেঁটে একটা ছারখার ক'রে দেয়া গ্রামে এসে পৌঁছলাম। শেষে আরেকটা রাস্তা ধরলাম। সেটিও অমনি এক গ্রামে এসে শেষ হয়েছে। এই ভাবে কয়েকদিন ঘুরে ঘুরে কাটালাম। এর মধ্যে একদিন এক বাগিচার মধ্যে একটি পুকুর দেখলাম। পুকুরের ভিতরটা বাড়ির মতো দেখাচ্ছিল। পুকুরের চারিদিকে **Purslane**-এর মতো নানান গাছ। ভাবলাম এখানে একটু জিরিয়ে নিই। হয়তো কারো দেখা মিলে যেতে পারে যে আমায় (মুসলমান) বসতির দিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। কিন্তু খানিক পরে, একটু বল ফিরে পেয়ে, আবার একটা পথ ধরে হাঁটা শুরু করলাম। পথে ষাঁড়ের খুরের ছাপ নজরে এলো। সেই দাগ ধরে হাঁটতে হাঁটতে একটি ষাঁড়ের দেখা পেলাম। তার পিঠে একগাদা জিন ও ফসল কাটা কাস্তে।

পথটা যেহেতু কাফেরদের গ্রামের দিকে গিয়েছে তাই আমি আরেকটা ভিন্ন পথ ধরলাম। এবারও একটা ছারখার হয়ে যাওয়া গ্রামে ঢুকলাম। এখানে দু'জন কালো লোককে দেখতে পেলাম। দু'জনেই পুরো উলঙ্গ। তাদের ভয়ে একটা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে গেলাম। রাতে একটা প্রকাণ্ড জালার মতো কিছু চোখে পড়লো। এগুলিতে শস্য জমা ক'রে রাখা হয়। এটির তলায় একটি বড়ো গর্ত, তা-দিয়ে অনায়াসে একজন মানুষ যেতে পারে। আমি এটির ভেতর ঢুকে পড়লাম। দেখি ভেতরটা তুষে ঢাকা, একটা পাথরও পড়ে আছে। পাথরটার ওপরে মাথা রেখে সেখানেই শুয়ে পড়লাম। মাটির জালাটির মধ্যে

বসে ছিল একটা পাখিও। সারারাত সে ডানা ঝটপট ক'রে চললো। বোধ হয় কোন কিছুর জন্য ভয় পেয়ে গিয়েছিল। আমরা দুই ভয়ার্ত প্রাণী এভাবে এক জায়গায় রাত কাটালাম।

সাত দিনের দিন একটি ঘন বসতিভরা হিন্দু গ্রামের দেখা পেলাম। সেখানে পুকুর, সবুজ খেত-বাগিচা সবই আছে। আমি তাদের কাছে কিছু খাবার ভিখ চাইলাম। কিন্তু তারা মানা ক'রে দিল। একটা কুয়োর কাছে কিছু মূলো পাতা পড়ে থাকতে দেখে শেষ অব্দি তাই কুড়িয়ে খেলাম। গেলাম সেখান থেকে আরেকটি গ্রামে। সেটিও কাফেরদের গ্রাম। একদল রক্ষী গ্রামটি পাহারা দিচ্ছে। দেখে, তারা আমায় ডাক দিল। আমি কোন জবাব না দিয়ে মাটির ওপর বসে রইলাম। একজন খোলা তলোয়ার নিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এলো, আমায় মারার জন্য সেটি তুলল। আমি তখন এত ক্লান্ত ও অবসন্ন যে সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করার ক্ষমতাও নেই। সে আমায় তন্ন তন্ন ক'রে তল্লাসী করলো। কোন কিছু না পেয়ে শেষে আমার জামাটিকে নিয়ে নিল।

অষ্টম দিনে আমি তেষ্টায় কাতর হয়ে পড়লাম। একটুও খাবার জল পেলাম না কোথাও। একটি গ্রামে এলাম। দেখি, সেটিও ছারখার ক'রে দেয়া হয়েছে। সেখানেও কোন পুকুরের দেখা পেলাম না। নিশ্চয়ই কোথাও কোন কুয়ো বা জলাধার আছে এই ভেবে আমি একটা রাস্তা ধরে চলতে থাকলাম। খানিকটা যেতেই একটি কাঁচা কুয়ো নজরে এলো। তাতে একটা ঘাসের তৈরী দড়িও আছে, কিন্তু নেই জল তোলার পাত্র। আমি আমার পাগড়ীটা দড়িতে বেঁধে কুয়োয় নামিয়ে ভিজিয়ে নিলাম, তাই চিপড়ে চিপড়ে জল খেয়ে তেষ্টা মেটাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু মিটলো না তেষ্টা। অগত্যা পায়ের এক পাটি বুট দড়িতে বেঁধে তাই দিয়ে জল তুলে খেলাম। তবু, তেষ্টা পুরো না মেটায় আবার ওই ভাবে জল তুলতে গেলাম। কিন্তু কপাল মন্দ! দড়িটি ছিঁড়ে বুট জুতাখানি কুয়োয় পড়ে গেল। তখন অন্য পাটি-টি বেঁধে জল তুললাম ও প্রাণ ভরে খেলাম। এমন সময় একজন কালো রঙের লোক হাতে একটি জলের পাত্র ও কাঁধে একটি ঝুলি নিয়ে সেখানে হাজির হলো। তিনি আমায় 'সালামুন আলয়কুম' জানালেন। পারসী ভাষায় আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। বললাম: 'আমি পথ হারিয়ে ফেলেছি।' তিনি জবাব দিলেন: 'আমিও তাই।' এরপর তিনি তাঁর ঝুলি থেকে এক মুঠো চাল ও ছোলা ভাজা খেতে দিলেন আমাকে।

দু'জনে একসঙ্গে চলতে শুরু করলাম। কিছুক্ষণ চলার পর আমার হাঁটার শক্তি লোপ পেল, বসে পড়লাম। আমার অবস্থা দেখে তিনি আমায় পিঠে ক'রে নিয়ে এগিয়ে চললেন। আমায় কোরান থেকে একটি লাইন আবৃত্তি করতে বললেন। আবৃত্তি করতে করতে কখন ঘুমে ঢুলে পড়েছি জানা নেই। যখন ঘুম ভাঙলো দেখি লোকটি আর নেই। আমি একটা জনবসতি ভরা গ্রামের মাঝে পড়ে আছি। গ্রামের ভেতরে ঢুকে জানলাম এটি মুসলমান শাসক (হাকিম)-এর অধীন একটি হিন্দু গ্রাম। হাকিমকে খবর দেয়া হয়েছে। তিনি আমার কাছে এলেন। আমি তার কাছে গ্রামের নাম জানতে চাইলাম। তিনি জানালেন 'তাজপুর' (তাজবুর)। যেখানে আমার সহচররা রয়েছে, সেই কয়াল থেকে এটি মাত্র দুই পরসঙ্গ দূরে।

হাকিম আমায় তার বাড়ি নিয়ে গেলেন। খেতে দিলেন। আমি স্নান করলাম। তিনি আমায় বললেন: 'কয়াল শিবিরের একজন মিশরীয় আরব আমার কাছে একটি পোষাক ও পাগড়ী রেখে গেছে।' আমি বললাম: 'তাই আমায় দিন। যতক্ষণ না শিবিরে পৌঁছতে পারি তাই পরি।' তিনি এনে দিলেন। আমি অবাক হয়ে দেখি সেগুলি আমারই পোষাক। কয়াল এসে আমিই সেগুলি সেই আরবকে দিয়েছিলাম।

সেই রাতেই আমার নিরাপত্তার খবর দিয়ে কয়ালে সঙ্গীদের চিঠি লিখলাম। আমার জন্য ঘোড়া ও পোষাক নিয়ে এলো তারা। খবর পেলাম সুলতানের কাছ থেকেও চিঠির উত্তর এসে গেছে। তিনি তার জামদার (পোষাক তত্ত্বাবধায়ক) ক্রীতদাস সুম্বুলকে উপহার সামগ্রীর দায়িত্ব নিতে পাঠিয়েছেন ও আমাদের এগিয়ে চলার আদেশ দিয়েছেন।

আবার যাত্রা শুরু করলাম আমরা। এলাম বৃজপুর। এখানে একটি চমৎকার 'জাবীয়' বা অতিথিশালা রয়েছে।

বৃজপুর থেকে রওনা হয়ে আমরা আব-ই-সীয়া বা কালী নদীর পারে শিবির ফেললাম। তারপর সেখান থেকে কনৌজ শহরে এসে হাজির হলাম। এটি একটি বড়ো শহর। বাড়ি ঘর বেশ সুন্দর ও মজবুত। জিনিষ পত্রের দরদাম সস্তা। চিনি প্রচুর। এখান থেকে তা দিল্লী চালান যায়। শহরটি একটি বিরাট প্রাকার দিয়ে ঘেরা। শেখ মৈজুদ্দীন-অল-বাখরজী এখানে থাকেন। তিনি আমাদের থাকা-খাওয়া আদর-আপ্যায়নের ব্যবস্থা করলেন।

কনৌজে আমরা তিনদিন কাটালাম। ইতিমধ্যে সুলতানের কাছে আমার নিখোঁজের খবর দিয়ে সঙ্গীরা যে চিঠি দিয়েছিল তার উত্তর এসে গেল। দিল্লীশ্বর জানিয়েছেন : 'তাকে (ইবন বাতুতাকে) যদি না পাওয়া যায় তবে দৌলতাবাদের কাজী ওয়াজীহ্-উল-মূল্ক-কে যেন সঙ্গে নেয়া হয়।'

আমরা এ শহর থেকে হনউল এসে শিবির গাড়লাম। এরপর বাজীরপুর, তারপর বজাল। সেখান থেকে মউরী শহরে। সুন্দর বাজার হাট নিয়ে ছোট শহরটি। মউরী থেকে এলাম মরহ শহরে। এটি একটি বড়ো শহর। এর বেশির ভাগ লোকই ধিম্মী কাফের। শহরটি বেশ সুরক্ষিত। এখানে ভালো গম হয়। এতো ভালো গম আর কোথাও পাওয়া যায় না। এখান থেকে তা দিল্লী চালান যায়। এর দানা লম্বা, ঘন হলদে ও মোটা। চীন ছাড়া আর কোথাও এ ধরনের গম দেখিনি। শহরটি মালবদের। এরা হিন্দু জাতির লোক। চেহারা বেশ লম্বা চওড়া, দেখতে সুন্দর। তাদের মেয়েরাও খুব সুন্দরী। কাম-কলায় খুব তৎপর ও দক্ষ। মারাঠা ও মালদ্বীপের মেয়েদের বেলাও একথা খাটে।

এরপর আমরা অলাপুর গেলাম। শহরটি ছোট, অধিবাসীরা কাফের ও সুলতানের শাসনাধীন। অলাপুর থেকে একদিনের পথ দূরে আরেকজন কাফের সুলতান ছিলেন। তার নাম কতম। তিনি জনবিলের রাজা ছিলেন। গোয়ালিয়র আক্রমণ ও অবরোধ করেন। এরপর তাকে হত্যা করা হয়। এই কাফের রাজা তার আগে রাপ্রী শহরও অবরোধ করেন। এ শহরটি যমুনার তীরে। আর এক কাফের রাজা রাজুর কাছে এ সময়ে ইনি সাহায্য চান। তার রাজধানীর নাম সুলতানপুর (গুমাত নদীর ডান তীরে)। দু'জনে মিলে রাপ্রী শহর আক্রমণ করেন। কিন্তু যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত তারা পরাজিত হলেন। দুই রাজাই হলেন বন্দী। তাদের কোতল ক'রে মুণ্ড সম্রাটের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হলো।

অলাপুর থেকে গোয়ালিয়র হাজির হলাম। এর বর্ণনা আগেই দিয়েছি। এখানকার আমীর হলেন আহমদ বিন শেরখান। একদিন যখন আমি তার কাছে গেলাম, দেখি, তিনি একজন কাফেরকে কাটতে উঠেছেন। আমি তাকে অনুনয়ের সুরে ভগবানের নামে একাজ করতে বারণ করলাম। বললাম, আমি কখনো কোন লোককে আমার চোখের সামনে হত্যা করতে দেখিনি। তখন তিনি

তাকে বন্দী করার আদেশ দিলেন। এভাবে সেই কাফেরটি মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেল।

গোয়ালিয়র থেকে গেলাম আমরা পরবন। হিন্দু এলাকার ঘেরের মধ্যে এটি মুসলমানদের একটি ছোট শহর। এর আশেপাশে অনেক হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের বাস। প্রায়ই শহরের মধ্যে সিংহ হানা দেয়। মানুষ শিকার ক'রে তাদের ঘাড় মটকে রক্ত পান করে অথচ মাংস খায় না। কতক লোক আমায় বললো: এ আসলে সিংহের কাজ নয়, কোন যোগী তার ভোজ-বিদ্যা বলে সিংহের বেশে এরকম ক'রে বেড়াচ্ছে। তাদের কথায় আমার কিন্তু বিশ্বাস হলো না।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে, হিন্দুস্তানে যেবার খুব দুর্ভিক্ষ হলো, সে সময়ের একটি ঘটনা। সুলতান তখন তেলিঙ্গানায়। তিনি আদেশ দিলেন দিল্লীর প্রত্যেকটি লোককে দৈনিক দেড় রতল ক'রে খাদ্য দেয়া হোক। উজীর, আমীর ও কাজীদের ওপর এই কাজের দায়িত্ব ভাগ ক'রে দিলেন। আমার ওপর পড়লো ৫০০ জন লোকের ভার। আমি দু'খানা বাড়িতে চালা ক'রে ৫০০ গরীবকে ঠাঁই দিলাম। প্রতি পাঁচদিন অন্তর তাদের এক সঙ্গে পাঁচদিনের ক'রে খাবার দিতে থাকলাম। একদিন তাদের মধ্য থেকে একটি স্ত্রীলোককে আমার কাছে আনা হলো। সবাই বললো এ একজন কফতার (ডাকিনী)। সে একটি বাচ্চার হৃৎপিণ্ড খেয়েছে। তারা শিশুর মৃতদেহটি আমার কাছে আনলো। আমি তখন স্ত্রীলোকটিকে নায়েব-উস-সুলতান-এর কাছে পাঠিয়ে দিলাম। স্ত্রীলোকটি সত্যই ডাকিনী কিনা তার মীমাংসা করার জন্য তখন তিনি চারটি কলসীর সঙ্গে তার হাত-পা বেঁধে তাকে যমুনা নদীতে ছুঁড়ে ফেলার আদেশ দিলেন। তাই করা হলো। সে ডুবলো না। এ থেকে প্রমাণ হয়ে গেল যে সে একজন ডাইনী। যদি ডুবে যেত তবে সে ডাকিনী নয় বলে প্রমাণ হতো। নায়েব তাকে পুড়িয়ে মারার আদেশ দিলেন তখন। তাই করা হলো। শহরের অধিবাসীরা দলে দলে এসে তার ভস্মাবশেষ নিয়ে গেল। তাদের বিশ্বাস, ওই ছাই যে মাখবে তাকে হাল বছরে কোন ডাইনী আর কিছু করতে পারবে না।

আর একবার আমি যখন রাজধানীতে, সুলতান একদিন আমায় ডেকে পাঠালেন। আমি গেলাম। দেখি, একটি খাস কামরায় তিনি তার ক'জন

পেয়ারের লোক ও দু'জন যোগীকে নিয়ে বসে আছেন। যোগী দু'জন গা-মাথায় কম্বল জড়িয়ে বসে রয়েছেন। কারণ আর কিছুই না। লোকে যেমন ছাই ঘসে বগলের লোম তোলে তারাও তেমনি ক'রে তাদের মাথার চুল তুলে ফেলেছে। সুলতান আমায় বসতে বললেন। আমি বসলাম। তিনি তখন যোগী দু'জনকে বললেন : ইনি একজন নাম করা লোক, অনেক দূরদেশ থেকে এখানে এসেছেন। একে এমন কিছু দেখান, যা ইনি জীবনে কখনো দেখেননি। তারা বললেন : 'বেশ'। তারপর তাদের একজন বসে থাকা অবস্থায় আমাদের মাথার ওপর দিয়ে শূন্যে উঠে গেলেন। আমি এ দৃশ্য দেখে শুধু অবাক নয়, রীতিমতো ভয় পেয়ে জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লাম। সুলতান আমায় ওষুধ খাওয়ালেন। একটু সুস্থ বোধ ক'রে উঠে বসলাম। দেখি, যোগী তখনো সেই ভাবে শূন্যে। তার সঙ্গী ঝুলির ভেতর থেকে খড়ম বা ওই জাতীয় কিছু বার ক'রে খুব রাগের ভঙ্গীতে সেটিকে মেঝেতে ঠুকলেন। সেটি সোজা উঠে গিয়ে শূন্যে বিচরণরত যোগীর ঘাড়ে আঘাত করতে থাকল। সে তখন ধীরে ধীরে নেমে এসে আমাদের মাঝে বসলো। সুলতান জানালেন : 'শূন্যে বিচরণকারী যোগী, অপর জনের শিষ্য।' তিনি আরো বললেন যে আমি অমন ভয় পেয়ে না গেলে তিনি তাদের এর চেয়েও ঢের ঢের চমকপ্রদ ঘটনা দেখাতে বলতেন। আমার কিন্তু ফিরে এসে বুকের ধুকধুকনি বেড়ে গেল, বিছানায় পড়লুম। সুলতান আমায় একটা বলবর্ধক ওষুধ বাতলালেন, আর তা খেয়ে শেষ পর্যন্ত সেরে উঠলাম।

অনেক যোগীই অবাক কাণ্ড ঘটানোর ক্ষমতা রাখেন। যেমন, কেউ হয়তো মাসের পর মাস না খেয়ে থাকেন। অনেকে মাটিতে গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে থাকেন, ওপর মাটি দিয়ে পুরো ঢেকে দেয়া হয়, শুধু হাওয়া যাবার মতো একটুখানি ফোকর থাকে। সেভাবে তারা মাসের পর মাস কাটান। কতক যোগী নাকি ঠায় এক বছরও এভাবে থাকেন।

মাঙ্গালোরে এক মুসলমানকে দেখেছি। সে যোগীদের কাছে এ বিষয়ে পাঠ নিত। তার জন্য একটি ছোট্ট দণ্ড পোঁতা হয়েছিল। জল ও খাবার না খেয়ে ২৫ দিন সে তার ওপর খাড়া থাকলো। এরপর আমি চলে আসি। সে তারপর আরো কত দিন সেখানে ওই ভাবে ছিল তা বলতে পারব না।

যাহোক, পরবন শহর থেকে অমবারী এলাম আমরা। সেখান থেকে কজররা (খজুরাহো)। এখানে একটি প্রকাণ্ড হ্রদ আছে। প্রায় এক মাইল লম্বা। এর কাছে কয়েকটি মন্দির আছে। তার বিগ্রহগুলিকে মুসলমানেরা ক্ষত-বিক্ষত ক'রে দিয়েছে। সরোবরের মাঝে লাল পাথরে গড়া তিনটি গম্বুজ। প্রত্যেকটিই তেতলা। সরোবরের চার কোণেও গম্বুজ আছে। তাতে বাস করেন একদল যোগী। চুলগুলি জটা করা। অনেক মুসলমান তাদের কাছ থেকে অলৌকিক ক্ষমতা আয়ত্ত করার জন্য তাদের শিষ্যত্ব নিয়েছে। শোনা যায়, যাদের কুষ্ঠ ও গোদ আছে তারা নাকি তাদের সঙ্গে বাস করলে ভালো হয়ে যায়।

এরপর চন্দেরী শহরে এলাম। এটি একটি বড়ো শহর। দোকান বাজারে ভর্তি। চন্দেরী থেকে গেলাম ধার শহর। এটি মালবের রাজধানী ও প্রদেশের সব থেকে বড়ো জেলা। শস্যের ফলন সেখানে অফুরান, বিশেষ ক'রে গমের। এখান থেকে দিল্লীতে পান চালান যায়। এ দু'জায়গার দূরত্ব ২৪ দিনের পথ। এই পথের পাশে স্তম্ভ ক'রে তাতে মাইলের সংখ্যা লেখা রয়েছে।

ধার থেকে আমরা উজ্জয়িনীতে পা দিলাম। ঘন-বসতি-ভরা অনুপম শহর এটি। এখান থেকে চললাম দৌলতাবাদ। বিরাট শহর একটি। অতি গুরুত্বপূর্ণও। আয়তন ও গুরুত্বের দিক থেকে কেবল মাত্র দিল্লীর সঙ্গেই এর তুলনা চলে। এ শহরটি তিনটি এলাকায় বিভক্ত। একটি এলাকা সুলতানের ও তার সেনাদলের আবাসের জন্য সংরক্ষিত। দ্বিতীয় এলাকাটির নাম কটক (অর্থাৎ এটি সৈন্যদের ছাউনী)। তৃতীয় এলাকাটি একটি অতুলনীয় দুর্গ। এর নাম দেওগির। অপ্রতিরোধ্য দুর্গ হিসেবে এর কোন জুড়ি নেই।

দৌলতাবাদ (দেবগিরি) প্রদেশের অধিবাসীরা মরহট্ট জাতির লোক। এদের মেয়েরা অতুলনীয় সুন্দরী। বিশেষ ক'রে তাদের নাক ও চোখের পাতা দেখার মতো। তারা কামকলার ব্যাপারে বেশ দক্ষ, সব রকম রীতি-নীতিতে কুশলী। দৌলতাবাদের কাফেররা ব্যবসায়ী। তাদের যে-সব জিনিষের ব্যবসা, তার মধ্যে সব থেকে উল্লেখযোগ্য হলো মুক্তা। তারা বিশেষ ধনী। এদের শাহ বলা হয়।

এই অঞ্চলটিতে যথেষ্ট আঙুর ও বেদানা ফলে। বছরে দু'বার গাছে ফল

ধরে। প্রচুর লোকের বাস থাকায় ও বিরাট অঞ্চল বলে এখান থেকে প্রচুর রাজস্ব ও ভূমিকর আদায় হয়। অঞ্চলটি তিন মাসের পথ জুড়ে বিস্তৃত। আমি শুনলাম এক হিন্দু (বার্ষিক) ১৭ কোটি টাকা (দীনার) কর দেবে বলে একে ইজারা নিয়েছিল। কিন্তু সে তার কথা রাখল না, হিসাবে ঘাটতি দেখাল। ফলে তার সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। জ্যান্ত অবস্থায় তুলে ফেলা হয় তার গায়ের চামড়া।

দৌলতাবাদ শহরে একটি পল্লী রয়েছে, যেখানে পুরুষ ও মেয়ে গায়ক গায়িকারা ও নর্তকীরা গান-বাজনা-নাচের আসর বসায়। এ অঞ্চলটি তরবাবা নামে পরিচিত।

এ শহর ছেড়ে এরপর আমরা নন্দরবারের দিকে এগিয়ে চললাম। শহরটি ছোটখাটোর মধ্যে। এর বাসিন্দারাও মরহট্ট। এরা বিভিন্ন রকম হাতের কাজে বিশেষ কুশলী। চিকিৎসক, জ্যোতিষী ও অভিজাত ব্যক্তিরা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রী। খাদ্য এদের ভাত, শাক-সবজি, তিল তেল। এরা প্রাণী হত্যা বা তাদের পীড়ন করা পছন্দ করে না। খাবার আগে প্রত্যহ স্নান করে। সাত পুরুষের ব্যবধান না হলে এরা জ্ঞাতিদের মধ্যে বিয়েথা করে না। মদ খাওয়া এদের কাছে সব থেকে হীন পাপ কাজ। এখানকার (ভারতের) মুসলমানদের কাছেও তাই। যে সব মুসলমান মদ খায় তাদের ৮০ বার চাবুক মেরে তিন মাস মাটির নিচের জেলখানায় কয়েদ রাখা হয়।

নন্দরবার থেকে এসে পড়লাম সাগর। একটি বড়ো নদীর পাড়ে গড়ে উঠেছে এই বড়ো শহরটি। নদী ও শহরের নাম এক। নদীর পাড়ে ক্ষেতে জল দেবার জন্য অনেক জল-চক্র রয়েছে। এ শহরের লোকেরা ন্যায়নিষ্ঠ ও ধার্মিক। সম্মানবোধও প্রখর। তাদের কার্যকলাপ প্রশংসা করার মতো। এখানে তারা অনেক পুণ্যাশ্রম গড়েছে। প্রত্যেকটি পুণ্যাশ্রমের খরচ জোগানোর জন্য তার বাগ-বাগিচা রয়েছে। শহরটিতে অনেক লোকের বাস। বিদেশীদের বেশ আদর-আপ্যায়ন করে। এ শহরে কোনরকম কর লাগে না বলে পর্যটকেরা বিশেষভাবে সেখানে যায়।

সাগর থেকে এলাম কাম্বে শহরে। এটি উপসাগরের কূলে। ঠিক যেন এক উপত্যকা। এখানে জাহাজের যাতায়াত রয়েছে, জোয়ার-ভাঁটাও দেখা যায়। বাড়ি ঘরের রুচিকর স্থাপত্য ও এর মসজিদটির গঠন-শৈলীর কথা বিচার করলে

এই শহরটিকে সব থেকে সুন্দর শহরগুলির একটি বলে মেনে নিতে হয়। অধিবাসীদের মধ্যে অধিকাংশই বিদেশী বণিক।

কাম্বে থেকে এবার কাবা। এটিও জোয়ার-ভাঁটা খেলা এক উপসাগরের তটে। শহরটি এক কাফের রাজার রাজ্যের ভিতরে। রাজার নাম জালনসী।

কাবা থেকে এলাম এবার গন্ধার। এটিও উপসাগরের কিনারে একটি বড়ো শহর। এটিতেও কাফেরদের বাস।

গন্ধার (ও কাম্বে)-র কাফের রাজা জালনসী মুসলমান সরকারের অধীন। ভারত সম্রাটকে সে প্রতি বছর উপহার পাঠায়। গন্ধার এসে পৌঁছলে রাজা আমাদের স্বাগত জানাতে এলেন ও খুব সম্মান দেখালেন। আমাদের থাকার জন্য তার দুর্গটি ছেড়ে দিলেন। এই শহর থেকে চাপলাম আমরা জাহাজে।

এখানকার মুসলমান নাগরিকরা দেখা করলেন এসে আমাদের সাথে। এদের মধ্যে জাহাজ মালিক ইব্রাহীমও ছিলেন। নিজের বিশেষ কাজে ব্যবহারের জন্য তার ছটি জাহাজ ছিল।

আমরা যে জাহাজটিতে চাপলাম সেটি ওই ইব্রাহীমেরই। নাম অল্-জাকর। সঙ্গে আর দু'টি জাহাজে আমাদের জিনিষপত্র। এর একটি জাহাজ ইব্রাহীমের ভাইয়ের। অন্যটি এখানকার রাজার।

দু'দিন বাদে বৈরাম দ্বীপে এলাম। এখানে কোন মানুষজন নেই। মূল ভূখণ্ড চার মাইল দূরে। আগে এখানে কাফেররা থাকত। মুসলমানদের আক্রমণের ফলে এখন এর এমন হাল।

পরের দিন এলাম গোগো (কুক)। বিরাট বাজার এলাকা নিয়ে একটি বড়ো শহর এটি।

গোগোর রাজা দুনকুল একজন কাফের। ভারত সুলতানের অধীনতা স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। তবে কার্যতঃ তিনি একজন বিদ্রোহী।

এ শহরটি ছাড়ার তিন দিন পর সন্দাপুর দ্বীপে এসে জাহাজ ভিড়ল। এই দ্বীপের মাঝে ৩৬টি গ্রাম। একটি খাড়ি এলাকার মধ্যে দ্বীপটি। দ্বীপের ঠিক মাঝখানে দু'টি শহর রয়েছে। পুরানোটি হিন্দুদের গড়া, নতুনটি মুসলমানদের। প্রথম যখন তারা এটি জয় করে ওই সময় এটি বানায়। এখানে একটি জামা মসজিদ আছে। দেখতে এটি ঠিক বাগদাদের মসজিদটির মতো।

পরের দিনই হিনাবরে এসে পৌঁছলাম। এটি বিশাল এক উপসাগরের

তীরে। বড়ো বড়ো জাহাজ এখানে ভিড়তে পারে। সাগরতীর থেকে শহরটি আধমাইলের মতো দূরে। বর্ষাকালে এই সাগর ভীষণ ঝড়-বাত্যা ও প্রতিকূল আবহাওয়ায় অস্থির হয়ে ওঠে। এর ফলে মাছ ধরার ছাড়া অন্যান্য জাহাজ চলাচল অসম্ভব। হিনাবর শহরের অধিবাসীরা সাফাই গোষ্ঠীয় মুসলমান। ধর্মপ্রাণ ও ভগবান-বিশ্বাসী। সাগর পাড়ি দিতে ও নৌ-যুদ্ধে পটু। এ শহর ও পুরো সাগর পারের মেয়েরা সেলাই করা পোষাক পরে না! তারা তাদের কাপড়ের এক দিকটা কোমরে ঘের দেয়, অন্যদিকটা দিয়ে বুক ও মাথা ঢাকে। এরা সুন্দরী ও পতিব্রতা। প্রত্যেকের নাকে সোনার নোলক। এদের সকলেরই কোরান মুখস্থ। এখানে মেয়েদের ১৩টি স্কুল দেখেছি। এরকমটি আর কোথাও চোখে পড়েনি। এখানকার লোকেরা নৌ-ব্যবসা ক'রে জীবিকা অর্জন করে। আর কোন রোজগারের পথ নেই। রাজ্যের উপরি রোজগার বলতে, মালাবারের লোকেদের কাছ থেকে পাওয়া বার্ষিক কর। হিনাবরের সুলতান জমাল-উদ-দীনের নৌ-ক্ষমতাকে মালাবারের লোকেরা ভয় করে। তার ছয় হাজার অশ্বারোহী এবং পদাতিক সৈন্যবাহিনীও রয়েছে।

হিনাবরের সুলতান জমাল-উদ-দীন মুহম্মদ একজন কুশলী ও প্রতাপী রাজা। তবে তিনি কাফের রাজা হর্ষবের অধীন।

আমি এবার সুলতান জমাল-উদ-দীনের সঙ্গে তিন দিন কাটালাম। তিনি আমাদের প্রয়োজনীয় নানা জিনিষ দিলেন। আমরা তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবার যাত্রা শুরু করলাম।

তিনদিন পরে মালাবার উপকূলে এসে নামলাম। এটি গোলমরিচের দেশ। অঞ্চলটি সমুদ্র উপকূল বরাবর। সন্দাপুর থেকে কুইলন পর্যন্ত দু'মাসের পথ। রাস্তার দু'পাশে ঘন গাছের ছায়া। প্রতি আধ মাইল অন্তর একটি ক'রে কাঠের বাড়ি। এতে হিন্দু-মুসলমান সব পথিকদের জন্যই বেঞ্চ পাতা রয়েছে। প্রত্যেকটি বাড়ির পাশে কূয়ো। কূয়োর ভার একজন কাফেরের ওপর। কাফেরদের সে পাত্রে ক'রে জল দেয়। মুসলমান হলে জল ঢেলে দেয় তার হাতে। মালাবারের কাফেররা মুসলমানদের তাদের বাড়িতে ঢুকতে দেয় না বা তাদের বাসনপত্র ব্যবহার করতে দেয় না। যদি কোন মুসলমান তাদের পাত্রে খায় তবে পাত্রটি ভেঙে ফেলে দেবে বা কোন মুসলমানকে দিয়ে দেবে। কোন মুসলমানকে খেতে দিলে তা কলার পাতায় দেবে। প্রত্যেক বিশ্রামাগারের কাছেই মুসলমানদের

বাড়ি আছে। মুসলমান পর্যটকেরা সাধারণতঃ তাদের কাছেই আশ্রয় নেয়। তারাই তাদের রেঁধে বেড়ে খাওয়ায়। তা না হলে মুসলমানদের পক্ষে এদেশে ভ্রমণ করাই অসম্ভব হয়ে উঠতো।

দু'মাসের এই রাস্তা বরাবর এমন একটু জমিও চোখে পড়বে না যেখানে চাষ আবাদ হয় না। প্রত্যেক লোকেরই নিজের আলাদা বাগান রয়েছে। বাড়িটি এই বাগানের মাঝে। কাঠের বেড়া দিয়ে চারিদিক ঘেরা। এদেশে সুলতান ছাড়া আর কেউ ঘোড়ায় চড়তে পারে না। বাহনের পিঠে মালপত্তর চাপিয়ে যাতায়াত করার উপায়ও নেই। স্থানীয় লোকদের যাতায়াতের প্রধান সহায় হলো দোলা। মালপত্র মানুষেই বয়। এজন্য এখানকার বণিকদের কাছে হামেশা একশো বা তার কাছাকাছি মালবাহক দেখা যাবে। এখানকার রাস্তাটির চেয়ে নিরাপদ রাস্তা আমি আর কোথাও দেখিনি। যদি কেউ একটি আখরোটও চুরি করে তবে তাকে তারা মৃত্যুদণ্ড দেয়। এজন্য কোথাও যদি একটা ফলও পড়ে থাকে তা কেউ ছোঁবেও না। যতক্ষণ না মালিক কুড়িয়ে নেয় ওই ভাবেই তা মাটিতে পড়ে থাকে।

মালাবার অঞ্চলে বারজন কাফের শাসক আছেন। কতক এতো ক্ষমতাশালী যে ৫০,০০০ লোকের সেনাবাহিনী রয়েছে। কতক আবার এতো দুর্বল যে মাত্র ৩০০০ সৈন্য পোষে। এদের মধ্যে কোন রকম বিবাদ নেই। ক্ষমতাশালী রাজা দুর্বল রাজ্যকে গ্রাস করার চেষ্টা করে না। দু'রাজ্যের সীমানার মধ্যে কাঠের ফটক রয়েছে ও কোন্‌টি কোন্ রাজার রাজ্য তা লেখা রয়েছে। এখানকার শাসকরা তাদের রাজ্যের উত্তরাধিকারীত্ব বোনের ছেলেদের দেয়, নিজের ছেলেরা সে রাজ্য পায় না।

মালাবারের প্রথম যে শহরটিতে আমরা গেলাম সেটি হলো বরসিলোর। বড়ো উপসাগরের উপকূলে নারকেল গাছে ভরা ছোট শহর এটি। এ শহর ছেড়ে দু'দিন পথ চলার পর এলাম ফাকনর। উপসাগরের কূলে এটি একটি বড়ো শহর। কাছেই অনেক আখের ক্ষেত চোখে পড়লো। এতো ভালো আখ আর কোথাও বড় একটা চোখে পড়েনি।

ফাকনরের কাফের রাজার নাম বাসদেও। তার প্রায় তিরিশটি যুদ্ধ জাহাজ আছে। অধিনায়ক লুলা নামে একজন মুসলমান। যে জাহাজই এই বন্দর পথ দিয়ে যায় তাকে এখানে কর দিতে হয়। এমনকি এ বন্দরে না থামলেও ওই

কর তাকে দিতে হবে। কোন জাহাজ কর না দিয়ে সোজা চলে গেলে স্থানীয় জাহাজ পাঠিয়ে তাকে ধরে আনা হয় ও শাস্তি রূপে দু'গুণ কর আদায় করা হয়।

ফাকনর ছেড়ে তিনদিন পরে আমরা হাজির হলাম মঙ্গাকুর। শহরটি বেশ বড়ো, এটিও উপসাগরের কূলে। এই উপসাগরের নাম অদ-দুম্ব। মালাবার অঞ্চলে এটিই সব থেকে বড়ো উপসাগর। ফার ও ইয়েমেনের অধিকাংশ জাহাজই এই বন্দরে ভেড়ে। গোলমরিচ ও আদা এখানে প্রচুর।

মঙ্গরুরের রাজা এখানকার শক্তিশালী রাজাদের একজন। তার নাম রামদেও। এই শহরে প্রায় চার হাজার মুসলমানের বাস। তারা শহর মধ্যে একটি পৃথক অঞ্চলে বাস করে। এদের সঙ্গে শহরের বাসিন্দাদের প্রায়ই ঝগড়া মারপিট বেধে যায়, তবে রাজা এদের মাঝে পড়ে সব মিটিয়ে দেন। না হলে বণিকদের আনাগোনা বন্ধ হয়ে যাবার ভয় রয়েছে যে!

এখান থেকে হিলির দিকে যাত্রা ক'রে দু'দিন পরে সেখানে পৌঁছলাম। উপসাগর কূলে এটি একটি চোখে পড়ার মতো শহর। শহরটি ভালোভাবে তৈরী হয়েছে। বড়ো বড়ো জাহাজ এ বন্দরে ভেড়ে। চীনারাও এখানে জাহাজ নিয়ে আসে। এখানকার জামা মসজিদটির জন্য কাফের ও মুসলমান উভয়েই শহরটিকে বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখে।

তারপর হিলি ছেড়ে জুরফত্তন শহরে এসে থামলাম। এটি হিলি থেকে মাত্র তিন পরসাঙ্গ দূরে। এখানকার রাজার নাম কুবায়ল। তিনি মালাবারের শক্তিশালী রাজাদের একজন। তার অনেক জাহাজ আছে। এগুলি ওমন, ফার ও ইয়েমেন যায়। দহফত্তন ও বুদফত্তন তার রাজ্যের মধ্যে।

জুরফত্তন থেকে আমরা দহফত্তন গেলাম। উপসাগরকূলে অসংখ্য বাগান ভরা বড়ো শহর এটি। এই অঞ্চলে নারকেল, গোলমরিচ, সুপারী এসব ভালো ফলে। অকুম কোলোকাসিয়া-র ফলনও প্রচুর। এদিয়ে এখানকার লোকেরা মাংস রাঁধে। এখানে যতো কলা হয় এতো আর কোথাও আমি দেখিনি; দামও সব থেকে সস্তা।

এই দহফত্তনে আমি সব থেকে বড়ো বাইন দেখেছি। এটি ৫০০ পা লম্বা ও ৩০০ পা চওড়া। লাল রঙের কাটা পাথর দিয়ে এটি তৈরী। পাশে সারি সারি পাথরের সৌধ। রয়েছে প্রত্যেকটিতে চারটি ক'রে বসার আসন। প্রত্যেকটি সৌধের ছাদেই পাথরের সিঁড়ি দিয়ে চড়া যায়। দীঘিটির (বাইন)

মাঝখানে একটি বড়ো তেতলা সৌধ। প্রতি তলায় চারিটি ক'রে আসন। কুবায়ল-এর বাবা এটি তৈরী করেছেন বলে আমি শুনলাম। এর সামনেই জামা মসজিদ। তা থেকে সিঁড়ি বেয়ে এই পুকুরে আসা যায়। আইন বিশেষজ্ঞ হুসেন আমায় জানালেন, পুকুর ও মসজিদ দু'টিই নাকি এই রাজার এক পূর্ব পুরুষের তৈরী। তিনি ছিলেন মুসলমান।

শহরের বাইরে সাগরের কাছে একটি মসজিদ রয়েছে। এটি বিদেশী মুসলমান-দের গড়া। কেননা এ শহরে কোন মুসলমান নেই। এর বন্দরটি এই ধরনের বন্দরের মধ্যে সব থেকে সুন্দর। এর জল বেশ সুস্বাদু। এ অঞ্চলে সুপারী ফলে। ভারতের বিভিন্ন স্থানে ও চীনে এগুলি চালান যায়। অধিবাসীরা বেশীর ভাগই ব্রাহ্মণ। কাফেররা এদের শ্রদ্ধা করে। এরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফের-দের মধ্যে বিদ্বেষ ছড়ায় বলে কোন মুসলমান এখানে নেই।

রওনা দিলাম বুদফত্তন ছেড়ে পনদেরনি-র দিকে। একটি বড়ো ও সুন্দর শহর। অনেক দোকান বাজার বাগ-বাগান। তিনটি মুসলমান অঞ্চল রয়েছে, প্রত্যেকটিতেই একটি ক'রে মসজিদ আছে। জামা মসজিদটি সমুদ্রকূলে। এই বন্দরেও চীনা জাহাজগুলি ভেড়ে।

এখান থেকে জাহাজ এবার চললো কালিকটে। মালাবারের একটি প্রধান বন্দর কালিকট। চীন, সুমাত্রা, সিংহল, মালদ্বীপপুঞ্জ, ইয়েমেন ও ফার থেকে এখানে জাহাজ ও সওদাগরেরা আসে। পৃথিবীর সব দেশের বণিকেরা এখানে জমায়েত হয়। পৃথিবীর বড়ো বন্দরগুলির মধ্যে কালিকট একটি।

কালিকটের কাফের রাজার নাম জামোরিন। তিনি বুড়ো লোক। কতক য়ুরোপীয়ের মতো তিনি দাড়ি কাটেন। আমি কালিকটে তাকে দেখার সুযোগ পাই।

আমরা যখন কালিকট আসি তখন এখানে ১৩ খানি চীনা জাহাজ দাঁড়িয়ে। চীন যাবার জন্য তিন মাস ধরে এখানে অপেক্ষা ক'রে রইলাম, কাফের রাজার অতিথি হয়ে। চীন সমুদ্রে একমাত্র চীনা জাহাজই যায়।

চীন যাত্রার মতো অনুকূল আবহাওয়া দেখা দিলে রাজা জামোরিন এই ১৩টি জাহাজের মধ্যে একটিতে আমাদের জন্য ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। জাহাজের প্রশাসকের নাম সুলেইমান। ইনি সিরিয়ার সফদ-এর বাসিন্দা। আমি তাকে বললাম: 'আমার একটি কুঠুরী দরকার মেয়ে বাঁদীদের জন্য। কেননা, তাদের

ছাড়া কোথাও যাবার অভ্যাস আমার নেই।' তিনি বললেন: 'চীনা ব্যবসায়ীরা সব কুঠুরীগুলিই ভাড়া করেছে। শুধু আমার শালার জন্য একটি কুঠুরী আছে, সেটি আপনাকে দিতে পারি, তবে তাতে কোন স্নানাগার নেই। অবশ্য অন্য কারো সাথে বদল ক'রে নেয়া যেতে পারে।' আমি তাতেই রাজী হয়ে সহচরদের সেইমতো আদেশ দিলাম। তারা জাহাজে আমার জিনিষপত্র তুলল। বাঁদী আর বান্দারাও জাহাজে চেপে বসলো। এ হলো বিষুৎ বারের ঘটনা।

পরদিন হিলাল নামে আমার এক চাকর এসে জানাল, যে কক্ষটি আমায় দেয়া হয়েছে সেটি খুব ছোট ও বাসের অযোগ্য। নৌ-অধিনায়ককে সে কথা জানালাম। তিনি এর চেয়ে আর কোন ভালো ব্যবস্থা করার অক্ষমতা জানিয়ে বললেন: 'যদি আপনি ককমে (ছোট চীনা জাহাজ) যেতে রাজী থাকেন তবে আপনার যোগ্য ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারি।' আমি ককমে যেতে রাজী হলাম। সেই মতো শুক্রবার নমাজের আগে আমার সব জিনিষ ও বান্দাবাঁদীরা ককমে গিয়ে চড়লো। সাধারণত: অসর নমাজের পর সাগর ফুলে ওঠে, জোর তরঙ্গ দেখা দেয়। ওই সময়ে জাহাজে চড়া অসম্ভব। নমাজ শেষে গিয়ে দেখি অন্য জাঙ্কগুলি আগেই বন্দর ছেড়ে চলে গেছে। যেটিতে উপহারসম্ভার তোলা হয়েছে একমাত্র সেই জাঙ্কটি ও আমার যে ককমটিতে যাবার কথা সেটি রয়েছে। আরো একটি জাঙ্ক অবশ্য আছে তবে সেটি যাবে ফন্দরয়ন। সাগরে জোর তরঙ্গ দেখা দেয়ায় আমি কিছুতেই ককমে চড়তে পারলাম না। বাধ্য হয়ে সারারাত সাগর কূলে কাটালাম। একটি গালিচা ছাড়া তখন আমার কাছে আর কিছুই নেই। বাধ্য হয়ে তাই বিছিয়ে শুয়ে থাকলাম। শনিবার সকালের মধ্যে জাঙ্ক ও ককম দুই-ই বন্দর ছেড়ে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। যে জাঙ্কটির ফন্দরয়ন যাবার কথা সেটি ঢেউয়ের দাপটে হয়ে গেছে ভেঙে তছনছ। যাত্রীদের কতক গেছে ডুবে মারা, কতক প্রাণে বেঁচে গেছে কপাল জোরে।

খবর এল, যে জাঙ্কটি আমাদের উপহার সামগ্রী নিয়ে যাচ্ছিল সেটিও পথে তছনছ হয়ে ডুবে গেছে। জাহাজের সব লোক মারা পড়েছে। যেখানে শবদেহ জড়ো করা হয়েছে, গেলাম সেখানে ছুটে। গিয়ে দেখি, পণ্ডিত জহীর-উদ্দীনের মাথার খুলি ভেঙে ঘিলু বেরিয়ে পড়েছে। মালিক সুম্বুলের কপালের একপাশ দিয়ে একটি গজাল ঢুকে অন্য পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে তাদের কবর দিলাম।

এসে, কাফের রাজার সঙ্গে দেখা করলাম। নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত একখানি সাদা কাপড় পরণে। মাথায় একটি ছোট পাগড়ি। পা খালি। একজন চাকর মাথার ওপর ছত্র ধরে রয়েছে। তার সামনে সাগর কূলে আগুন জ্বালানো হয়েছে। জবানীরা বা রক্ষীর দল আশে পাশে জমা হওয়া লোকদের হটিয়ে দিচ্ছে যাতে কূলে ভেসে আসা জিনিসপত্র লুঠ না হয়। মালাবারের নিয়ম, যদি কোন জাহাজ ডুবে কি ভেঙ্গেচুরে যায় তবে তার সব জিনিসপত্র সরকারের। কিন্তু এ রাজ্যের নিয়ম আলাদা। এখানে সব জিনিষ প্রকৃত মালিকদের ফিরিয়ে দেয়া হয়। এ জন্যই এখানে বিদেশীদের এত আনাগোনা, জাহাজের এত ভিড়, বন্দরের এত সমৃদ্ধি।

উপহারসম্ভার নিয়ে চলা জাঙ্কটির দুর্দশা দেখে ককমের নাবিকেরা আমার জন্য কোথাও কোনরকম অপেক্ষা না ক'রে সোজা পাল তুলে বেরিয়ে গেছে। আমার যা কিছু, সবই সেই ককমে। সঙ্গে বলতে, শুধু একজন বান্দা, একখানা গালিচা আর দশটি দীনার। বান্দাটিও আমার দুর্দশা দেখে এই সুযোগে কোথায় ভেগে পড়লো। লোকে আমায় বললো ককমটি নিশ্চয় কুইলন ভিড়বে। সেখানে চলে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করলাম। কুইলন এখান থেকে দশ-দিনের পথ। জলপথেই যাও আর স্থলপথেই যাও। আমি নদীপথে রওনা হলাম। গলিচাটি বয়ে নিয়ে চলার জন্য একজন মুসলমান বাহককে সাথে নিলাম।

পঞ্চম দিন কুনজ.করি এলাম। এ স্থানটি পাহাড়ের ওপর। ইহুদীরা বাস করে। কুইলনের রাজাকে এজন্য তারা জিজিয়া (কর) দেয়।

এই নদী অঞ্চলে যে সব গাছ চোখে পড়লো তা সবই সাপান গাছ। এখানে এই কাঠই জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা হয়। আমরাও আমাদের রান্নাবান্না এই কাঠেই করতাম।

দশম দিনে কুইলন শহরের মুখ দেখলাম। এটি মালাবারের সব থেকে সুন্দর জায়গাগুলির একটি। ভাল ভাল সব দোকানপাট আর বাজার রয়েছে। এখানকার বণিকদের 'সুলি' বলা হয়। এরা বেশ জবরদস্ত ধনী। এক এক জাহাজ মাল একসঙ্গে কিনে নেয়।

মালাবার অঞ্চলের কুইলনই চীনের সব থেকে কাছে বলে চীনারা এখানেই বেশি আসে। এখানকার রাজা একজন কাফের। নাম তিওয়ারী (তিরাবরী)।

তিনি মুসলমানদের খুব সম্মান দেখান। চোর ও দুষ্কৃতিকারীদের কঠোর সাজা দেন।

কুইলন এসে শেখ ফখর-উদ-দীনের অতিথিশালায় কয়েকদিন কাটালাম। ককমের কোন খবরই পাওয়া গেল না। চীনা প্রতিনিধি দলের সঙ্গে এখানে দেখা হলো। তারাও কালিকট থেকে একটি জাঙ্ক-এ ক'রে রওনা হয়েছিল। সেটি এখানে ভিড়েছে।

আমি ভাবলাম ভারত সুলতানের কাছেই ফিরে যাই, সব ঘটনা তাকে খুলে জানাই। উপহার-সম্ভারের কী পরিণতি হলো তা গিয়ে বলি। কিন্তু মনে ভয় দেখা দিল। কেন আমি সে সবের সঙ্গে যাইনি এ প্রশ্ন যদি তিনি করেন? শেষমেশ হিনাবরের সুলতান জামাল-উদ-দীনের কাছে যাওয়াই বিজ্ঞতার কাজ বলে মনে করলাম। ককমের কোন খোঁজখবর না মেলা পর্যন্ত সেখানেই দিনগুলো কাটিয়ে দেব বলে সিদ্ধান্ত নিলাম।

কুইলন থেকে কালিকটের দিকে রওনা হলাম তাই। সেখানে গিয়ে দেখি ভারত সুলতানের কয়েকখানি জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে। এক আরবী আমীর সৈয়দ আবুল হাসানকে তিনি এগুলির সঙ্গে পাঠিয়েছেন। হরমোজ ও কতীখা থেকে আরবদের সংগ্রহ ক'রে এদেশে নিয়ে আসাই এর লক্ষ্য। আরবদের প্রতি সুলতানের বিশেষ টান রয়েছে। আমীরের সাথে দেখা করলাম। শুনলাম, তিনি শীতকাল ভারতে কাটিয়ে তারপর আরব যাবেন। তাকে সব ঘটনা খুলে বললাম। এ অবস্থায় সুলতানের কাছে ফিরে যাওয়া উচিত হবে কি না, সে বিষয়ে উপদেশ চাইলাম। তিনিও বারণ করলেন। শেষে সেখান থেকে তার সঙ্গে জাহাজে ক'রে সাগরে ভেসে পড়লাম।

হিনাবরে জাহাজ ভিড়তেই সুলতান জমাল-উদ-দীনের কাছে চলে এলাম। তার কাছেই থেকে গেলাম। পুরো তিনটি মাস তার মসজিদে বলতে গেলে শুধু কোরান পড়েই কাটালাম। -

এমন সময়ে সন্দাপুরের রাজার সঙ্গে তার ছেলের ঝগড়া বেধে গেল। ছেলে সন্দাপুর জয় করার জন্য জমাল-উদ-দীনকে আমন্ত্রণ জানাল। সেই চিঠিতে সে আরও জানাল যে, (জমাল-উদ-দীন এভাবে তাকে রাজ্যলাভে সাহায্য করলে) সে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করতে ও জমাল-উদ-দীনের বোনকে বিয়ে করতে রাজী। বাহান্নটি জাহাজের এক নৌবহর নিয়ে সুলতান জমাল-উদ-দীন যুদ্ধযাত্রার আয়োজন করলেন।

আমিও তার সঙ্গে যুদ্ধে বেরিয়ে পড়লাম। জমাল-উদ-দীন আর আমি একই জাহাজে। এ এক শনিবারের ঘটনা। সোমবার বিকাল নাগাদ আমরা সন্দাপুরের সাগরকূলে এসে গেলাম। খাড়ির মধ্যে ঢুকলাম। দেখি, সেখানকার লোকজনেরা যুদ্ধের জন্য তৈরী হয়ে আছে। এর মধ্যেই কূল জুড়ে পাথর ছোঁড়া যন্ত্র বসিয়েছে। রাতটা আমরা শহরের কাছে খাড়ির মধ্যেই কাটিয়ে দিলাম। ভোরের আলো ফুটে উঠতেই বেজে উঠলো যুদ্ধের ভেরী। জাহাজ এগিয়ে চললো। পাড় থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে পাথর বৃষ্টি স্থুরু করলো রাজার সৈন্যরা। স্থলতানের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা কিছু লোক জখম হলো। বেগতিক দেখে স্থলতান একটি ছোট জাহাজে বা উড়কারীতে গিয়ে চাপলেন। জাহাজের লোকেরা ঢাল তলোয়ার হাতে নিয়ে (তীরে যাবার উদ্দেশ্যে) জলে ঝাঁপ দিল। তাদের দেখাদেখি আমিও তাই করলাম। আমাদের সঙ্গে দু'জাহাজ ঘোড়া। এ জাহাজগুলি এমন ভাবে তৈরী যাতে যুদ্ধসাজ পরে জাহাজের মধ্য থেকেই সৈন্যরা ঘোড়া ছুটিয়ে পাড়ে নামতে পারে। তারা তাই করলো।

লড়াই ক'রে আমরা সন্দাপুর জয় ক'রে নিলাম। বেশির ভাগ কাফেরই পালিয়ে গিয়ে রাজার দুর্গে আশ্রয় নিল। আমরা তলোয়ার নিয়ে ছুটে গেলাম। দুর্গে আগুন লাগালাম। নিরুপায় হয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো তা'রা। আমাদের হাতে বন্দী হলো। স্থলতান তাদের ক্ষমা করলেন। স্ত্রী-পুত্রদের তাদের কাছে ফিরিয়ে দেয়া হলো। সংখ্যায় তারা প্রায় দশ হাজারের মতো। তাদের বসবাসের জন্য সন্দাপুরের এক শহরতলী নির্দিষ্ট ক'রে দিলেন স্থলতান। নিজে তিনি রাজপ্রাসাদে গিয়ে উঠলেন। কাছেপিঠের বাড়িগুলি সভাসদদের দিয়ে দিলেন। আমায় তিনি লেমকী নামে একটি সোমত্ত মেয়ে-বন্দী ভেট দিলেন। মেয়েটির নতুন নাম দিলাম আমি 'মুবারক'। তার স্বামী মুক্তিপণ দিয়ে তাকে ছাড়িয়ে নিতে চাইল। আমি রাজী হলাম না।

সন্দাপুর জয়ের তারিখ ১৩৪২-এর অক্টোবর তিন থেকে ১৩৪৪-এর জানুয়ারী এক তারিখ পর্যন্ত স্থলতানের সঙ্গে সেখানে থেকে গেলাম। এরপর বিদায় চাইলাম। যাবার বেলা তিনি আমাকে দিয়ে শপথ করিয়ে নিলেন যে আবার আমি তার কাছে ফিরে আসব।

সাগর-পথে সোজা আমি হিনাবর ফিরে গেলাম। তারপর সেখান থেকে একে একে ফাকনর, মনজারুর (ম্যাঙ্গালোর), হিলি, জুরফত্তন, দহফত্তন, বুদফত্তন,

পনদেরনি ও কালিকট ঘুরে বেড়ালাম। এরপর গেলাম শালিয়াত শহরে। সব থেকে চমৎকার শহরগুলির মধ্যে এটি একটি। 'শালিয়াত' নামের কাপড় এখানে তৈরী হয়। বেশ কিছু কাল এখানে কাটালাম। তারপর চলে গেলাম কালিকটে। আমার সব জিনিষপত্র ও বাঁদীদের সঙ্গে যে বান্দারা ককমে গিয়েছিল তাদের মধ্যে ছ'জনার সঙ্গে সেখানে দেখা হয়ে গেল। তাদের কাছে শুনলাম, আমার পেয়ারের বাঁদীটি, যে কিনা যাত্রাকালে গর্ভবতী ছিল, সে মারা গেছে। সুমাত্রার রাজা বাকী সব বাঁদীদের নিয়ে নিয়েছেন। জিনিষপত্রও সব নিয়ে নেয়া হয়েছে। আমার সহচরেরা সবাই বাঙলা, জাভা ও চীনে এদিক ওদিক ছিটিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে।

একথা শুনে আমি আবার হিনাবর হয়ে সন্দাপুর ফিরে গেলাম। সেখানে কিছুদিন কাটালাম। সেখানকার পলাতক কাফের রাজা এ সময় তাকে আবার দখল ক'রে নেবার জন্য এলো। রাজ্যের সব কাফেররা তার পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। সুলতানের সৈন্যেরা তখন গ্রামের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। কাফেররা যখন আমাদের অবরোধ করলো ও নাকাল করতে থাকলো তখন সৈন্যেরা আমাদের সঙ্গে সব রকম যোগাযোগ হারিয়ে ফেলেছে। বেগতিক দেখে শহর অবরুদ্ধ থাকাকালেই আমি কালিকট পালিয়ে এলাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মনে মনে ঠিক ক'রে ফেললাম মালদ্বীপপুঞ্জে (ধীবত-উল-মহল) যাব। ওখানকার কথা অনেক শুনেছি। একবার নিজের চোখে দেখে আসা যাক। সেই মতো কালিকট থেকে জাহাজে চেপে বসলাম। দশদিন পর সেখানে পৌঁছলাম। ধীবত—ধীব (নেকড়ে)-এর স্ত্রীলিঙ্গ। এই দ্বীপগুলি পৃথিবীর আশ্চর্য জিনিষগুলির মধ্যে একটি। এখানে প্রায় দু'হাজারের মতো দ্বীপ আছে। একশোর কাছাকাছি দ্বীপ এক এক পুঞ্জ হয়ে গোলাকার আঙটির চেহারা নিয়েছে। ফটকের মতো এক একটি প্রবেশ পথ রয়েছে একমাত্র যা দিয়েই জাহাজগুলি যাওয়া-আসা করতে পারে। স্থানীয় দিগদর্শক ছাড়া একটি দ্বীপ থেকে আরেকটিতে যাওয়া জাহাজগুলির পক্ষে অসম্ভব। দ্বীপগুলি এতো ঘেঁষাঘেঁষি যে একটি দ্বীপের তাল গাছের মাথা অন্য দ্বীপ থেকে দেখা যায়—বিশেষ ক'রে যাওয়া আসার পথে জাহাজ থেকে।

এই দ্বীপগুলির বাসিন্দারা সবাই মুসলমান। সকলেই খুব ধার্মিক ও ন্যায়নিষ্ঠ। সমগ্র দ্বীপপুঞ্জকে বারোটি ইকলিম বা মণ্ডলে ভাগ করা হয়েছে। প্রত্যেকটি মণ্ডল এক একজন শাসনকর্তার অধীন। এই শাসনকর্তাকে করদুই বলা হয়। এই মণ্ডলগুলি যথাক্রমে—(১) পালীপুর (বালেবুর) (২) কন্নালুস (৩) মহল (এই মণ্ডলের সবগুলি দ্বীপকেই মহল বলা হয় এবং মহলই সমগ্র দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী) (৪) তলাদীপ (৫) করায়েদু (৬) তইম (৭) তলদুম্মতী (৮) হলদুম্মতী (৯) বরইদু (১০) কনদকল (১১) মুলুক (১২) সুবইদ (এটি একেবারে শেষ প্রান্তে অবস্থিত)।

এই দ্বীপগুলিতে কোন খাদ্য-শস্য ফলে না। একমাত্র সুবইদ (সু-আবাদ ?) মণ্ডলেই অনলি বা জোয়ারের মতো একপ্রকার শস্যের ফলন হয়। সেখান থেকে মহলে তা চালান আসে। অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য হলো এক ধরনের মাছ। এই মাছ লাইরুনের মতো, এখানকার লোকেরা বলে: কালবালম (কালো মাছ, ভারতে বলা হয় কুম্বল)। এর মাংস লালচে, গায়ে তেল বা চর্বি নেই, গন্ধ ভেড়ার মাংসের মতো। এ মাছ ধরার পর একে চার টুকরো ক'রে কেটে, একটু নুন দিয়ে সেদ্ধ করা হয়। তারপর তালপাতার ঝুড়িতে ক'রে উনুনের ওপরে

ঝুলিয়ে রাখা হয়। ভালোমতো শুকোলে পর খাওয়া হয়। এগুলি মালদ্বীপ থেকে ভারত, চীন ও ইয়েমেন চালান যায়।

গাছের মধ্যে বেশির ভাগই নারকেল। এটি এখানকার আরেকটি প্রধান খাদ্য। নারকেল গাছ সত্যই এক আশ্চর্য সৃষ্টি। এক একটি গাছে বছরে ১২ কাঁদি নারকেল ফলে, মাসে গড়ে এক এক কাঁদি। এ থেকে দুধ বানানো হয়। তেল আর মধুও পাওয়া যায়। মধু দিয়ে তারা একরকম মিঠাই বানায় (হলবা)। সেগুলি নারকেল দিয়ে খাওয়া হয়। এগুলি ও ওই মাছ খাবার ফলে এখানকার লোকের বিস্ময়কর কাম-ক্ষমতা জন্মায় ও এখানকার বাসিন্দারা সেদিকে বিশেষ পারদর্শী। আমার নিজের তো দাসীবাঁদী ছাড়া আরো চারজন বউ ছিল। প্রত্যেক দিন আমি সকলের কাছে যেতাম ও যেদিন যার পালা তার সঙ্গে রাত কাটাতাম। এভাবে সেখানে দেড় বছর কাটাই।

দ্বীপে অন্যান্য গাছের মধ্যে জাম, কমলা, লেবু ও আর এক ধরনের গাছ যার মূল দিয়ে তারা একরকম ময়দা বানায়। ওই ময়দা দিয়ে সেমুই তৈরী ক'রে তা নারকেলের দুধে রান্না করে। এটি সেরা খাবারগুলির মধ্যে একটি। আমি খুবই পছন্দ করতাম।

এখানকার লোকদের শরীর দুর্বল। তারা মোটেই যুদ্ধে অভ্যস্ত নয়। যুদ্ধের সময় ভগবানের কাছে প্রার্থনাই তাদের একমাত্র অস্ত্র। একবার আমি এক চোরের হাত কেটে ফেলার হুকুম দেই। রায় শুনেই আদালতে উপস্থিত এখানকার কয়েকজন বাসিন্দা অজ্ঞান হয়ে পড়লো। ভারতীয় দস্যুরা এদের আক্রমণ করে না বা ভয়ও দেখায় না। অতীত অভিজ্ঞতা থেকে তারা জেনে গেছে যে, ওদের কাছ থেকে কোন কিছু ছিনিয়ে নেয়া মানেই সাত তাড়াতাড়ি দুর্ভাগ্যকে ডেকে আনা। তাদের অঞ্চল মধ্যে শত্রু জাহাজ এলে জাহাজের লোকদের বন্দী করে, কিন্তু কোন ক্ষতি করে না। কাফেররা এদের কাছ থেকে কোন কিছু, এমনকি একটা লেবু কেড়ে নিলেও কাফেরদের প্রধান সেজন্য কাফেরদের শাস্তি দেয়। তা না হলে এখানকার লোকেরা, তাদের দুর্বল স্বাস্থ্যের জন্য সহজেই অন্যের শিকার হতো।

প্রত্যেক দ্বীপে সুন্দর সুন্দর মসজিদ রয়েছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সেগুলি কাঠ দিয়ে তৈরী। এখানে প্রচণ্ড গরম ও ঘাম হবার দরুন লোকেরা দিনে দু'বার ক'রে স্নান করে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে ও খুব সুগন্ধি তেল ব্যবহার

করে, বিশেষ ক'রে চন্দন তেল ও ওই জাতীয় পদার্থ। মকদশ থেকে আনা কস্তুরী সুগন্ধ মাখে। এখানকার রমণীদের মধ্যে প্রতিদিন সকালে প্রার্থনার পর স্বামী বা পুত্রের কাছে কাজললতা, গোলাপজল ও ঘালিয়া তেল নিয়ে যাবার প্রথা রয়েছে। সে তার ছু' চোখে কাজল, গায়ে গোলাপজল ও সুগন্ধি তেল মাখিয়ে দেয়। এর ফলে চামড়া তেলতেলে হয়, মুখ থেকে রুক্ষতা দূর হয়।

তারা পাতলুনের বদলে এক ধরনের কাপড় কোমরে জড়ায়। এটি তারা কোমরে বেড় দিয়ে বাঁধে। আরেকটি কাপড়ের তৈরী জিনিষ দিয়ে কাঁধ ঢাকে। একে তারা উইল্যান বলে। এগুলিকে অনেকটা ইহরামের মতো দেখতে (হজ যাত্রার সময় ব্যবহৃত কাপড়)। কেউ কেউ পাগড়ি পরে, কতক ছোট রুমাল বাঁধে। কাজী বা খতীবের সঙ্গে দেখা হলে তারা কাঁধের পোষাকটি সরিয়ে নেয় ও সে ঘরে না পৌঁছান পর্যন্ত তার সঙ্গে সঙ্গে যায়।

তাদের মধ্যে বিয়ের সময় বর যখন বউয়ের বাড়ি যায় তখন বউ তার বাড়ির দরজা থেকে বিয়ের আসর পর্যন্ত কাপড় বিছিয়ে দেয়। কাপড়ের ছু'পাশে সারা পথ মুঠো মুঠো কড়ি ছড়িয়ে দেয়া হয়। বর যখন বউয়ের কাছে আসে, বউ তখন বরের পায়ের কাছে পরবার মতো কাপড় বা কাপড়ের তৈরী পোষাক প্রণামী দেয় ও বরের চাকরেরা তা তুলে নেয়। যদি বিপরীত ভাবে স্বামীর ঘর করতে যায়, স্ত্রীকে ওইভাবে সংবর্ধনা করা হয়। তবে স্ত্রী সেখানে পৌঁছে স্বামীর পায়ের কাছে ওইরকম প্রণামী দেয়। এখানে সুলতানকেও ওইভাবেই সংবর্ধনা জানানোর নিয়ম। তাকেও এই একই প্রথায় প্রণামী নিবেদন করার চল রয়েছে।

তাদের ঘরবাড়ি কাঠে তৈরী। ভিত পাথরের। ছু-তিন হাত লম্বা পাথর সমান ক'রে কেটে একের ওপর এক সাজিয়ে গড়া। তার ওপরে নারকেল কাঠ পেতে মেঝে গড়া হয়। মেঝে এভাবে মাটি থেকে উঁচুতে থাকে বলে স্যাঁতসেঁতে হয় না। মাটি খুব ভিজা বলেই এ ব্যবস্থা। এরপর কাঠ দিয়ে দেয়াল গড়ে। সুন্দর ক'রে এরকম বাড়ি বানানোর কাজে এরা অসম্ভব পটু। বাড়ির দরদালানে একটি বৈঠকখানা বানায়—একে তারা মালম বলে। এতে ছু'টি দরজা থাকে। একটি সদর দরজা—বাইরের লোক ভেতরে আসার জন্য। অন্যটি ভেতর দিকে—ভেতরের লোক বা গৃহস্বামীর বাইরে আসার জন্য। এই ঘরের পাশেই একটি

বড়ো পাত্রে জল বোঝাই থাকে। তার ওপর নারকেলের মালা দিয়ে তৈরী একটি দু'হাত লম্বা হাতা। এর নাম ওয়ালঞ্জ। এই হাতা দিয়ে দরকার হলে কুয়ো থেকেও জল তোলা যেতে পারে। কুয়ো একেবারে কাছেই থাকে।

লোকজন খালি পায়ে চলাফেরা করে। রাস্তাঘাট ঝাড়ু দিয়ে সাফ করা হয়। দু'পাশে গাছ থাকার জন্য ছায়া ভরা। মনে হবে যেন বাগানের মধ্য দিয়ে চলেছি। বাইরে থেকে ঘরে ঢোকার আগে সবাইকে পা ধুয়ে, পাপোষে পা মুছে ঘরে ঢুকতে হয়। মসজিদে ঢোকার নিয়মও তাই।

কোন জাহাজ দ্বীপে ভিড়লে ছোট ছোট নৌকা নিয়ে দ্বীপের লোকরা সেখানে হাজির হয়। এই নৌকাকে তারা কুন্দুরা (গুন্দীরা) বলে। পান আর করম্ব (ডাব) সঙ্গে নিয়ে নিজের নিজের পছন্দ মতো কোন জাহাজের যাত্রীকে সেগুলি যাচে। সেই যাত্রী তখন তার অতিথি। আত্মীয়ের মতো আদর দেখিয়ে সে তাকে তার বাড়িতে আনে। এই অতিথিরা কেউ যদি বিয়ে করতে চায় তা করতে পারে। যাবার সময় এলে তালাক দিয়ে চলে যেতে পারে। কেননা, এখানকার মেয়েরা দেশত্যাগ করে না। কেউ যদি বিয়ে না করে তবে যে বাড়িতে আতিথ্য নিয়েছে সে বাড়ির গিন্নীই রান্নাবান্না ক'রে দেয়। সে-ই তাকে সেবাযত্ন করে, যাবার সময় প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র যুগিয়ে দেয়। এর প্রতিদানে সামান্য কিছু উপহার নেয়।

কর কে এখানকার লোক বন্দর বলে। প্রত্যেক রকম পণ্যের এক বাঁধাধরা ভাগ সরকারী দামে কিনে নেয়ার মাধ্যমে এই কর আদায় করা হয়। এই 'বন্দর' আদায় করার জন্য প্রত্যেক দ্বীপে একটি ক'রে কাঠের বাড়ি আছে। এর নাম বজনসার। শাসনকর্তা এখানে জিনিষপত্র জমা করেন, কেনাবেচা করেন।

এখানকার লোকেরা আমদানি করা মাটির বাসন-কোসন মুরগীর সঙ্গে বিনিময় করে। পাঁচ বা ছয়টি মুরগীর বদলে একটি পাত্র বেচা হয়। সব জাহাজ এখান থেকে মাছ, নারকেল, সূতী কাপড়ের তৈরী কোমর-আবরক, উইল্যান, পাগড়ী প্রভৃতি নিয়ে ফিরে যায়। তামার বাসন কোসন এখানে অঢেল পাওয়া যায়। এগুলোও তারা কিনে নেয়। এছাড়া আছে কড়ি ও কনবর। কনবর হলো নারকেলের ছোবড়ার আঁশ। দ্বীপের

মেয়েরা সাগর তীরে গর্তমধ্যে সেগুলিকে পচিয়ে মুগুর দিয়ে পিটিয়ে আঁশগুলি বার করে ও তার সুতো পাকায়। এগুলি দিয়ে দড়ি বানানো হয়। এই দড়ি জাহাজে বাঁধাবাঁধির কাজে লাগে। চীন, ভারত, ও ইয়েমেনে এগুলি রপ্তানি হয়।

দ্বীপের লোকেরা নিজেদের মধ্যে যা-কিছু কেনাবেচার কাজ কড়ি দিয়ে করে। এই সব কড়ি সাগর থেকে সংগ্রহ করা হয়। ১০০ কড়িকে সিয়াহ, ৭০০ কে ফাল, ১২০০ কে কুট্ট আর এক লক্ষকে বুস্তু বলা হয়। এগুলি সাধারণতঃ এক স্বর্ণ দীনারে চার বুস্তু (চার লাখ) এই হারে কেনাবেচা চলে। কখনো কখনো দাম পড়ে যায়। তখন এক দীনারের বদলে ১০ বুস্তু পর্যন্ত মেলে। এগুলি বাঙলার লোকদের কাছে চালের বদলে বেচা হয়। কেননা, বাঙলা দেশে কড়ির চলন রয়েছে। ইয়েমেনের লোকেরাও নেয়। তারা একে জাহাজের খোলে ভারী মাল হিসাবে বালির বদলে ব্যবহার করে। সুদানেও কড়ির চল রয়েছে। মালী ও জুজুতে এক স্বর্ণ দীনারে ১১৫০ কড়ি বিক্রী হতে দেখেছি।

এখানকার মেয়েরা ঘোমটা দেয় না। এমন কি রাণীও না। মেয়েরা মাথায় চুল আঁচড়ায় ও চুলগুলি একদিকে জড়ো ক'রে রাখে। বেশির ভাগ মেয়েই শুধু তাদের নিম্নাঙ্গে কোমর আবরক পরে, উর্ধ্বাঙ্গ খোলা রাখে। এভাবেই তারা বাজারে বা বাইরে যাতায়াত করে। আমি কাজী হবার পর মেয়েদের এই অভ্যাস ছাড়াবার চেষ্টা করি। পোষাক পরার আদেশ জারি করি। কিন্তু, সে অভ্যাস করাতে পারিনি। দেহ পুরো ঢাকা না থাকলে কোন মেয়েকে মামলা দায়ের করার জন্য আমার এজলাসে ঢুকতে দিতাম না। তাদের কেউ কেউ কোমর আবরক ছাড়া ঢোলা ছোট হাতা কামিজও পরতো। আমার বাঁদীরা দিল্লীর মেয়েদের মতো পোষাক পরতো ও মাথা ঢাকতো। কিন্তু এতে অভ্যস্ত না থাকায় এর ফলে তাদের সৌন্দর্য না খুলে বরং তার হানি ঘটতো। মেয়েদের গয়না বলতে চুড়ি। দু'হাতের কব্জি পর্যন্ত থরে থরে এগুলি পরা। চুড়িগুলি সাধারণতঃ রূপার তৈরী। সুলতানের স্ত্রী ও আত্মীয়রা ছাড়া আর কেউ সোনার চুড়ি ব্যবহার করে না। পায়ে মল পরে। একে বলা হয় বাইল। সোনার হার পরে। একে বলে বসদরদ।

সব থেকে আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, এখানকার মেয়েরা মালিকের কাছ থেকে

নিজেকে স্বাধীন রাখার জন্য বাঁধাধরা মাইনেতে কাজ খোঁজে। এতে তারা কিছু মনে করে না। পাঁচ দীনার বা তার চেয়েও কম মাইনে পায়। বেশির ভাগ মেয়েই এরকম কাজ করে। এজন্য ধনী লোকের বাড়িতে সব সময়েই দশ থেকে কুড়ি জন এরকম মেয়ে দেখা যাবে। তারা কোন জিনিষপত্র ভাঙলে বা নষ্ট করলে তার দাম কেটে নেয়া হয়। কাজ ছেড়ে চলে গেলে নতুন মালিকের কাছ থেকে ধার এনে পুরানো মালিকের পাওনা শোধ করে। এই সব মেয়েদের প্রধান কাজ হলো ছোবড়ার দড়ি পাকানো।

মেয়েরা এখানে যে রকম আনন্দ-সঙ্গ দান করে ও বিয়েতে যে রকম কম স্ত্রীধন নেয় তাতে এখানে বিয়ে করা খুব সুবিধে। বেশির ভাগ লোক কড়াকড়ি ভাবে কোন স্ত্রীধন দাবী করে না। শুধু সাক্ষ্য নথিভুক্ত করা হয়, আর মেয়ের সামাজিক মর্যাদা অনুসারে মানানসই স্ত্রীধন দিলেই হলো। জাহাজ ভিড়লে নাবিকেরা এখানে বিয়ে করে। চলে যাবার সময় তালাক দেয়। এ এক ধরনের সাময়িক বিয়ে (মুতা)।

এখানকার মেয়েরা কখনো দেশ ছেড়ে যায় না। আর কোন দেশে মেয়েদের সঙ্গ এর চেয়ে সুখকর মনে হয়নি। তারা তার স্বামীর পরিচর্যা ও খাদ্য পরিবেশনের ভার অন্যের হাতে ছেড়ে দেয় না। তারা স্বামীর হাত ধুইয়ে দেবে, স্নানের জন্য জল এনে দেবে, শোবার সময় হাত-পা টিপে দেবে। এ দেশের একটি বিশেষ প্রথা এই যে, মেয়েরা কখনো তার স্বামীর সঙ্গে খাবে না। স্ত্রী কি খেলো না খেলো স্বামীর তা জানার উপায় থাকে না।

এই দ্বীপের অধিবাসীরা আগে কাফের ছিল। পরে তারা মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে। এখানকার যে রাজা প্রথম মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হন তার নাম শানুরাজা। এখানকার বড়ো মসজিদে একটি কাঠে-খোদাই লিপিতে লেখা রয়েছে—"সুলতান আহমদ শানুরাজা পশ্চিমের অধিবাসী আবুল বরকতের কাছে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।"

এখানে আরেকটি আশ্চর্য বিষয় হলো, এই দ্বীপগুলির শাসক একজন মহিলা। নাম তার খদীজা। তার বাবা সুলতান জলাল-উদ-দীন উমর। তিনি আবার বাঙলার সুলতান সলাহ-উদ-দীন সালিহের ছেলে। ঠাকুরদার আমল থেকেই আধিপত্য শুরু হয়। ঠাকুরদার পর বাবা। তারপর খদীজের

ভাই শিহাব-উদ-দীন রাজা হলো। সে তখনো বাচ্চা। উজীর আবদুল্লা তার মাকে বিয়ে ক'রে তাকে নিজের মুঠোর মধ্যে আনেন। আবার খদীজের স্বামী মারা যাবার পর এই আবদুল্লাই খদীজকে বিয়ে করেন। খদীজের প্রথম স্বামী ছিলেন উজীর জমাল-উদ-দীন। শিহাব-উদ-দীন সাবালক হবার পর তার সৎ-বাবা উজীর আবদুল্লাকে সুবইদ দ্বীপে নির্বাসিত ক'রে দ্বীপ জুড়ে নিজের শাসন পাকা করেন। অলী কলকীকে মুক্তি দিয়ে উজীর পদে বসালেন। কিন্তু তিন বছর পরে তাকেও ওই পদ থেকে সরিয়ে সুবইদে নির্বাসনে পাঠান।

সুলতান শিহাব-উদ-দীন প্রায়ই অবৈধভাবে তার নিজের উঁচু পদের কর্মচারী ও সভাসদদের হারেমে যেতেন বলে দুর্নাম শোনা যায়। এজন্য তাকে সিংহাসন থেকে হটিয়ে হলতুম্মতী দ্বীপে নির্বাসিত করা হলো। পরে লোক লাগিয়ে তাকে চিরকালের মতো সরিয়ে দেয়া হয়। রাজপরিবারে উত্তরাধিকারিণী বলতে রইলো তিন বোন। খদীজৎ-উল-কুবরা, মরীয়ম ও ফাতিম। দ্বীপের লোকেরা খদীজকেই বাছলো। খদীজের স্বামী জমাল-উদ-দীন খতীব বা ঘোষক থেকে উজীর হলেন। তিনি রাজ্যের শাসন দায়িত্ব হাতে নিলেন ও ছেলে মুহম্মদকে খতীব পদে বসালেন। যা-কিছু আদেশনামা খদীজের নামেই জারি হতো। আদেশনামাগুলি লেখা হয়ে থাকে ছুরির মতো বাঁধানো একটি লোহার ফলক দিয়ে তালপাতার ওপর। কোরান ও অন্যান্য শাস্ত্রবই ছাড়া অন্য কিছু লিখতে বা অন্য কোন কাজে কাগজ ব্যবহার করা হতো না।

এখানে সুলতানার সাথে দেখা করতে চাইলে, প্রণামী রূপে দু'খণ্ড কাপড় নিয়ে সুলতানাকে অভিবাদন জানিয়ে তার পায়ে একখণ্ড ও তার স্বামী প্রধান উজীরের পায়ে অন্য খণ্ডখানি নিবেদন করতে হয়। এই বিশেষ পুরানো প্রথাটি এ দ্বীপের রাজ দরবার বা দার-এ দীর্ঘকাল ধরে পালন করা হয়ে আসছে।

সুলতানের সেনাবাহিনীতে হাজারের মতো সৈন্য আছে। সকলেই বিদেশী। সামান্য কিছু স্থানীয় লোকও রয়েছে। তারা প্রত্যহ দরবারে এসে অভিবাদন জানিয়ে চলে যায়। তাদের মাইনে প্রতি মাসে বন্দর থেকে অর্থের বদলে চালের আকারে দেয়া হয়ে থাকে। বিচারক এবং পদস্থ কর্মচারীরাও প্রতিদিন সভাকক্ষে সম্মান নিবেদন করতে আসে। তারা লোক মারফৎ সুলতানাকে সম্মান জানিয়ে চলে যায়।

প্রধান উজীর সুলতানার সহকারীর কাজও করেন। উজীরকে এখানে কলকী বলা হয়। কাজীকে বলা হয় ফন্দফরকালু। যা-কিছু দণ্ডবিধান কাজীই করেন। তাই, তিনিই হলেন সকলের কাছে সব থেকে মান্ত ও শ্রদ্ধেয়। সুলতানার আদেশ যে ভাবে মানা হয় ঠিক সেইভাবে, এমনকি আরো গুরুত্ব দিয়ে, ফন্দফর-কালুর আদেশ মানা হয়। তিনি দরবারে একটি কার্পেটের ওপর বসেন। তিনটি দ্বীপের কর তার খরচের জন্য বরাদ্দ করা রয়েছে। প্রথা অনুসারে তা তিনি পুরোপুরি নিজের জন্য ব্যয় করতে পারেন। সুলতান আহমদ শাহুরাজা এই প্রথার চলন ক'রে গেছেন। খতীবকে এরা বলে হনদীজরী। অর্থ মন্ত্রীকে—ফামলদারী। পূর্ত মন্ত্রীকে—মাফাকলু। হাকিম হলেন—ফিতনায়ক আর নৌ-সেনাপতি হলেন—মানায়ক। এদের সবাইকেই সাধারণ ভাবে উজীর বলা হয়। দ্বীপে কোন বন্দীশালা নেই। পণ্য রাখার জন্য যে সব কাঠের বাড়ী বানানো আছে তাতেই সাধারণতঃ বন্দীদের আটক রাখা হয়। আমাদের দেশে (মরক্কোতে) যেভাবে য়ুরোপীয় বন্দীদের কাঠ দিয়ে আটকে রাখা হয়, এখানেও তাদের ওইভাবে রাখে।

কন্নালুস একটি সুন্দর দ্বীপ। অনেকগুলো মসজিদ রয়েছে। আমি এদেশে এসে প্রথমে এখানেই নামি। এখানকার এক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির বাড়ী উঠি। ব্যবহার-বিশারদ আলী সেখানে আমায় সাদরে অভ্যর্থনা করলেন। ধোফারের বাসিন্দা মহম্মদ নামে একজন লোক এখানে আমায় বলেন: 'আপনি মহল গেলে উজীর আপনাকে আটকে দেবেন। কেননা, সেখানে এখন কোন বিচারক নেই।' আমার পরিকল্পনা ছিল এই দ্বীপ থেকে মবর, সরণদীব (সিংহল বা বর্তমান শ্রীলঙ্কা) ও বাঙলা হয়ে শেষ পর্যন্ত চীনে যাবার।

যাই হোক, কন্নালুস থেকে নৌকায় মহল যাত্রা করলাম। চতুর্থ দিনে তইম দ্বীপ, ষষ্ঠ দিনে উসমান দ্বীপ ও অষ্টম দিনে তলমদি দ্বীপ হয়ে দশম দিনে মহল এলাম। মহল সুলতানা ও তার স্বামীর মূল আবাস। বন্দরে পৌঁছে নোঙর ফেললাম। বন্দর থেকে অনুমতি ছাড়া দ্বীপের ভেতরে ঢোকা নিষেধ। আমরা সে অনুমতি পেয়ে গেলাম। ঠিক করলাম মসজিদে যাব। কিন্তু উজীরের চাকররা সাগরকূলে আমায় বাধা দিল। বললো: 'আগে উজীরের সঙ্গে দেখা করুন।' আমার সঙ্গী নৌ-অধিনায়ককে আমি আগেই আমার পরিচয় দিতে বারণ ক'রে দিয়েছিলাম। কিন্তু আমি জানতাম না, এরই মধ্যে একজন নির্বোধ

লোক তাদের কাছে আমাকে দিল্লীর কাজী বলে পরিচয় জানিয়েছেন। আমরা দার-এ (রাজ দরবারে) গিয়ে তৃতীয় ফটকের কাছে দরদালানে বসলাম। ইয়েমেনের কাজী ঈশা এসে আমায় সাদর সম্ভাষণ জানাল। আমি ভেতরে গিয়ে উজীরকে অভিবাদন করলাম। আমার পর অধিনায়ক ইব্রাহীম। তিনি দশটি পোষাক নিয়ে এসেছেন। সুলতানাকে অভিবাদন ক'রে তার পায়ের কাছে একটি ও উজীরকে অভিবাদন ক'রে তার পায়ের কাছে একটি পোষাক ছুঁড়ে দিলেন। পরে অন্যগুলোও ছুঁড়ে দিলেন। তারা তাকে আমার কথা জিজ্ঞাসা করলো। তিনি বললেন: 'আমি তাকে চিনি না'। তারপর তা'রা আমায় সম্মানের নিদর্শনরূপে পান ও গোলাপজল এনে দিল। প্রধান উজীর আমাদের একটি বাড়িতে থাকতে দিলেন। আমাদের জন্য খাবারও পাঠালেন। একটি বড়ো পাত্রে ভাত, তাকে ঘিরে নোনা মাংস, মুরগী, তিতির পাখি ও মাছের বাটি।

পরদিন অধিনায়ক ইব্রাহীম ও ইয়েমেনের কাজী ইশাকে নিয়ে দ্বীপের অন্য প্রান্তে বেড়াতে গেলাম। ধর্মপ্রাণ শেখ নজীবের তৈরী ধর্মশালাটি দেখে রাতে ফিরে এলাম। পরের দিন সকালে উজীর আমাকে একটি পোষাক পাঠালেন। খাবার-দাবারও পাঠালেন। ভাত, তিতির, নোনা মাংস, নারকেল ও নারকেলের তৈরী সরবৎ। এই সরবৎকে তারা কুরবানী বলে। এই সঙ্গে আবার খরচ-খরচার জন্য এক লাখ কড়িও নিয়ে এলো। দশদিন পর সিংহল (সেইলান) থেকে একটি জাহাজে একদল ফকীর এসে হাজির। তারা আমায় জানতেন। প্রধান উজীরকে তারা আমার পরিচয় ফাঁস ক'রে দিলেন। তিনি তো পরিচয় পেয়ে বেজায় খুশী। রমজান মাসের আরম্ভে আমায় একদিন নিমন্ত্রণ করলেন। গিয়ে দেখি আরো অনেকে উপস্থিত। টেবিলে খাবার পরিবেশন করা হলো। ভাত, মুরগী, কাদাখোঁচা পাখির মাংস, মাছ, নোনা মাংস, রান্না কলা। সব শেষে সুগন্ধি মেশানো নারকেলের সরবৎ। এ খেলে নাকি ভালো হজম হয়।

রমজান মাসের ৯ তারিখে প্রধান উজীরের জামাই মারা গেল। উজীরের এই বিধবা মেয়ের সঙ্গে এর আগে সুলতান শিহাব-উদ-দীনের বিয়ে হয়েছিল। মেয়েটি বাচ্চা থাকায় দুই স্বামীর কারো সঙ্গেই বিয়ে পুরোপুরি সমাধা হয়নি। মেয়েকে বাবা নিজের বাড়িতে নিয়ে এলেন। মেয়ের বাড়িটি বসবাসের জন্য

আমাকে ছেড়ে দেয়া হলো। সেখানকার সব থেকে সুন্দর বাড়িগুলির মধ্যে এটি একটি। সেখানে আমি একদিন ফকীরদের সম্মানে ভোজ দিলাম। প্রধান উজীর এজন্য আমার কাছে পাঁচটি ভেড়া পাঠিয়ে দিলেন। ভেড়া এখানে খুব দুর্লভ। মবর, মালাবার ও মকদশ থেকে আমদানি করতে হয়। ওই সঙ্গে চাল, মুরগী, ঘি আর মশলাপাতিও পাঠালেন। আমি সেসব রান্নার জন্য উজীর সুলেইমান মানায়কের বাড়ী পাঠিয়ে দিলাম। তিনি আবার এর সঙ্গে আরো কিছু পদ নিজের খরচে যোগ করলেন। তামার বাসন-কোসন, কার্পেট এসবও পাঠিয়ে দিলেন। ফকীররা ছাড়া অন্যান্য উজীররা ও প্রধান উজীরও যোগ দিলেন এ ভোজে। সারারাত মধুর স্বরে কোরান পাঠ, নাচ গান হলো।.

রাত শেষ হলে প্রধান উজীর উঠলেন। আমিও তার সঙ্গে সঙ্গে এলাম। পরদিন সকালে তিনি তার চাকরকে দিয়ে একটি মেয়েকে আমার কাছে পাঠালেন। চাকর জানাল: উজীর বলে পাঠিয়েছেন, একে পছন্দ হলে এ আপনার। না হলে তিনি একজন মারাঠা (মরহট) মেয়েকে পাঠাবেন। মারাঠা মেয়েদের আমার বেশি পছন্দ বলে জানিয়ে দিলাম। তিনি তখন একটি মারাঠা মেয়েকে পাঠালেন। নাম তার গুলিস্তান। সে পারসী ভাষাও জানে দেখে ভারী খুশী হলাম। কারণ এখানকার অধিবাসীরা যে ভাষায় কথা বলে তা আমি বুঝতাম না। পরের দিন সকালে তিনি আরেকটি মেয়েকে পাঠালেন। এর নাম অম্বরী, মবরের মেয়ে। পরের দিন রাতে দুটি বাচ্চা চাকর নিয়ে প্রধান উজীর আমার কাছে এলেন। চাকরদের একজন আমার পায়ের কাছে একটি পুঁটুলী রাখলো। দেখি, তাতে কিছু রেশমের পোষাক আসাক রয়েছে। আর আছে একটি ছোট্ট বাক্সের মধ্যে একটি মুক্তা ও কতক অলঙ্কার। উজীর বললেন: মেয়ে দু'টিকে উপহার দেবার জন্য তিনি এগুলি আমায় দিলেন।

উজীর সুলেইমান মানায়ক একদিন তার মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। আমি প্রধান উজীরের কাছে অনুমতি চেয়ে পাঠালাম। যাকে পাঠিয়েছিলাম সে এসে জানাল যে, তার এতে মত নেই। তিনি তার মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে চান। 'ইদ্দৎ' (বৈধব্য বা তালাকের পর চার মাস ব্যবধান) পার হয়ে গেলেই এ বিয়ে হবে। মেয়েটি অলক্ষণা বলে আমি রাজী হলাম না। এর মধ্যেই দুই স্বামীকে সে হারিয়েছে। এমন কি

কারো সঙ্গে বিয়ে পুরোপুরি হয়নি। ইতিমধ্যে আমি জ্বরে পড়লাম। এ দ্বীপে যেই আসুক তাকেই জ্বরে ধরবে। সুতরাং আমি দ্বীপ ছেড়ে চলে যাব জানাতে তাতে সম্মতি মিলে গেল। কড়ির বিনিময়ে কতক গয়না বেচে দিয়ে বাঙলায় যাবার জন্য একটি জাহাজ ভাড়া করলাম। কিন্তু প্রধান উজীর এমন ফাঁদ পাতলেন যে, আমার যাওয়া হলো না। তিনি তার দেয়া সমস্ত জিনিষ ফেরৎ চাইলেন। আমি জানালাম: গয়না বিক্রী ক'রে কড়ি কিনেছি—নিয়ে নিন। তিনি বললেন: আমি গয়না দিয়েছি, গয়না চাই। এবার আমি কড়ির বদলে গয়না কেনার চেষ্টা করলাম। কিন্তু প্রধান উজীরের নির্দেশে কেউ আমায় গয়না দিতে চাইল না। এই অবস্থার মধ্যে তিনি আমায় থেকে যাবার প্রস্তাব পাঠালেন। জানালেন: আমি যা চাই সবরকম সুযোগ সুবিধা দেয়া হবে। আমি বাধ্য হয়ে শেষ পর্যন্ত রাজী হলাম। থাকার জন্য আমি যে সর্তগুলি দিলাম তার একটি হলো: আমি হাঁটতে অভ্যস্ত নই, সুতরাং বাহন দিতে হবে। এরকম সর্তের কারণ, স্থানীয় প্রথানুসারে প্রধান উজীর ছাড়া আর কেউ বাহনে চড়তে পারে না। তারা আমায় একটি ঘোড়া দিল। কিন্তু আমায় ঘোড়ায় চড়তে দেখে ছেলে বুড়ো সবাই যেন মজা পেয়ে আমার পিছু ধরতে শুরু করলো। অভিযোগ জানালাম। সারা দ্বীপ জুড়ে ডোণ্ডী বা কাঁসর পিটিয়ে ওভাবে আমার পিছু নিতে নিষেধাজ্ঞা জারি হলো। এখানে কোন কিছু ঘোষণা করতে হলে এ ভাবেই করা হয়ে থাকে।

রমজান মাস শেষ হতে প্রধান উজীর আমায় পোষাক পাঠালেন। আমরা নমাজে যোগ দিতে গেলাম। প্রধান উজীরের বাড়ি থেকে নমাজ আসর পর্যন্ত পুরো পথ সাজানো হয়েছে ও পথ জুড়ে কাপড় বিছিয়ে দেয়া হয়েছে। কাপড়ের দু'ধারে স্তূপ-স্তূপ কড়ি। আমীর ও গণ্য-মান্যদের মধ্যে যাদেরই বাড়ি সে রাস্তায় তারা বাড়ির সামনে ছোট নারকেলগাছ, সুপারীগাছ ও কলাগাছ পুঁতেছেন। গাছগুলিতে টানা দড়ি ঝুলিয়ে তাতে কাঁচা সুপারী লটকানো হয়েছে। বাড়ির মালিকরা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। প্রধান উজীর কাছ দিয়ে যাবার সময় রেশম বা সূতী কাপড় তার পায়ের কাছে ছুঁড়ে দিচ্ছে। রাজ বান্দারা সে সব কাপড় ও দু'পাশের স্তূপ করা কড়ি কুড়িয়ে নিয়ে চলেছে। প্রধান উজীর হেঁটে হেঁটে চলেছেন। পরনে মিহি ছাগলের লোমে তৈরী মিশরী আলখাল্লা ও বড়ো পাগড়ি। একটি রেশমের গলাবন্ধ রুমাল জড়ানো। মাথার ওপরে চারটি ছত্র।

অন্যেরা সকলে খালি পায়ে চললেও তিনি চটি পায়ে চলেছেন। ভেরী, শিঙা, ঢাক তার আগে আগে বাজিয়ে চলেছে। আগে পিছে সৈন্যরাও চলেছে 'আল্লা-হো-আকবর' ধ্বনি দিতে দিতে।

নমাজ শেষ হতে প্রধান উজীরের ছেলে ধর্মোপদেশ শোনালেন। একটা ডুলি আনা হলো উজীরের বসার জন্য। আমীর ও অন্যান্য উজীরেরা অভিবাদন ক'রে প্রথা মতো তার পায়ে পোষাক নিবেদন করলো। তিনি আর কখনো ডুলিতে চড়েননি; কেননা—একমাত্র সুলতানই এতে চড়ে থাকেন। বাহকরা সেটি তুলতে আমিও আমার ঘোড়ায় চাপলাম। রাজপ্রাসাদে এলাম। প্রধান উজীর এক মঞ্চে আসন নিলেন। তার কাছে অন্যান্য উজীর ও আমীররা। বান্দারা বর্শা, তলোয়ার ও লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। প্রথমে খাবার এলো। তারপর পান সুপারী। সবার শেষে একটি ছোট থালায় ক'রে এলো মুকাশরী চন্দন। একদল অতিথির খাওয়া হয়ে যেতেই তাদের চন্দন লেপে দেয়া হচ্ছে। এ দিনের ভোজে এক জাতের সার্ডিন মাছও পরিবেশন করা হলো। রান্না করা নয়, নুন মাখানো। কুইলন থেকে উপহার এসেছে। এ মাছ মালাবারে প্রচুর ধরা পড়ে। প্রধান উজীর তার একটা খেতে খেতে বললেন—'এর কয়েকটা মাছ চেখে দেখুন; এ মাছ আমাদের দেশে মেলে না'। আমি বললাম—কী ক'রে খাব? এতো রান্না করা হয়নি। তিনি জবাব দিলেন—'আরে না না! এ তো রান্না করা'। আমি জোর দিয়ে বললাম—আমি খুব ভালো করেই জানি, আমার দেশে এ মাছ প্রচুর পাওয়া যায়।

মাসের দু'তারিখে আমি সুলেইমান মানায়কের মেয়েকে বিয়ে করতে রাজী হয়ে গেলাম। প্রধান উজীরকে অনুরোধ জানালাম যাতে এই বিয়ে তার সামনে রাজপ্রাসাদে বসে হয়। সেই মতো আয়োজন হলো। কিন্তু বিয়ের আসরে জানা গেল মেয়ে নিজেই এ বিয়েতে রাজী নয়। তখন প্রধান উজীরের প্রস্তাব মতো সুলতানার এক বিমাতাকে বিয়ে করলাম। এর মেয়ের সঙ্গে উজীরের ছেলের বিয়ে হয়েছে। মেয়েকে যে স্ত্রীধন দেয়া দরকার তা আমার হয়ে প্রধান উজীরই দিলেন। এই বিয়ের পর আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রধান উজীর জমাল-উদ-দীন আমাকে বাধ্য করলেন কাজীর পদ নিতে। এর মূল কারণ আর কিছুই নয়। আমি তৎকালীন কাজীর নানা বদ-অভ্যাসের সমালোচনা করেছিলাম।

তিনি মৃতলোকের সম্পত্তি উত্তরাধিকারীদের মধ্যে ভাগ ক'রে দেবার সময় তার একদশমাংশ নিজে নিয়ে নিতেন। আমি তাকে বললাম, আপনার এরকম করা উচিত নয়। আপনার পারিশ্রমিক সকল পক্ষের মত মতো ধার্য হওয়া দরকার। কিন্তু কোন দিকেই তিনি ভালো লোক ছিলেন না।

আমি কাজী হবার পর আইনের শাসন (শারিয়ত) চালু করলাম। আমাদের দেশের মতো এখানে তত ঝগড়া-বিবাদ হয় না। আমি তাই কুপ্রথা দূর করার দিকে মনোযোগ দিলাম। এখানকার এক কুপ্রথা : তালাক পাওয়া স্ত্রীদের আবার নিকা না হওয়া পর্যন্ত পুরানো স্বামীর ঘরে থাকতে বাধ্য করে। আমি একে পুরোপুরি খারিজ ক'রে দিলাম। জনা পঁচিশেক লোককে এজন্য চাবুকপেটা ক'রে বাজারে ঘোরালাম। তালাক দেয়া স্ত্রীদের বাড়ি থেকে চলে যেতে দিতে বাধ্য করলাম। সমবেত নমাজে যোগ দেবার জন্য চাপ দিলাম। শুক্রবারের নমাজে ঠিক মতো যোগ দেবার আদেশ জারি করলাম। যারা যোগ দেবে না তাদের সাধারণের সামনে অপদস্থ ও চাবুকপেটা করা হবে বলে জানালাম। বেতনভুক ইমাম ও মুয়জ্জিনরা যাতে ঠিক মতো কাজ করেন সেজন্য সতর্ক ক'রে দিলাম ও দ্বীপ জুড়ে এ আদেশনামা জারি করা হলো। আমার শেষ প্রচেষ্টা মেয়েদের পোষাক পরানো। কিন্তু এ ব্যাপারে আমি সফল হতে পারিনি।

উজীর আবদুল্লার সৎ মেয়েকে ইতিমধ্যে আমি বিয়ে করেছিলাম। তাকে আমি খুব ভালোও বাসতাম। তাই আবদুল্লাকে যখন নির্বাসন থেকে ফিরিয়ে এনে মহল দ্বীপে ঠাঁই দেয়া হলো—আমি তাকে উপহার পাঠালাম, তার সঙ্গে দেখা করলাম ও এক সঙ্গে প্রাসাদে গেলাম। একবার রমজান মাসে আমি যখন নির্জনে রইলাম তখন সবাই আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন, বাদ একমাত্র আবদুল্লা। পরে প্রধান উজীর জমাল-উদ-দীন যখন আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন, তখন ভদ্রতার খাতিরে তিনিও তার সঙ্গে এলেন। এরপর আমাদের মধ্যে মন কষাকষি শুরু হয়ে গেল। আমার নির্জনবাস শেষ হবার পর প্রধান উজীরের ছেলেরা এসে আবদুল্লার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাল। প্রধান উজীরের ছেলেরা আমার এক স্ত্রীর মামা। অন্যদিকে আমার স্ত্রী আবার আবদুল্লার সৎ মেয়ে। যাই হোক, তারা আমায় জানাল যে, তাদের পিতা উজীর আবদুল্লাকে

তার উইলে তাদের জিম্মাদার করেছেন। সেই সব সম্পত্তি এখনো তার কাছে। অথচ আইন মতো তিনি আর তাদের জিম্মাদার নন। তারা আদালতে তার উপস্থিতি দাবী করলো। মামলায় কোন পক্ষকে তলব করতে হলে আমি সব সময় ফাঁকা পরোয়ানা পাঠাতাম। এর অর্থ, সে যদি সঙ্গে সঙ্গে আদালতে না আসে আমি তাকে শাস্তি দেব। আবদুল্লাকেও আমার রেওয়াজ মতো পরোয়ানা পাঠালাম। এতে তিনি অপমানিত বোধ করলেন। বাইরে কিছু প্রকাশ না করলেও মনে মনে আমার প্রতি আক্রোশ পুষে রাখলেন। তিনি তার প্রতিনিধিত্ব করতে অপর একজনকে আদালতে পাঠালেন। কিন্তু আমি জানতে পেলাম, তিনি কতকগুলি খুব আপত্তিকর মন্তব্য করেছেন।

ছোট বড়ো সব স্তরের লোকই চলে আসা প্রথা মতো প্রধান উজীর জমাল-উদ্-দীন ও উজীর আবদুল্লাকে একই রকম সম্মান দেখাতেন। তাদের অভিবাদনের রীতি ছিল এই রকম : তারা তাদের মধ্যম আঙুলটি মাটিতে ছুঁইয়ে তাকে চুমু খেত বা মাথায় রাখতো। আমি ঘোষণাকারীর কাছে এক ঘোষণা পাঠালাম। সে সেই মতো সকলের সামনে সুলতানের প্রাসাদে ঘোষণা করলো যে, প্রধান উজীরকে যেভাবে অভিবাদন জানানোর প্রথা সেই মতো প্রথায় কেউ আবদুল্লাকে অভিবাদন জানালে তাকে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে। আবদুল্লাকে দিয়েও অঙ্গীকার করিয়ে নিলাম যে, তিনি কাউকে ওইভাবে অভিবাদন করতে দেবেন না। তার শত্রুতা এর ফলে আরো বাড়ল।

আমি আবার একটি বিয়ে করলাম। এই মেয়েটি আর এক উজীরের। এখানে তার খুব সম্মান। তার ঠাকুরদা ছিলেন সুলতান দাউদ। দাউদ ছিলেন সুলতান আহমদ শাহুরাজার নাতি। পরে আমি আরো একটি মেয়েকে বিয়ে করি। সে ছিল বিগত সুলতান শিহাব-উদ-দীনের স্ত্রীদের একজন। প্রধান উজীর আমায় একটি বাগান দিয়েছিলেন, সেখানেই তিন বউয়ের জন্য তিনখানা বাড়ি বানালাম। আমার চতুর্থ বউ আবদুল্লার সৎ মেয়ে। সে তার নিজের বাড়িতেই থাকত। আর সেই ছিল আমার সব থেকে প্রিয়। বিয়ের সূত্রে আত্মীয়তা গড়ে ওঠার জন্য প্রধান উজীর ও দ্বীপের অন্যান্য লোকেরা আমায় ভয় করতে শুরু করল। প্রধান উজীরের কাছে আমার নামে নানারকম কান ভাঙানি ও অসৎ কুৎসা করা হতে লাগল। বেশির ভাগই উজীর আবদুল্লার লোকেরা। ফলে এক জটিল পরিবেশ ও মন কষাকষি দেখা দিল।

একদিন একজন স্ত্রীলোক এসে তার স্বামীর নামে প্রধান উজীরের কাছে অভিযোগ জানাল। তার স্বামী বিগত সুলতান জলাল-উদ্‌-দীনের ক্রীতদাস ছিল। স্ত্রীলোকটি জানাল, তার স্বামীর সঙ্গে বিগত সুলতানের এক উপপত্নীর অবৈধ সম্পর্ক রয়েছে। প্রধান উজীর অভিযোগ পেয়ে কয়েকজন লোককে সেই উপপত্নীর বাড়ি সন্ধান নিতে পাঠালেন। এক বিছানায় শুয়ে থাকা অবস্থায় তাদের দেখতে পেয়ে দু'জনকেই ধরে আনা হলো। এ ব্যাপারে যখন আমার কাছে রায় চাওয়া হলো, আমি উভয়কে সংশোধনের জন্য নির্দিষ্ট কঠোর দণ্ড দিলাম। পরে স্ত্রীলোকটিকে ছেড়ে দিয়ে দাসটিকে কারাদণ্ড দিলাম। প্রধান উজীর ক্রীতদাসটির মুক্তির জন্য আমায় প্রভাবিত করার চেষ্টা করলেন। আমি উত্তরে বললাম, যেখানে আপনারা এক দাসের হারেমে অবৈধ ভাবে যাবার অপরাধে সুলতান শিহাব-উদ্‌-দীনকে কিছুকাল আগে হত্যা করেছেন, সেখানে মনিবের হারেমে অবৈধ সম্পর্কের অপরাধে অপরাধী এক নিগ্রো ক্রীতদাসের মুক্তি চাইছেন কী ক'রে? আমি সঙ্গে সঙ্গে সেই দাসকে বাঁশের লাঠি দিয়ে পেটানোর হুকুম দিলাম ও গলায় দড়ি বেঁধে তাকে সারা দ্বীপ ঘোরালাম। প্রধান উজীর সব খবর শুনে রেগে গেলেন। সব উজীর ও সৈন্যদের সমবেত ক'রে আমাকে ডাকিয়ে পাঠালেন। আমি গেলাম। একজন শাসকের প্রতি যে রকম সম্মান দেখান হয়ে থাকে তাকে আমি সাধারণতঃ সেই রকম সম্মান দেখাতাম। কিন্তু এবারে তা আর দেখালাম না। শুধু 'সলামুন অলইকুম' বললাম। তারপর চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকদের লক্ষ্য ক'রে বললাম "কাজীর দায়িত্ব পালন করার অনুকূল পরিবেশ নেই বলে সকলের সামনে এপদ ত্যাগ করলাম, আপনারা সাক্ষী রইলেন।" প্রধান উজীর আমার ব্যবহারে খুব অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি কিছু বললেন আমায়। আমি তার কাছে গিয়ে কড়া ভাষায় তার জবাব দিলাম। নমাজের সময় ঘোষিত হওয়ায় সেখানেই ঘটনায় ছেদ পড়লো। প্রধান উজীর বাড়ির ভেতরে যেতে যেতে মন্তব্য করলেন: "লোকে বলে আমি একজন সুলতান। কিন্তু দেখ। আমার অসন্তোষ জানাবার জন্য এ লোকটাকে আমি ডেকেছিলাম। কিন্তু লোকটা উল্টে আমাকেই মেজাজ দেখাচ্ছে।"

এখানে স্মরণ করিয়ে দেয়া যেতে পারে, ভারতের সুলতানের দরবারে আমার যে পদগৌরব ও আধিপত্য ছিল, তা-ই এখানে আমার প্রভাবের কারণ। ভারতের সুলতান অনেক দূরে থাকলেও এখানে সবাই তাকে ভয় করতো।

প্রধান উজীর বাড়ি গিয়ে আমার কাছে প্রাক্তন কাজীকে পাঠালেন। তার আবার বক বক করার অভ্যেস। তিনি আমায় বললেন : "উনি জানতে চাইছেন, কেন আপনি সবার সামনে তাকে অপমান করলেন? কেন তাকে অভিবাদন জানালেন না?" আমি উত্তর দিলাম : যতক্ষণ তার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ছিল আমি তাকে সম্মান দেখিয়েছি। তিনি বিবাদ শুরু করতেই তাকে সম্মান দেখানো ছেড়ে দিয়েছি। তাছাড়া মুসলমানদের অভিবাদন হলো সালাম জানানো, আমিতো সে অভিবাদন তাকে জানিয়েছি। কাজী ফিরে এসে আমায় জানাল, আমাদের ছেড়ে চলে যাওয়ার মতলব নিয়েই আপনি এসব করছেন। আপনি আপনার স্ত্রীদের স্ত্রীধন দিয়ে দিন। অন্যান্য লোকের যার যা পাওনা আছে তাও মিটিয়ে দিন। তারপর যদি যেতে চান, যেতে পারেন। আমি সে কথা শুনে যার যা পাওনা মিটিয়ে দিলাম।

এখানে আসার পর প্রধান উজীর আমাকে কতক কার্পেট, গৃহস্থালীর জন্য তামার বাসন-কোসন ইত্যাদি দিয়েছিলেন। তাছাড়াও যখন যা চাইতাম তা তিনি দিতেন। আমাকে তিনি বিশেষ স্নেহ ও সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতেন। কিন্তু পরে লোকের কান ভাঙানিতে আমার প্রতি তার মনে এক আতঙ্ক দেখা দেয়। যখন তিনি শুনলেন, আমি সব দেনা মিটিয়ে দিয়েছি ও চলে যাওয়া ঠিক করেছি, তিনি বেশ দুঃখ পেলেন। ছাড়পত্র দিতে দেরি করতে থাকলেন। আমি কিন্তু ফিরে যাবার জন্য পুরো সংকল্পবদ্ধ। তাই, এক বউকে তালাক দিলাম। অন্যজন গর্ভবতী বলে তার সঙ্গে ন' মাসের জন্য রফা করলাম। এর মধ্যেই ফিরতে পারি। যদি না ফিরি, তবে তার নিজের বিবেচনা মতো যা খুশী করার অধিকার রইলো। আমার যে স্ত্রীর সঙ্গে সুলতান শিহাব-উদ-দীনের বিয়ে হয়েছিল, তাকে তার বাবার কাছে মুলুক দ্বীপে পৌঁছে দেবার জন্য সঙ্গে নিলাম। আমার প্রথম স্ত্রী, যে শিহাব-উদ-দীনের বিমাতা, তাকেও সঙ্গে নিলাম। সৈন্যাধ্যক্ষ উজীর উমর ও নৌ-অধ্যক্ষ উজীর হসনের সঙ্গে আমার নিবিড় ঘনিষ্ঠতা হলো। ঠিক হলো, আমি মবরে ফিরে যাব। সেখানকার সুলতান আমার ভায়রা। মালদ্বীপকে তার অধীনস্থ করার জন্য তার কাছ থেকে সৈন্য নিয়ে এখানে আসব। তারপর তার প্রতিনিধি রূপে এখানে আমি আধিপত্য করব। ঠিক হলো, আমার আগমন সংকেত হিসাবে জাহাজে সাদা পতাকা তুলব। তারা তা দেখা মাত্র এখানে বিদ্রোহ ঘোষণা করবে। প্রধান উজীর ও আমার

মধ্যে বিবাদ দেখা দেবার আগে এরকম কোন কল্পনা কখনো আমার মাথায় আসেনি। প্রধান উজীর ক্রমেই আমার সম্পর্কে ভীত হয়ে উঠছিলেন। তিনি বলতেন: 'এ লোকটা নিশ্চয়ই একদিন উজীর হবে, তা আমার বেঁচে থাকার মধ্যেই হোক আর পরেই হোক।' প্রায়ই তিনি আমার সম্বন্ধে খোঁজ নিতেন ও বলতেন: 'আমি শুনেছি ভারতের সম্রাট নাকি এখানে বিদ্রোহ সৃষ্টি করার জন্য ওর কাছে টাকা পাঠিয়েছে।' পাছে আমি মবর থেকে সৈন্য নিয়ে আসি এই ভয়ে তিনি আমায় চলে যেতে দিতে ভরসা পাচ্ছিলেন না। তিনি আমায় খবর পাঠালেন যতদিন না আমার জন্য একটি জাহাজের সুবন্দোবস্ত ক'রে দিতে পারছেন ততদিন যেন আমি অপেক্ষা করি। আমি রাজী হলাম না।

সুলতানার বোন তার বিমাতার (আমার প্রথম স্ত্রী) দেশত্যাগ নিয়ে সুলতানার কাছে নালিশ জানাল। সুলতানা তাকে আটকাবার জন্য প্রভাবিত করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাতে কোন ফল হলো না। তখন সে বিমাতাকে বললো: 'আপনার যা কিছু গয়নাপত্র সব এরাজ্যের টাকায় কেনা। যদি প্রমাণ দিতে পারেন যে, সুলতান জলাল-উদ-দীন সেসব আপনাকে দিয়ে গেছেন তবে বেশ কথা, না হলে সব ফেরৎ দিয়ে যান।' প্রচুর টাকার গয়নাপত্র ছিল, কিন্তু সে অকাতরে সব তাদের ফিরিয়ে দিল। এরপর উজীররা ও সর্দ্দাররা সবাই আমার সঙ্গে মসজিদে এসে দেখা ক'রে থেকে যাবার অনুরোধ করতে থাকল। আমি বললাম: যদি চলে যাবার প্রতিজ্ঞা না করতাম তবে হয়তো থেকে যেতাম। তারা বললো: 'বেশতো, অন্য একটা দ্বীপে চলে যান, তাতে আপনার শপথ পূরণ হয়ে যাবে। তারপর আবার ফিরে আসবেন।' 'খুব ভালো কথা বলেছেন' বলে তাদের তুষ্ট করলাম। যাবার রাত ঘনিয়ে এলে প্রধান উজীরের কাছে বিদায় নিতে গেলাম। তিনি আমায় জড়িয়ে ধরে চোখের জল ফেলতে থাকলেন। তার চোখের জলে আমার পায়ের পাতা ভিজে গেল। পাছে আমার শ্যালকবৃন্দ ও সহকর্মীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে সেই ভয়ে সারারাত সে জেগে কাটাল ও দ্বীপ পাহারা দেওয়ালো। শেষে আমি উজীর আলীর দ্বীপে এলাম। সেখানে এসে আমার স্ত্রী পেটের ব্যথায় ভয়ানক কাতর হয়ে পড়লো ও ফিরে যেতে চাইল। তাকে তালাক দিয়ে সেখানে ছেড়ে এলাম। উজীরের কাছেও এ বিষয়ে পত্র দিলাম। কেননা, সে তার ছেলের শাশুড়ী। যে স্ত্রীকে গর্ভবতী বলে ন' মাসের জন্য রক্ষা

করেছিলাম তাকেও তালাক দিলাম। যে বাঁদীটিকে আমার খুব ভালো লাগত তার জন্য লোক পাঠালাম। তারপর দ্বীপপুঞ্জের এক মণ্ডল থেকে অন্য মণ্ডলে ঘুরে বেড়াতে থাকলাম।

একটি খুব ছোট আকারের দ্বীপ দেখলাম। সেখানে মাত্র একখানি বাড়ী। মালিক একজন তাঁতী। ছেলে মেয়ে পরিবার নিয়ে সেখানে থাকে। কয়েকটি নারকেল গাছ আছে। কয়েকটি কলা গাছও রয়েছে। মাত্র দু'টি Ravin পাখি ছাড়া আর কোন পাখি নজরে পড়লো না। তাঁতীর একটি ছোট্ট নৌকা আছে। তাতেই সে যাতায়াত করে, মাছ ধরে। লোকটিকে দেখে আমার খুব হিংসে হলো। এখানে থাকলে দ্বীপটিকে আমি নিশ্চয় পেতে চাইতাম ও জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এখানে কাটাতে মন করতাম।

এরপর মুলুক দ্বীপে এলাম। এখানে নৌ-অধিনায়ক ইব্রাহীমের জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে। সেই জাহাজে ক'রেই আমার মবর যাবার কথা। সে তার সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে এলো। আমার জন্য এক বিরাট ভোজের আয়োজন করলো। প্রধান উজীর একটি চিঠি লিখে নির্দেশ পাঠাল আমায় যেন ১২০ বুস্তু কড়ি, ২০ পাত্র নারকেলের মধু, নির্দিষ্ট পরিমাণ পান, সুপারী ও মাছ দৈনিক দেয়া হয়। এখানে আমি ৭০ দিন থেকে গেলাম। এই দ্বীপটিও এখানকার সুন্দর ও সজীব দ্বীপগুলির মধ্যে একটি। দু'টি মেয়েকেও এখানে বিয়ে করলাম। এখানে একটি জিনিষ আমায় খুব অবাক করলো। গাছের ডাল কেটে মাটিতে বা দেয়ালে পুঁতে দিলে আবার তাতে পাতা গজায়, একটি নতুন গাছ হয়ে যায়! এখানকার ডালিম গাছে সারা বছর ডালিম ফলে। নৌ-অধিনায়ক ইব্রাহীম পাছে লুটপাট করে এই ভয়ে স্থানীয় লোকেরা তার জাহাজে থাকা অস্ত্রশস্ত্র সে যতদিন এখানে থাকবে ততদিন নিজেদের জিম্মায় রাখতে চাইল। ফলে বিরোধ দেখা দিল। আমরা তখন মহল ফিরে এলাম। কিন্তু দ্বীপের মধ্যে ঢুকলাম না। উজীরের কাছে সব কথা লিখে জানালাম। তিনি লিখে জানালেন অস্ত্রশস্ত্র আটক রাখার মতো কোন কারণ ঘটেনি। তখন আবার মুলুক দ্বীপে ফিরে চললাম। ১৩৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে আগষ্ট সে দ্বীপ আমরা ছাড়ি। ডিসেম্বরে জমাল-উদ-দীন মারা গেলেন। সুলতানার পেটে তখন তার সন্তান। কিছুকাল পরে সে সন্তানের জন্ম দিল। তারপর আবদুল্লার সঙ্গে তার বিয়ে হলো।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কোন অভিজ্ঞ নৌ-পতি না থাকা সত্ত্বেও আমরা যাত্রা করলাম। মালদ্বীপ থেকে মবর তিনদিনের পথ। তবু ন'দিন সমুদ্রে কাটাতে হলো। ন' দিনের দিন জাহাজ সেইলান বা সিংহল দ্বীপে ভিড়ল।

দ্বীপের দিকে তাকাতে সরণদীব পর্বতের চূড়া আকাশে আবছা ধোঁয়ার মতো চোখে পড়লো। যখন দ্বীপে ভিড়লাম নাবিকেরা জানাল: যে রাজার বন্দরে সওদাগরি জাহাজগুলো নিশ্চিন্ত মনে ঠাঁই নেয় এ বন্দরটি সে রাজার নয়। এ অঞ্চলটি রাজা আর্য চক্রবর্তী (অয়রি শকরবরতি)-র রাজ্য। ইনি একজন ভয়ংকর প্রকৃতির লোক। এর অনেক জাহাজ সাগরে জলদস্যুগিরি ক'রে ফেরে।

কাফেররা মুলুক সন্ধান নিতে এলে বলে বেড়ালাম, আমি মবরের সুলতানের বন্ধু, এককালে তার ভায়রাও ছিলাম। তার সঙ্গে দেখা করার জন্য চলেছি। সঙ্গের যা কিছু জিনিষপত্তর, সব তাকে উপহার দেবার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তারা রাজাকে এ খবর শোনাতে তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। রাজধানী বত্তাল শহরে তার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। সুন্দর একটি ছোটখাট শহর। কাঠের দেয়াল দিয়ে ঘেরা। গম্বুজগুলিও কাঠের।

সারা দেশটির সাগর উপকূলে দারচিনি ডাল ছড়ানো। বর্ষার খরস্রোত জলের তোড়ে ভেসে এসে কূলের কাছে পাহাড়ের মতো টাল টাল জমা হয়েছে। মবর ও মালাবারের লোকেরা বিনা পয়সায় এগুলো কুড়িয়ে নিয়ে যায়। বদলে, রাজাকে কাপড়-চোপড় বা ওই ধরনের নানান জিনিষপত্তর উপহার দেয় শুধু। মবর ও এই দ্বীপের মধ্যে একদিন এক রাত্তিরের নৌকাপথ।

ব্রাজিল কাঠ ও ভারতীয় ঘৃতকুমারী বা কলম্বীও এখানে প্রচুর পাওয়া যায়।

রাজা আর্য চক্রবর্তী নৌবহরের দিক থেকে বেশ শক্তিশালী। মবরে থাকার সময়ে একবার আমি তার ছোট বড়ো মিলিয়ে একশোটির মতো জাহাজ একসঙ্গে দেখেছি। সেগুলি তখন মবর এসে ভিড়েছিল ইয়েমেন যাবে বলে।

রাজা আমার সঙ্গে খুব মিষ্টি ব্যবহার করলেন। জাহাজসুদ্ধ সবাইকে রাজ-অতিথি বলে ঘোষণা করা হলো। তার অতিথি হয়ে তিনদিন সেখানে

আমি থেকে গেলাম। তিনি পার্সী ভাষা বুঝতে পারেন। বিভিন্ন দেশ ও তার রাজাদের সম্পর্কে যে সব কথা তাকে আমি শোনালাম তাতে তিনি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হলেন।

একদিন রাজার লোকেরা তার রাজ্যের মুক্তা-ভেরি থেকে আনা একরাশ মুক্তা বাছাই ক'রে চলছিল। রাজা আমায় জিজ্ঞাসা করলেন: 'যেসব দেশে আপনি গেছেন সেখানে কোথাও মুক্তা-ভেরি দেখেছেন?' আমি উত্তর দিলাম: 'হ্যাঁ, কইশ ও কিশ দ্বীপে দেখেছি। ইবন-উস-সওয়ামলির ভেরি সেগুলি।' তিনি বললেন: 'হ্যাঁ, আমিও সেগুলির কথা শুনেছি।' তারপর একমুঠে মুক্তা হাতে তুলে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: 'সেখানকার মুক্তা কি এর মতো?' আমি জানালাম: 'না। এর চেয়ে নীরেস মানের'। শুনে তিনি খুব খুশি হলেন। হাতের মুক্তাগুলি আমায় উপহার দিলেন।

আমি আদমের পদচিহ্ন দেখার জন্য যেতে চাইলাম। সেখানকার লোকেরা আদমকে 'বাবা' ও ইভকে 'মামা' বলে। রাজা নিজে থেকে আমার যাবার সব ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। দোলায় ক'রে তার বান্দারা আমায় বয়ে নিয়ে চললো। সঙ্গে চারজন যোগীও চলেছেন। পায়ে হেঁটে। প্রতি বছর তারা এভাবে সেখানে যায়। এছাড়া চলেছে তিনজন ব্রাহ্মণ, রাজার পরিষদদের মধ্যে দশজন ও পনেরোজন মালবাহক। পথে কোথাও কোন জলাভাব চোখে পড়লো না।

বাঁশের কঞ্চি দিয়ে তৈরী একটি খেয়ানৌকায় চড়ে নদী পার হ'য়ে আমরা মনার-মন্দলী (মিন্নেরি-মন্দেল)-র দিকে এগিয়ে চললাম। রাজার রাজ্যের এক প্রান্তসীমানায় গড়ে ওঠা এই শহরটি বেশ সুন্দর। সেখানকার লোকেরা আমাদের ভোজ খাওয়ালো। পাশের জঙ্গল থেকে শিকার ক'রে আনা বাচ্চা মোষের মাংস, ভাত, তিতির পাখি, মাছ, মুরগী ও দুধ। একজন অসুস্থ খুরাসানী ছাড়া আর কোন মুসলমান সেখানে দেখলাম না। সে লোকটিও আমাদের সঙ্গ নিল। এবার চলেছি বন্দর সলাওয়াতের দিকে। এটি একটি ছোট শহর। এর পরের পথ বেশ কষ্টকর ও জলে ভরা। এ অঞ্চলটিতে অগুণতি হাতী। তবে, শেখ আবু আবদুল্লা বিন খফিফ-এর প্রভাব থেকে তারা পথে কোন যাত্রীর কোনরকম ক্ষতি করে না। তিনিই প্রথম এই পদচিহ্ন দর্শনের পথ খুলে দেন। আগে কাফেররা সেখানে মুসলমানদের যেতে দিত

না। নানাভাবে তাদের অতিষ্ঠ করে তুলতো, তাদের সঙ্গে খানাপিনা কি মেলামেশা করতো না। শেখ সদলবলে এখানে আসার অভিযান করলেন। হাতীর কবলে পড়ে তার সঙ্গীরা মারা পড়লো। কিন্তু শেখের কোন ক্ষতি করলো না হাতীরা। উলটে তাকে পিঠে চড়িয়ে নিয়ে চললো। এই আশ্চর্য ঘটনার পর থেকে কাফেররা মুসলমানদের সম্মান দেখাতে শুরু করলো। নিজেদের বাড়িতে তাদের থাকার সুযোগ দিল। একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া, পরিবারের লোকজনের সঙ্গে মেলামেশাতেও আপত্তি করল না। তারা এখনো এই শেখকে গভীর শ্রদ্ধা করে, তাকে 'মহান শেখ' বলে সম্মান দেখায়।

এবার আমরা কুনকার শহরে এসে পৌঁছলাম। এ শহরটি এ দেশের সম্রাটের রাজধানী। দুই পাহাড় মাঝের উপত্যকায়, বড়ো উপসাগর কূলে এটি গড়ে উঠেছে। মাণিক্য পাওয়া যায় বলে এই উপসাগরের নাম মাণিক্য উপসাগর। শহরের বাইরে সিরাজবাসী শেখ উসমানের মসজিদ। এখানকার শাসক ও সাধারণ লোকেরা তাকে খুব ভক্তি-শ্রদ্ধা করে, তাকে দর্শন করতে আসে। তিনিই আগে আদমের পদচিহ্ন নিয়ে যাবার দিশারী হতেন। তার হাত পা কাটা যাবার পর তার ছেলেরা ও চাকরবাকরেরা সে কাজ করে। একটি গরুকে কেটে ফেলার জন্য তার হাত পা কাটা যায়। হিন্দু আইন অনুসারে কেউ যদি গো-হত্যা করে তবে তাকেও ওইভাবে হত্যা করা বা গরুর চামড়ায় জড়িয়ে পুড়িয়ে মারা হয়। হিন্দুরা শেখ উসমানকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করতো বলে তার শাস্তি কমানো হয়। শুধু হাত-পা কেটে ফেলা হলো আর (খোর-পোষের জন্য) একটি বাজারের আদায়ী কর তাকে দেয়া হলো।

এখানকার রাজাকে কুনওয়ার (কুনার) বলা হয়। তার একটি ধবল হাতী রয়েছে। পৃথিবীর আর কোথাও আমি ধবল হাতী দেখিনি। আনন্দ-উৎসবের সময় তিনি এটিতে চড়েন। হাতীটির কপালে একটি বড়ো মাণিক্য ঝোলানো হয়েছে। এখানকার গণ্যমান্যরা আগেকার রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রে তাকে অন্ধ ক'রে দেন ও তার ছেলেকে সিংহাসনে বসান। অন্ধ রাজা এখনো বেঁচে আছেন।

এ অঞ্চলে পদ্মরাগ নামের অতি চমৎকার জাতের একরকম মাণিক্য পাওয়া যায়। এর কতক উপসাগর থেকে মেলে। সেগুলিকে এখানকার লোকেরা অতি মূল্যবান বলে মনে করে। বাকি পদ্মরাগ পাওয়া যায় মাটি খুঁড়ে।

এ দ্বীপের সব অঞ্চলেই মাটি খুঁড়ে এগুলি মেলে। এখানকার জমি অনায়াসে কেনাবেচা করা যায়। অনেকেই তাই কিছুটা জমি কিনে মাণিক্য পাবার জন্য খোঁড়াখুঁড়ি করে। এগুলি সাদা পাথরের মধ্যে লুকানো অবস্থায় থাকে। কাটাই কারিগরের সেগুলি কেটে মাণিক্য বার করে। এর কতক লাল পদ্মরাগ, কতক হলদে পোখরাজ, কতক নীলরঙা নীলা। যেসব মাণিক্যের দাম ১০০ ফনমের ওপরে সেগুলি রেখে অন্যগুলিকে বেচে দেয়া হয়। রাজ্যের প্রথা মতো দামীগুলিকে রাজা কিনে নেন। এখানকার ১০০ ফনম ছ' স্বর্ণ দীনারের সমান।

এখানকার মেয়েরা সবাই রঙীন মণি-মাণিক্যের হার পরে। অনন্ত ও পাঁইজর হিসাবেও এর ব্যবহার করা হয়। রাজার বাঁদীরা এর জালিকা তৈরী ক'রে মাথায় পরে। ধবল হাতীটির মাথায় আমি সাতটি পদ্মরাগ দেখেছি। এর প্রত্যেকটি মুরগীর ডিমের চেয়ে বড়ো। রাজা আর্য চক্রবর্তীর কাছে আমি হাতের পাতার আকারের একটি পদ্মরাগ মণি দিয়ে তৈরী পাত্র দেখেছি। তাতে ঘৃত-কুমারীর তেল রাখা হতো। এ দৃশ্য দেখে আমি তো হতবাক্। আমার চোখ-মুখের চেহারা দেখে রাজা বললেন: 'এর চেয়ে আরো বড়ো বড়ো পদ্মরাগ-মণি আমাদের কাছে আছে।'

এখানকার বনে-পাহাড়ে অগুণতি বানর। কালো-রঙা মুখ, লম্বা লেজওয়ালা। পুরুষ বানরদের মুখে মানুষের মতো দাড়ি রয়েছে। শেখ উসমান, তার ছেলেরা ও আরো অনেকে আমায় বললো, এই বানরদের একজন রাজা আছে। বানরেরা তাকে সম্রাটের মতো সম্মান দেখায়, অভিবাদন করে। সে মাথায় পাতা দিয়ে ফেট্টি বাঁধে। একটি কাঠি নিয়ে চলাফেরা করে। যখন সে দাঁড়িয়ে থাকে তখন তার দুপাশে চারটে বানর লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে থাকে। সে যখন বসে তখন তারা তার পিছনে দাঁড়িয়ে থাকে। তার বউ ও বাচ্চারা প্রতিদিন তার সামনে এসে বসে। অন্য সবাই দূরে সরে বসে। এই সময় ওই চার বানর তার বউকে সম্মান দেখায়। এরপর সবাই চলে যায়। প্রত্যেকে একটি ক'রে কলা, লেবু বা একটা কিছু ফল এনে রাজাকে দেয়। বাচ্চারা, রাজা, বউ ও চার বানর সেগুলি খায়।

এ অঞ্চলে একপ্রকার উড়ন্ত জোঁক রয়েছে। একে তারা জুলু বলে।

মাটিতে গাছের পাতায়, ডালে সবখানে এদের অবাধ গতি। এদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য সবসময় সতর্ক থাকতে হয়। একবার তো একজন মুসলমান এই জেঁাকের কবলে পড়ে এখানে প্রাণ হারায়।

নানা জায়গা ঘুরে এবার আমরা সরণদীব পর্বতের কাছে এসে হাজির হলাম। সাগরের কূল বেয়ে যেসব পাহাড় চোখে পড়ে ওটি তাদের মধ্যে সব থেকে উঁচু। ন'দিনের পথ দূরে দাঁড়িয়েও একে আমরা দেখতে পাই। যখন তার চূড়ায় চড়লাম, চেয়ে দেখি, নিচে মেঘ ভেসে চলেছে। মেঘের আবরণে তলের কিছুই আর চোখে পড়লো না। পাহাড়ের ওপরে অনেক গাছ আছে যার পাতা কখনো ঝরে পড়ে না। নানা রঙের রকমারি ফুলের গাছ। বিশেষ ক'রে হাতের পাতার মতো বড়ো বড়ো গোলাপফুল। পাহাড়ের মাঝ দিয়ে আদমের পদচিহ্নের দিকে দুটি সড়ক চলে গেছে। একটির নাম 'বাবা' সড়ক, অন্যটির নাম 'মামা' সড়ক।

মামা সড়কটি অনেক সহজ পথ। ফেরার সময়ে যাত্রীরা এই পথ ধরে আসে। এটি দিয়ে ওপরে ওঠে না। তাহলে নাকি তীর্থ করার সুফল মেলে না। বাবা সড়কটি খাড়া। তাই চড়া-ও বেশ কঠিন। পাহাড়ের গোড়ায় যেখানে এর দরজা রয়েছে সেখানে একটি গুহা আছে। একে আলেকজেণ্ডারের গুহা বলা হয়। এখানে একটি ঝরনা রয়েছে।

প্রাচীনকালের লোকেরা পাহাড়ে খাঁজ কেটে কেটে ধাপ তৈরী করেছে। পাহাড়ের গায়ে লোহার গোঁজ পুঁতে তার সঙ্গে শিকল ঝুলিয়ে দিয়েছে। এগুলি ধ'রে ধ'রে ধাপ বেয়ে ওপরে চড়ার সুবিধা হয়। মোট দশটি শিকল এভাবে ঝোলানো হয়েছে। পরের রাস্তা আর এভাবে সুরক্ষিত করা হয়নি। দশম শিকল থেকে খিজর গুহা সাত মাইল দূর। আরো দু মাইল গেলে আদমের পদচিহ্ন। খিজর গুহাটি বেশ খোলামেলা জায়গায়। সেখানে একটি মাছে ভরাট ঝরনাও রয়েছে। সেটির নামও খিজর। গুহার শেষ কিনারায় পাহাড় কেটে দু'টি জলাধারও বানানো হয়েছে। তীর্থযাত্রীরা এই খিজর গুহাতে জিনিষপত্তর রেখে আদমের পদচিহ্ন দেখতে যায়।

একটি বেশ লম্বাচওড়া খোলামেলা জায়গায় একটি বিরাট উঁচু পাথরের বুকে পিতা আদমের পদচিহ্ন খোদাই হয়ে রয়েছে। স্মৃতিচিহ্ন রেখে যাবার জন্য তার পদচিহ্নটি আপনা থেকে এখানে ফুটে উঠেছে। এটি ১১ বিঘত

লম্বা। আগে চীনারা এই পদচিহ্ন দর্শন করতে আসতো। তারা এথেকে বুড়ো আঙুল ও তার পাশের খানিকটা পাথর কেটে নিয়ে সবন-চউ-ফু (জৈতুন) শহরের এক মন্দির-মধ্যে রেখেছে। পদচিহ্নের পাশে নটি গর্ত খোঁড়া হয়েছে। বিধর্মী তীর্থযাত্রীরা সেগুলিতে সোনা, পদ্মরাগ, মুক্তা ইত্যাদি প্রণামী ফেলে। চলিত নিয়ম মতো তীর্থযাত্রীরা তিনদিন খিজর গুহায় থেকে প্রত্যহ দু'বেলা পদচিহ্ন দর্শন ক'রে চলেন। আমরাও তাই করলাম। ফেরার পথে আদমের পুত্র শইস-এর গুহায় থাকলাম। সেখান থেকে সমক বা মৎস উপসাগর, কুরমূলা, জবরকাওয়ান, দিলাদীনওয়া, আতকালঞ্জা গ্রাম একের পর এক পার হলাম।

পাহাড়ের গোড়ায় এক বিরাট উপসাগর। এখান থেকে পদ্মরাগ সংগ্রহ করা হয়। সাদা চোখে এর জল ঘন নীলরঙা বলে মনে হয়। এখান থেকে দু'দিন পথ চলার পর দোন্দ্র (দীনবর) শহরে এলাম। এটি বেশ বড়োসড়ো একটি শহর। বণিকদের বসবাসই বেশি। একটি বিরাট মন্দির আছে। বিগ্রহের নাম দীনবর। মন্দিরে হাজার জনের মতো ব্রাহ্মণ ও যোগী বাস করে। সারা রাত বিগ্রহের সামনে নাচ গান করার জন্য পাঁচশো জনের মতো হিন্দু মেয়ে (দেবদাসী) আছে। এই শহর ও তার রাজস্ব পুরোপুরি এই দেবতাকে উৎসর্গ করা হয়েছে। তার রোজগারেই মন্দির-বাসিন্দাদের যাবতীয় খরচ-খরচা চলে। মূর্তিটি সোনায় গড়া ও স্বাভাবিক মানুষের আকারের। চোখ দুটির জায়গাতে দুটি বড়ো পদ্মরাগ মণি বসানো। আমাকে জানানো হলো, মণি দুটি নাকি রাতে লণ্ঠনের মতো জলজল করে।

এরপর আমরা কালী শহরে গেলাম। দীনবর থেকে এ শহরটি প্রায় ২১ মাইল দূরে। সেখান থেকে গেলাম কলম্বো শহরে। এটি এখানকার সেরা ও বড়ো শহরগুলির একটি। কলম্বো থেকে তিনদিন পথ চলার পর আবার আমরা বত্তালায় ফিরলাম। নৌ-পতি ইব্রাহীম আমার জন্য সেখানে অপেক্ষা করছিল। তাকে নিয়ে মবর রওনা হলাম।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

আমাদের জাহাজ এগিয়ে চলতে চলতে এবার ভীষণ ঝড়বাতাসের মুখোমুখি হলো। জল এতো উঁচু হয়ে উথালপাথাল শুরু করলো যে এই বুঝি জাহাজের মধ্যে ঢুকে পড়ে। ভয়ে সবাই দিশেহারা। সব থেকে বিপদের কথা আমাদের সাথে কোন অভিজ্ঞ নৌ-অধিনায়ক নেই। এক সময় তো একটা পাহাড়ের কাছ দিয়ে যাবার সময় তার সঙ্গে ধাক্কা খেতে-খেতে একটুর জন্য জাহাজ বেঁচে গেল। এরপর অগভীর খাড়ির মধ্যে জাহাজ এসে পড়তে ক্রমে সে ডুবতে আরম্ভ করলো। মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে যাত্রীরা তাদের যা-কিছু জিনিষপত্র জাহাজ থেকে ফেলে দিল সাগর জলে। পরস্পরের কাছ থেকে নিল বিদায়। আমরা জাহাজের মাস্তুলটা কেটে ফেললাম। নাবিকরা তাই দিয়ে কাঠের ভেলা বানিয়ে ফেলল। তীর আমাদের কাছ থেকে আর মাত্র সাড়ে ছ'মাইল দূর।

আমার সঙ্গে দু' দু'জন ক্রীতদাসী। এছাড়া আরো দু'জন সঙ্গী। সঙ্গীদের বললাম তোমরা ভেলায় উঠে পড়ো। আমার প্রণয়ী দাসীটিকে সঙ্গে নাও। দাসীটি বললো 'আমি সাঁতার জানি। ভেলার একটা দড়ি ধরে ঠিক সাঁতরে সাঁতরে চলে যাব'। সঙ্গী দুজন ও অন্য বাঁদীটি ভেলায় উঠে বসলো। একজন মহম্মদ বিন ফরহান এত-তু জারী, অন্যজন মিশরবাসী। পেয়ারের বাঁদীটি ভেলার দড়ি ধরে সাঁতরে চললো। নাবিকরাও ভেলার সঙ্গে দড়ি বেঁধে তাই ধরে দিয়ে চললো সাঁতার। আমার যাকিছু দামী জিনিষপত্র, অলঙ্কার আর সুগন্ধি, তাদের জিম্মায় দিয়ে দিলাম। বাতাস অনুকূল থাকায় তারা নিরাপদে তীরে গিয়ে পৌঁছালো। আমি জাহাজেই থেকে গেলাম। নৌ-অধিনায়ক খানকয়েক তক্তার সাহায্যে কূলে চলে গেল। নাবিকরা চারখানা নৌকো গড়ার কাজে লেগে পড়লো। গড়া শেষ হবার আগেই রাত ঘনিয়ে এলো। জাহাজের মধ্যে সমানে জল ঢুকে চলেছে। আমি জাহাজের পিছনের দিকে উঁচু পাটাতনের ওপর চড়ে বসলাম। সারা রাত সেখানেই কাটালাম। সকালের দিকে কিছু কাফের একখানা নৌকা নিয়ে আমাদের কাছে এলো। আমরা তাদের নৌকায় চড়ে শেষ পর্যন্ত মবর

উপকূলে এলাম। তাদের বললাম আমরা তোমাদের রাজার বন্ধু। তারা তখন রাজার কাছে চিঠি লিখে খবর পাঠাল, আমিও চিঠি দিলাম। সুলতান এক অভিযানে এদিকে এসেছিলেন। তিনি যেখানে আছেন, এখান থেকে সে জায়গাটি মাত্র দু'দিনের পথ। সেখানে লোক ছুটল।

কাফেররা আমাদের একটা ঘন বনের মধ্যে নিয়ে এলো। আমাদের তাল খেতে দিল। কিছু ভাল মাছও ছিল। তিন দিন পার হবার পর কমর-উদ-দীন নামে সুলতানের এক আমীর একজন অশ্বারোহী ও পদাতিক নিয়ে আমাদের কাছে হাজির হলো। সঙ্গে তারা একটি দোলা ও দশটি ঘোড়াও এনেছিল। এক বাঁদী দোলায় চাপল, অন্য বাঁদী ও সঙ্গীদের নিয়ে আমি ঘোড়ায় চললুম। হরকাটু দুর্গে পৌঁছে রাতটা সেখানে কাটিয়ে দিলাম। অল্প কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে পরদিন সুলতানের শিবিরে এলাম।

মবরের সুলতান তখন ঘিয়াস-উদ-দীন দামঘানী। প্রথম জীবনে তিনি একজন সামান্য অশ্বারোহী সৈনিক ছিলেন। মালিক মুজির বিন আবু রিজার অধীনে কাজ করতেন। আবু-রিজা ছিলেন সুলতান মহম্মদের অধীন। এরপর ঘিয়াস-উদ-দীন আমীর হাজী-বিন-সঈদ সুলতান জলাল-উদ-দীনের কাছে চাকরী নেন। শেষে নিজেই রাজা হয়ে মসনদে বসলেন। রাজা হবার আগে তার নাম ছিল সিরাজ-উদ-দীন। সিংহাসনে বসার পর উপাধি নিলেন ঘিয়াস-উদ-দীন।

মবর রাজ্য আগে দিল্লীর সুলতান মুহম্মদের শাসনাধীন ছিল। পরে আমার শ্বশুর শরীফ জলাল-উদ-দীন অহশন শাহ বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রে স্বাধীন হলেন। তিনি পাঁচ বছর মবরে রাজত্ব করলেন। তাকে খুন ক'রে তার এক আমীর আলা-উদ-দীন উদাইজী রাজা হলেন। মাত্র এক বছরের জন্য। চালালেন তিনি কাফেরদের বিরুদ্ধে এক অভিযান। এই উপায়ে বিরাট ধন-সম্পদ, লুঠের মাল সংগ্রহ ক'রে দেশে ফিরে গেলেন। পরের বছর আবার তিনি তাদের আক্রমণ করলেন। যুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে করলেন অগুণতি লোককে নির্বিচারে হত্যা। সেই হত্যার দিন যখন তিনি জল খাবার জন্য তার শিরস্ত্রাণ খুলেছেন এমন সময় এক গোপন জায়গা থেকে একটি তীর এসে তাকে বিঁধলো। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মারা গেলেন। তার জামাই কুতব-উদ-দীন এবার সিংহাসনে বসলেন। তার স্বভাব চরিত্রে প্রশংসা করার মতো কিছু ছিল না।

৪০ দিন যেতেই তিনিও খুন হলেন। এই সময় ঘিয়াস-উদ-দীন মসনদে বসলেন। সুলতান শরীফ জলাল-উদ-দীনের মেয়েকে তিনি বিয়ে করেছেন। আর তার বোনকে আমি দিল্লীতে বিয়ে করেছিলাম।

সুলতানের দরবারে খালি পায়ে যাওয়ার প্রথা নেই। ভারতের সব জায়গাতেই এই নিয়ম। আমার পায়ে তখন জুতো নেই। অনেক মুসলমান সেখানে উপস্থিত থাকলেও একজন কাফের আমাকে তার জুতোজোড়া দিল। মুসলমানদের চেয়ে কাফেরকে বেশি উদার দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম।

যাই হোক, সুলতান কাজীকে ডেকে কাজীর তাঁবুর পাশেই তিনটি তাঁবুতে আমার থাকার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। এই তাঁবুগুলোকে ভারতের লোকেরা খিয়াম বলে। তিনি আমায় খানকয়েক কার্পেট পাঠালেন। খাবার ব্যবস্থা করলেন। ভাত আর মাংস। আমাদের মতো ভারতীয়দের মধ্যেও খাবারের শেষে দই পরিবেশনের প্রথা আছে।

পরে, সুলতানের সঙ্গে দেখা সাক্ষাতের সময়ে তার কাছে আমি মালদ্বীপের বিষয় তুললাম। বললাম, সেখানে তার অভিযান করা উচিত। তিনি ভাবনা চিন্তার পর তাতে সায় দিলেন। রণতরীর ব্যবস্থাও ক'রে ফেললেন। মালদ্বীপের রাণীর কাছে কী কী সব উপহার পাঠানো হবে, উজীর ও আমীরদের জন্যও কী কী উপহার ও পোষাক-আশাক পাঠানো হবে তাও ঠিক করা হলো। রাণীর বোনের সঙ্গে তার বিয়ের জন্য চুক্তিপত্রের খসড়া তৈরীর ভার দিলেন আমার ওপর। সেখানকার গরীবদের দান করার জন্য তিন নৌকো শস্য পাঠাবার আদেশও দিলেন। পাঁচদিন পরে আমি সেখানে অভিযানে যাব ঠিক হলো। কিন্তু নৌ-সেনাপতি খাজা সররক জানালেন, তিনমাসের আগে সেখানে জাহাজ নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। সুলতান তখন আমায় বললেন, আমি যতদিন না এ অভিযান শেষ ক'রে রাজধানী (মুত্রা) মাতুরায় ফিরি, আপনি ততদিন নাহলে (ফত্তন) পত্তনে থেকে যান। আমরা সেখান থেকে আমাদের অভিযান চালাব। অতএব আমি সুলতানের সঙ্গে সঙ্গে চললাম।

এক অবিছিন্ন বনাঞ্চলের মধ্য দিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি। ছোট বড়ো গাছ আর বেতের ঝাড়ে পুরো অঞ্চলটি অতি নিবিড় ঘন। এর আগে কেউ কোনদিন এখানে ঢুকেছে কিনা সন্দেহ। সুলতান বন কেটে ফেলার হুকুম দিলেন। ছোট বড়ো সব সৈন্যদের হাতে টাঙ্গি দেয়া হলো। সকাল থেকে

সন্ধ্যে পর্যন্ত চললো তারা বন কেটে। যেসব কাফের শত্রুদের জঙ্গলের মধ্যে পাওয়া গেল তাদের বন্দী করা হলো। কাঠের দু'দিক ছুঁচোলো ক'রে খোঁটা বানিয়ে তা বন্দীদের কাঁধে চাপান হলো বয়ে নেবার জন্য। বউ ছেলে মেয়ে সহ এ ভাবে তাদের শিবিরে নিয়ে আসা হলো।

এদেশে কাঠের বেড়া দিয়ে শিবিরের চারিদিক ঘিরে দেয়া হয়। বেড়ার চারদিকে চারটি ফটক থাকে। এ ধরনের বেড়াকে এখানে 'কৎকর' বলে। সুলতানের শিবিরের চারপাশ আবার আলাদা এক কৎকর দিয়ে ঘিরে দেয়। বড়ো কৎকরের বাইরের দিকে গড়া হয় আধ মানুষ উঁচু পাথরের বেঞ্চি। সারারাত আলো জ্বলে। দাস ও পদাতিক সৈন্যরা সারারাত সেখান থেকে পাহারা দেয়। এদের প্রত্যেকের হাতে থাকে একটি ক'রে আঁটি বাঁধা সরু কাঠির গোছা। রাতের বেলা শত্রুরা হানা দিলে প্রত্যেকে আঁটিগুলো জ্বালিয়ে হাতে ধরে থাকে। এই মশালের আলোয় চারিদিক তখন আলোময় হয়ে ওঠে। শত্রুদের তাড়া করতে অশ্বারোহীদের সুবিধে হয়।

যেসব শত্রুদের আগের দিন ধরা হয়েছে পরদিন সকালে তাদের চার ভাগে ভাগ করা হলো। চার দলকে আনা হলো চার ফটক দিয়ে ঘেরের ভেতরে। তাদের দিয়ে যে খোঁটাগুলোকে বইয়ে আনা হয়েছে পুঁতে দেয়া হলো সেগুলি ফটকের কাছে। তারপর সেই খোঁটায় শূলে চাপানো হলো তাদের। মেয়ে ও বাচ্চাদের চুলের গোছা সেই শূলের সঙ্গে বেঁধে হত্যা করা হলো। সেই ভাবেই ফেলে রাখা হলো মৃত দেহগুলো। এই ভাবে তারা বন কেটে এগিয়ে চললো আর যারাই ধরা পড়লো, তাদের একই ভাবে মেরে ফেলল। এ এক দৃশ্য! আজ পর্যন্ত আর কোন রাজাকে আমি এ রকম করতে দেখিনি। এ জন্যই তাকে তাড়াতাড়ি ভগবান পৃথিবী থেকে সরিয়ে নিয়েছেন।

একদিন সুলতান আমাদের নিয়ে খেতে বসেছেন, তার ডাইনে কাজী, বাঁয়ে আমি। এমন সময়ে একজন বন্দীকে আনা হলো। সঙ্গে তার বৌ আর ছেলে। ছেলের বয়স সাত বছরের মতো হবে। সুলতান প্রথমে বন্দীকে কেটে ফেলতে সংকেত করলেন, তারপর বৌ আর ছেলেকে। তাই করা হলো। আমি চোখ বুজিয়ে রইলাম। যখন উঠলাম চোখে পড়লো মাটিতে তাদের মুণ্ডু পড়ে আছে।

আর একদিন এক শত্রুকে ধরে আনা হলো। সুলতান যে কি নির্দেশ দিলেন আমি বুঝলাম না। হঠাৎ দেখি ঘাতকেরা ছোরা উচিয়েছে। আমি তাড়াতাড়ি উঠে পড়তেই সুলতান প্রশ্ন করলেন, 'কোথাও চললেন?' আমি উত্তর দিলাম 'নমাজ পড়তে'। আমার মনের কথা বুঝতে পেরে তিনি হাসলেন। তারপর বন্দীর হাত পা কেটে ফেলতে হুকুম দিলেন। যখন ফিরে এলাম দেখি বন্দী তার রক্তে গড়াগড়ি খাচ্ছে।

সুলতানের রাজ্যের পাশে এক কাফের রাজা ছিল। নাম বলাল দেও। ইনি বড়ো বড়ো কাফের রাজাদের একজন। তার সেনাদলে এক লক্ষেরও বেশি লোক ছিল। এছাড়া ছিল ২০ হাজার মুসলমানের একটি বাহিনী। গুণ্ডা-বদমাস, দাগী আসামী ও পালিয়ে আসা দাসদের নিয়ে এই বাহিনীটি গড়া। রাজা মবর দেশ জয়ের উদ্দেশ্যে অভিযান করলেন। মবরের মুসলমান সৈন্যদল মাত্র ছয় হাজার। তার মধ্যে মাত্র অর্ধেক দক্ষ। এই সুলতানের সৈন্যরা কুব্বান শহরের কাছে রাজা বলাল দেওয়ের সৈন্যদের মুখোমুখি হলো। কিন্তু রাজার সৈন্যদের সঙ্গে এঁটে উঠতে না পেরে পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়ে মাতুরায় ফিরে এলো।

কাফের রাজা কুব্বানের কাছে শিবির গেড়েছিলেন। এটি মবর রাজ্যের সব থেকে বড়ো ও সুরক্ষিত শহরগুলির মধ্যে একটি। রাজা দশ মাস ধরে শহর অবরোধ ক'রে রইলেন। শহরে যখন মাত্র আর ১৪ দিনের খাবার আছে এমন সময়ে তিনি আত্মসমর্পণের ডাক দিলেন। কিন্তু দুর্গবাসীরা তাতে সাড়া দিল না। তারা রাজার কাছ থেকে ১৪ দিনের সময় নিয়ে সুলতানের কাছে চিঠি পাঠাল। সুলতান শুক্রবারের নমাজের দিনে সে চিঠি সবাইকে পড়ে শোনালেন। তখন শহীদ হবার জন্য অনেকে এগিয়ে এলো। এই আত্মোৎ-সর্গকারীর দল আগে আগে এগিয়ে চললো। সংখ্যায় তিনশো হবে। পিছনে সুলতান তিন হাজার সৈন্য নিয়ে। শহীদের দল হঠাৎ রাজার সৈন্যদলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। রাজার সৈন্যরা তখন পুরো অপ্রস্তুত ছিল। তাছাড়া এ দলটিকে তারা সাধারণ চোর লুঠেরা বলে মনে করলো। তাই বিশৃঙ্খল ভাবে বাধা দিল তাদের। ইত্যবসরে সুলতান তার সৈন্য নিয়ে আক্রমণ করলেন। নিদারুণ ভাবে পরাজয় ঘটলো রাজার। ৮০ বছরের বুড়ো রাজা ঘোড়ায় চেপে পালাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। সুলতানের ভাইপো

নাসির-উদ-দীন তাকে বন্দী করলো। এই নাসির-উদ-দীনই ঘিয়াস উদ-দীনের পর সিংহাসন লাভ করেছিল। যাই হোক, ঘিয়াস-উদ-দীন প্রথম প্রথম রাজাকে আদর সম্মান দেখালেন। তাকে মুক্তি দেবার ছল ক'রে তার ধন সম্পদ, হাতী ঘোড়া একে একে সব বজা করলেন। যখন আর পাবার মতো কিছুই রইলো না তখন তাকে কেটে ফেলে গায়ের চামড়া ছাড়িয়ে নিলেন। সেই চামড়ায় খড় পুরে মাতুরা শহরের পাঁচিলের গায়ে টাঙিয়ে দেয়া হলো। মাতুরায় তাকে আমি ওই ভাবে ঝুলে থাকতে দেখেছি।

আসল কথায় ফেরা যাক। আমি সুলতানের শিবির থেকে বিদায় নিয়ে পত্তন শহরে চলে এলাম। এটি একটি বড়োসড়ো আর সুন্দর শহর। একেবারে সাগর কূলে। চমৎকার একটি বন্দরও রয়েছে এখানে। বন্দরে কাঠের তৈরী একটি বিরাট মণ্ডপ আছে। বিরাট বিরাট থাম ও কড়িকাঠের ওপর খাড়া। একটি গোপন পথ দিয়ে তার ওপরে চড়া যায়। শত্রু-সৈন্য আক্রমণ করলে বন্দরে থাকা জলযানগুলিকে ওই মণ্ডপের কাছে জড়ো করা হয়। পদাতিক সৈন্য ও তীরন্দাজরা মণ্ডপের ওপরে উঠে সেখান থেকে শত্রুর ওপরে আক্রমণ চালায়। ফলে শত্রুরা তাদের জখম করার সুযোগ পায় না।

এ শহরটিতে পাথর দিয়ে বানানো একটি সুন্দর মসজিদ রয়েছে। তার পরিসর মধ্যে অনেক আঙুর আর চমৎকার ডালিম ফলে। সেখানে আমি নিশাপুরের শেখ সালিহ মহম্মদের সঙ্গে দেখা করি। তিনি সেই সম্প্রদায়ের ফকীর যারা কাঁধ পর্যন্ত চুল রাখেন।

আমি পত্তন শহরে থেকে গেলাম। সুলতান ঘিয়াস-উদ-দীনের শক্তিমত্তা বাড়াবার জন্য এক যোগী কতক বড়ি বানিয়ে দেন। শোনা যায় সেই বড়ির মধ্যে অনেক লোহাচুর ছিল। সুলতান অনেকগুলি বড়ি খেলেন, ফলে অসুখে পড়লেন। তিনি যখন পত্তন এলেন তখনো তার শরীর ভালো নয়। এখানে এসে তিনি নৌ-সেনাপতি খাজা সরবর (সরলক)-কে ডেকে পাঠালেন মালদ্বীপ অভিযানের জন্য সব ব্যবস্থা করতে।

সুলতান ১৫ দিনের মতো পত্তন শহরে কাটিয়ে রাজধানী গেলেন। তার আরো ১৫ দিন পর আমি রাজধানী মাতুরায় রওনা হলাম। মাতুরা একটি বড়ো শহর। রাস্তাঘাট বেশ চওড়া। আমার শ্বশুরই প্রথম একে রাজধানী করেন

(সুলতান শরীফ জলাল-উদ-দীন অহশন শাহ)। তিনি একে দিল্লীর আদলে অতি চমৎকার ভাবে গড়েন।

আমি যখন মাত্বরায় পৌঁছলাম তখন সেখানে এক সাংঘাতিক ধরনের জর মহামারী রূপে দেখা দিয়েছে। সে জরে আক্রান্ত হলে আর রক্ষে নেই। যখনি রাস্তায় বার হই রোগী বা মৃতদেহ চোখে পড়ে। নীরোগ ও স্বাস্থ্যবান দেখে একজন বাঁদী কিনলাম। কিন্তু পরদিনই সে মারা গেল। সুলতানের জীবন যখন নিভু নিভু সে সময়ে প্রাসাদে গিয়ে দেখি শয়ে শয়ে বাঁদী রোগে পড়ে খোলা আকাশের নিচে রোদের মধ্যে পড়ে আছে। রাজপ্রাসাদের বাসিন্দাদের খাবার ধান কোটার জন্য এদের আনা হয়েছিল।

সুলতান যখন মাত্বরায় ফেরেন তখন তার মা, স্ত্রী ও ছেলে অসুস্থ। তিনি তিনদিন শহরে কাটালেন। তারপর শহর থেকে তিন মাইলের মতো দূরে একটি নদীর কাছে এলেন। এই নদীর কাছে কাফেরদের একটি মন্দির আছে। আমি সুলতানের কাছে বৃহস্পতিবার সেখানে হাজির হলাম। তিনি কাজীর তাঁবুর পাশে আমার জন্য একটি তাঁবু গাড়তে আদেশ দিলেন। তাঁবু গাড়া সবে শেষ হয়েছে, এমন সময় দেখি, কিছু লোকে বলাবলি করতে করতে আসছে, সুলতান মারা গেছেন। কতক আবার বলছে, না, সুলতানের ছেলে মারা গেছে। পরে খবর নিয়ে জানা গেল, ছেলেই মারা গেছে। এটি সুলতানের একমাত্র ছেলে। ফলে তিনি মনে গভীর আঘাত পেলেন। পরের বৃহস্পতিবার তিনি মাকেও হারালেন।

তারপরের বৃহস্পতিবার সুলতান ঘিয়াস-উদ-দীনের মৃত্যু হলো। ভীষণ বিশৃঙ্খলা দেখা দেবার আশঙ্কা ক'রে তখুনি আমি ছুটে গেলাম। পথে মৃত সুলতানের ভাইপো ও উত্তরাধিকারী নাসির-উদ-দীনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সে তখন খবর পেয়ে শিবিরের দিকে চলেছে। সে আমায় তার সঙ্গে শিবিরে ফিরে যেতে বললো। আমি না যাওয়াতে সে বেশ মর্মাহত হলো। কাকা যখন রাজ্য লাভ করেন, নাসির-উদ-দীন তখন দিল্লীতে চাকরের কাজ করতো। কাকা রাজা হয়েছে খবর পেয়ে সে ফকীরের বেশে সেখান থেকে পালিয়ে কাকার কাছে চলে আসে। ভাগ্য এবার তাকে রাজা বানালো।

সুলতান নাসির-উদ-দীন গদীতে বসে প্রথমে কাকার উজীরকে বরখাস্ত করলেন ও রাজকোষের টাকা ফেরৎ চাইলেন। মালিক বদর-উদ-দীন নতুন

উজীর হলেন। আমি যখন পত্তনে তখন এই লোকটিকেই তার কাকা আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য পাঠিয়েছিল। বদর-উদ-দীন অল্পকাল পরেই মারা যান। তখন নৌ সেনাপতি খাজা সরওয়র উজীর হলেন। এরপর নাসির-উদ-দীন তার পিসতুতো ভাইকে মারলেন। তার বউ, সুলতান ঘিয়াস-উদ-দীনের মেয়ে-কে নিজে বিয়ে করলেন।

মালদ্বীপে যাবার জন্য ঘিয়াস-উদ-দীন যে সব জাহাজ নির্দিষ্ট ক'রে গিয়েছিলেন, সেগুলি আমাকে দেবার জন্য নাসির-উদ-দীন হুকুম দিলেন। কিন্তু আমি ঠিক তখনই সেই সাংঘাতিক জ্বরে পড়ে গেলাম। ভাবলাম, বুঝি মারাই যাব। হঠাৎ যেন ভগবানের কাছ থেকে প্রেরণা পেয়ে আমি আধসের খানেক তেঁতুল জলে গুলে খেয়ে ফেললাম। এই জিনিষটি এখানে অপর্যাপ্ত। ফলে, তিনদিন ধরে পায়খানা ক'রে চললাম। ভগবানের দয়ায় শেষ পর্যন্ত ভালো হয়ে উঠলাম। মাত্বরা শহর আর আমার ভালো লাগল না। যাত্রা করার জন্য সুলতানের হুকুম চাইলাম। কিন্তু মৃত কাকার পরিকল্পনা মতো সব কিছু অয়োজন ক'রে দেবার জন্য তিনি কিছুদিন সময় চাইলেন। আমাকে সে পর্যন্ত সবুর করতে বললেন। আমি রাজী হলাম না। তখন তিনি পত্তনে আমার জন্য একটি চিঠি লিখে দিলেন, যাতে আমার খুশী মতো যে কোন জাহাজে আমি যেতে পারি। আমি পত্তন ফিরে এলাম। এসে দেখি ইয়েমেন যাবার জন্য ৮ খানা জাহাজ অপেক্ষা করছে। তারই একটায় চড়ে বসলাম। পথে চারটে যুদ্ধ-জাহাজ আমাদের আক্রমণ করলো। তারা কিছুক্ষণ আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার পর ফিরে গেল। যখন কুইলনে জাহাজ ভিড়ল তখনো আমি পুরোপুরি সেরে উঠিনি। তাই সেখানেই তিন মাস রয়ে গেলাম। তারপর হিনাবরের সুলতান জমাল-উদ-দীনের কাছে যাবার মন ক'রে জাহাজে চেপে বসলাম।

হিনাবর ও ফাকনবের মাঝে একটি ছোট দ্বীপ আছে। আমাদের জাহাজ যখন তার কাছাকাছি, এমন সময় কাফেররা ১২টি যুদ্ধ-জাহাজ নিয়ে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। তারা বেশ পরাক্রমের সঙ্গে যুদ্ধ করলো। আমরা এঁটে উঠতে পারলাম না। বিপদের দিনগুলিকে সামাল দেবার জন্য যা কিছু আমি জমিয়েছিলাম, সব তারা লুটে নিল। সিংহলের রাজা যে সব রুবী ও রত্ন অলঙ্কার আমায় দিয়েছিল, সাধু ও ফকীররা যে সব জিনিষপত্র পোষাক-পরিচ্ছদ দিয়েছিল, সব খোয়া গেল। একমাত্র পরনের পাতলুনটি ছাড়া

রইলো না আর কিছুই। একা আমার নয়, জাহাজের সব যাত্রীরই এই দশা। তারপর তারা আমাদের কূলে এক জায়গায় নামিয়ে দিল।

আমি বাধ্য হয়ে কালিকট এলাম। নিলাম এক মসজিদে আশ্রয়। ব্যবহার বিশেষজ্ঞদের মধ্যে একজন আমায় একটি পোষাক পাঠালেন। কাজী সাহেব পাঠালেন একটি পাগড়ি। একজন বণিক আরেকটি পোষাক। এখানে আমি জানতে পেলাম যে উজীরে আলম জমাল-উদ-দীনের মৃত্যুর পর উজীর আবদুল্লা সুলতান খদীজাকে বিয়ে করেছেন। আর আমি যে বউকে সন্তানবতী অবস্থায় সেখানে ছেড়ে এসেছি তার একটি ছেলে হয়েছে। মালদ্বীপ ফিরে যেতে বার বার মন হলো, সেই সঙ্গে উজীর আবদুল্লার সাথে আমার শত্রুতার কথাও বার বার আমায় খোঁচা দিতে লাগল। আমি কোরান খুললাম। এই ক'টি কথার ওপর আমার চোখ পড়লো 'দেবদূতেরা তাদের কাছে নেমে আসবে ও তাদের কাছে বলবে—ভয় পেয়ো না, দুঃখ ক'রো না।' তারপর মননের দ্বারা ভগবানের সঙ্গে পরামর্শ করলাম। শেষ পর্যন্ত যাওয়া ঠিক হলো।

দশদিন পর মালদ্বীপে পৌঁছলাম। কন্নালুস দ্বীপে নামলাম। দ্বীপের শাসক আবদুল আজীজ মকদশাভী আমায় আন্তরিক সম্বর্ধনা জানালেন। তিনি আমায় সব রকম আতিথ্য দেখালেন ও একটি পালতোলা পানসী দিলেন। তাতে চড়ে আমি হললী গেলাম। এই দ্বীপটিতে সুলতানা ও তার বোনেরা আমোদ-প্রমোদ ও জলকেলি করতে আসতেন। একে তারা সমুদ্র বিহার বলেন। ওই সময়ে তারা জাহাজের বুকের ওপর নানারকম খেলাধুলা আমোদ-প্রমোদ করেন। উজীররা ও প্রধানরা তাদের কছে ওই সময়ে নানা উপহার সামগ্রী পাঠায়। সেখানে গিয়ে আমি সুলতানার বোন ও তার স্বামীর সঙ্গে দেখা করলাম। তার স্বামী খতীবের (ঘোষক) কাজ করে। তার বাবা উজীরে আলম জমাল-উদ-দীন। তার মা আমার স্ত্রী ছিল।

ইতিমধ্যে উজীর আবদুল্লার কাছে আমার আসার খবর পৌঁছে গেল। তিনি আমার সম্বন্ধে ও আমার সঙ্গে কে কে এসেছে না এসেছে এ বিষয়ে খোঁজ নিতে শুরু করলেন। তাকে বলা হলো যে আমি আমার ছেলেকে নিয়ে যেতে এসেছি। ছেলের বয়স তখন দু'বছর। ছেলের মা উজীরের কাছে গিয়ে নালিশ জানাল। উজীর তাকে বললেন—'সে নিয়ে যেতে চাইলে

আমি বাধা দেবন।' আমায় তিনি মহল দ্বীপের মধ্যে ঢুকতে বাধা দিলেন। তার প্রাসাদের গম্বুজের মুখোমুখি একটি বাড়িতে আমার থাকার ব্যবস্থা হলো, যাতে আমার গতিবিধির খোঁজ খবর তিনি রাখতে পারেন। তিনি তাদের প্রথানুসারে আমাকে একপ্রস্থ পোষাক, সঙ্গে পান ও গোলাপজল পাঠালেন। তাকে সেলাম জানাতে যাবার সময় আমিও দু'খানা রেশম টুকরো নিলাম উপহার দেবার জন্য। এগুলো আমার কাছ থেকে নিয়ে নেয়া হলো। কিন্তু উজীর আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য সেদিন বার হলেন না। আমার ছেলেকে অবশ্য আমার কাছে আনা হলো। এদের কাছেই সে থাকুক এই সিদ্ধান্ত নিয়ে, তাদের কাছেই তাকে ফিরিয়ে দিলাম। পাঁচদিন থাকার পর এদেশ ছেড়ে চলে যাব ঠিক করলাম। অতএব সেজন্য অনুমতি চাইলাম। উজীর আমায় ডেকে পাঠালেন। আমি গেলাম। ওই সময়ে সেই রেশমের টুকরো দু'টো আমার কাছে আনা হলো ও আমি তা উজীরকে উপহার দিয়ে প্রথা মতো সেলাম জানালাম। তিনি আমায় পাশে বসিয়ে আমার খোঁজ খবর নিলেন। তার সঙ্গে খেলাম। একই পাত্রে হাত ধুলাম, যা তিনি কাউকে করতে দেন না। তারপর পান এলো। পান খেয়ে আমি বিদায় নিলাম। পরে তিনি আমায় কিছু পোষাক ও কয়েক লাখ কড়ি পাঠালেন। মোটামুটি তিনি আমার সঙ্গে ভালো ব্যবহারই করলেন।

মহল ছেড়ে আবার যাত্রা আরম্ভ করলাম। পুরো ৪৩ দিন অকূল সাগরের বুকে কাটলো। তারপর কূলে ভিড়লাম। এলাম বাঙালায়।

বাঙলা একটি বিরাট দেশ। এখানে অঢেল ধানের ফলন। পৃথিবীর আর কোথাও জিনিষপত্তরের দরদাম আমি এতো সস্তা দেখিনি। এখানে কুয়াশা পড়ে। খুরাসানীরা একে 'দোজখ-ই-পুর-নইমত' বা 'সব সেরা জিনিষে ভরা নরক' বলে অভিহিত করে। বাঙলাদেশের পথেঘাটে এক রূপোর দীনারে (এক টাকায়) দিল্লীর মাপ মতো ২৫ রটল (বর্তমান ১৪ সের) চাল বেচা-কেনা হতে দেখলাম। দিল্লীর এক রটল মরক্কোর ২০ রটলের সমান। লক্ষ্য করলাম, বাঙলার লোকেরা একে চড়া দাম বলে মনে করছে। মহম্মদ-উল-মসমূদী এখানকার একজন পুরানো বাসিন্দা। তার আদি নিবাস মরক্কো। অতি সাধু লোক। আমার সঙ্গে যখন তিনি দিল্লী বাস করছিলেন,

সে সময়ে তিনি ওখানেই মারা যান। তিনি আমায় বলেছিলেন, তিনি, তাঁর স্ত্রী ও চাকর এই তিন জনের খোরাক বাবদ ব'ঙলায় সারা বছরে মাত্র ৮ দিরহম (দীনার?) কেনাকাটায় ব্যয় করতেন। ৮ দিরহমে দিল্লীর মাপ মতো ৮০ রটল ধান কিনতেন তিনি। সে ধান ভেনে পুরো ৫০ রটল চাল মিলতো। একটি দুধেল গাই আমি তিন রূপার দীনারে বিক্রী হতে দেখলাম। এ অঞ্চলে মোষেরাই গরুর প্রয়োজন মেটায়। এক দিরহমে ৮টি মোটা মুরগী বেচাকেনা হতে দেখলাম। ডবকা পায়রা ১৫টি ১ দিরহম। নধর ভেড়া ১টি মাত্র দু'দিরহম। মাত্র চার দিরহমে এক রটল চিনি, তাও দিল্লীর মাপ মতো। এক রটল গোলাপজল ৮ দিরহম। এক রটল ঘি চার দিরহম। এক রটল তিলতেল দু'দিরহম। রূপার ১ দীনার ৮ দিরহমের সমান। ভারতের ১ দিরহম ১ রূপার দিরহমের সমান (দিরহম মিশরীয় ও সিরীয় মুদ্রা—ভারতের ২ আনার সমান)। সব থেকে সেরা মিহি কাপড় বিক্রী হচ্ছে দেখলাম দু'দীনারে তিরিশ হাত। রক্ষিতা ক'রে রাখার মতো একজন সুন্দরী বাঁদীর দাম এক স্বর্ণ দীনার। এখানকার এক স্বর্ণ দীনার মরক্কোর আড়াই স্বর্ণ দীনারের সমান। এই দামে এখান থেকে একটি বাঁদী কিনে ফেললাম। মেয়েটির নাম আস্থরা। দেখতে ভারি সুন্দরী। আমার এক সঙ্গী একটি সুদর্শন ছেলেকে কিনলো। বেশ কম বয়স। নাম লুলু। দাম পড়লো দুই স্বর্ণ দীনার।

বাঙলাদেশের প্রথম যে শহরটিতে এলাম তার নাম সুদকাওয়ান বা চাটগাঁ (চট্টগ্রাম)। বিরাট সাগর কূলে গড়ে ওঠা বিশাল শহর এটি। এর প্রান্ত দিয়ে গঙ্গা ও যমুনা (Jūn) এক হয়ে সাগরে মিশেছে [প্রকৃতপক্ষে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র]। গঙ্গা নদীতে হিন্দুরা তীর্থস্নান করতে আসে। গঙ্গার বুকে অসংখ্য জাহাজ। এদিয়ে তারা লক্ষণাবতীর অধিবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে।

বাঙলার সুলতানের নাম ফকর-উদ-দীন। ডাক নাম ফখরা। একজন দক্ষ শাসক তিনি। বিদেশীদের তিনি পছন্দ করেন, বিশেষ ক'রে ফকীর ও সুফীদের। বাঙলা রাজ্য মুখ্যতঃ সুলতান ঘিয়াস-উদ-দীন বলবনের ছেলে সুলতান নাসির-উদ-দীনের ছিল। নাসির-উদ-দীনের ছেলে মুয়িজ্জ-উদ-দীন

দিল্লীর সম্রাট হন। তখন নাসির-উদ-দীন ছেলের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। গঙ্গানদীর বুকে তারা পরস্পরের মুখোমুখি হলেন। তাদের এই সাক্ষাৎকার 'কিরা-উস-সদাইন' বা দুই সুখী তারার মিলন বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সে কাহিনী আগেই শুনিয়েছি। কীভাবে নাসির-উদ-দীন ছেলেকে দিল্লীর তখত ছেড়ে দিয়ে বাঙলায় চলে আসেন ও জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এখানে কাটান, তাও বলেছি। তারপর তার ছেলে সিংহাসনে বসলেন। সেও মারা গেল। তারপর এলো তার ছেলে শিহাব-উদ-দীন। শিহাব উদ-দীন তার ভাই ঘিয়াস-উদ-দীন বাহাদুর ভূর এর কাছে পরাস্ত হলেন। শিহাব উদ-দীন তখন সুলতান ঘিয়াস-উদ-দীন তুঘলকের কাছে সাহায্য চাইলেন। তিনি সাহায্য করলেন। বাহাদুর ভূর বন্দী হলো তার হাতে। সুলতান ঘিয়াস-উদ-দীন তুঘলকের ছেলে মুহম্মদ সিংহাসনে বসার পর বাহাদুর ভূরকে খালাস ক'রে দিলেন। মুক্তির শর্ত ছিল দুজনে ভাগ ক'রে রাজ্য ভোগ করবেন। কিন্তু বাহাদুর ভূর কথা রাখলো না। সুলতান মুহম্মদ তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে তাকে হত্যা করলেন। নিজের শালাকে এই প্রদেশের শাসনকর্তা পদে বসালেন। কিন্তু সে সৈন্যদের হাতে মারা পড়লো। তখন লক্ষণাবতীর আলী শাহ বাঙলার গদী অধিকার করলেন। শাসন ক্ষমতা সুলতান নাসির-উদ-দীনের পরিবারের হাত থেকে চলে যেতে দেখে তাদের সঙ্গে মিত্রতার সম্পর্কে আবদ্ধ ফখর-উদ-দীন চাটগাঁ ও অবশিষ্ট বাঙলায় বিদ্রোহ জাগালেন। সেখানে তিনি নিজের অধিকার পাকাপোক্ত করলেন। কিন্তু আলী শাহর সঙ্গে তার যুদ্ধ বেঁধে গেল। শীতকালে ও বর্ষাকালের কাদা পাঁকের মধ্যে ফখর-উদ-দীন জল পথে লক্ষণাবতী হানা দিলেন। কারণ তিনি জলযুদ্ধে ধুরন্ধর ছিলেন। যেই শুকনো ঋতু এলো অমনি আলী শাহ বাঙলা অভিযান করলেন। কেননা, তিনি আবার ডাঙ্গায় লড়াইয়ে পোক্ত ছিলেন।

সুলতান ফখর-উদ-দীনের ফকীরদের প্রতি গভীর টান ছিল। এ টান এতো প্রবল যে তিনি একজন ফকীরকে চাটগাঁয়ের নায়েব ক'রে দেন। এই ফকীরের নাম শইদা। সুলতান একবার যুদ্ধে গেছেন এমন সময়ে শইদা রাজা হবার লোভ করে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। সুলতানের একমাত্র ছেলে তার

হাতে মারা পড়লো। খবর পেয়ে সুলতান পিছু হটে রাজধানী ফিরে এলেন। শইদা ও তার সমর্থকেরা সোনারগাঁ (Sunurkāwān) পালিয়ে গেল। এটি বেশ সংরক্ষিত শহর। তখন শহর অবরোধ করার জন্য সুলতান ফৌজ পাঠালেন। স্থানীয় নাগরিকেরা জীবন বিপন্ন হবার ভয়ে শইদাকে ধরে সুলতানের ফৌজের হাতে তুলে দিল। সুলতানের কাছে খবর গেল। তিনি হুকুম পাঠালেন: 'বিদ্রোহীকে কেটে ফেলে তার মাথা পাঠাও।' তাই করলো তারা। শইদার জন্য এ সময়ে অনেক ফকীরকেও প্রাণ দিতে হলো।

আমি যখন চাটগাঁ যাই তখন এখানকার সুলতানকে দেখিনি। তার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টাও করিনি। সে তখন ভারত সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। এক্ষেত্রে দেখা করার ফল খুব খারাপ হতে পারত। চাটগাঁ ছেড়ে আমি কামরু পাহাড়মালার (কামরূপ) দিকে চললাম। এখান থেকে সে অঞ্চল একমাসের পথ। কামরু পাহাড়মালা চীন থেকে তিব্বত পর্যন্ত বিস্তৃত। সেখানে কস্তুরী হরিণ আছে। সেখানকার অধিবাসীদের সঙ্গে তুর্কীদের মিল বর্তমান। এরা কঠোর পরিশ্রমের কাজ করতে পারে। সেখানকার একটি বান্দা অন্য কোন জাতের বান্দার চেয়ে কয়েকগুণ বেশি কাজের। এরা জাদু, তুকতাক, ডাইনী বিদ্যার দিকে প্রবণতা ও দক্ষতার জন্য বিখ্যাত। সেখানে আমার যাবার উদ্দেশ্য আর কিছুই না, শুধু একজন ফকীরের সঙ্গে দেখা করব। তিনি হলেন তাবরিজের শেখ জলাল-উদ-দীন।

শেখ জলাল-উদ-দীন একজন বিরাট সাধু ও তুলনাহীন পুরুষ ছিলেন। তার অলৌকিক ক্ষমতার অনেক কাহিনী ও কীর্তিকলাপ লোকের জানা। তিনি অতি দীর্ঘকাল বেঁচে ছিলেন। তিনি আমায় বলেছিলেন যে, তিনি বাগদাদের খলিফা অল-মুস্তাসিম বিল্লাহ অল-আব্বাসীকে দেখেছেন ও তার খুন হবার সময় সেখানে ছিলেন (১২৫৮ খ্রীঃ)। পরে আমি শুনেছিলাম যে, তিনি ১৫০ বছর বয়সে মারা যান। তার সঙ্গীদের কাছেই শুনেছিলাম, তিনি ৪০ বছর যাবৎ উপোস ক'রে চলেছেন। একটানা অন্ততঃ দশ দিন উপোস না ক'রে তিনি খাবার খান না। তার একটি গরু ছিল। এই গরুর দুধ খেয়ে তিনি উপোস ভাঙতেন। তিনি সারা রাত দাঁড়িয়ে প্রার্থনা জানাতেন। পাতলা, লম্বা চেহারার মানুষ ছিলেন। দাড়ি খুব অল্প। এই পাহাড়ী এলাকার অধিবাসীরা তার

কাছেই মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছে। এজন্য তিনি এখানে তাদের মাঝে থাকেন।

আমি শেখের সঙ্গে দেখা করতে চলেছি। তার ডেরায় পৌঁছতে আর মাত্র দু'দিনের পথ বাকি। এমন সময় তার চার শিষ্য আমার কাছে হাজির। সেই ফকীররা জানাল: 'শেখ আপনাকে নিয়ে যাবার জন্য আমাদের পাঠিয়েছেন।' তিনি আমাদের বললেন, 'পশ্চিমের এক পর্যটক তোমাদের কাছে আসছেন। যাও, তাকে নিয়ে এসো।' আমি তাদের সঙ্গে তার অতিথিশালায় গেলাম। তিনি যে গুহায় থাকতেন এটি তার বাইরে। ধারে কাছে কোন চাষবাস নেই। স্থানীয় মুসলমান ও হিন্দুরা শেখকে দর্শন করতে আসে এখানে। তারা তার জন্য নানা খাদ্যসামগ্রী উপহার আনে। ফকীর ও অতিথিরা তাই খায়। শেখ শুধু যা ওই গরুটির দুধ খান। তাও, আগেই বলেছি, দশ দিন অন্তর।

শেখ জলাল-উদ-দীনের আস্তানায় তিনদিন কাটিয়ে আমি হবঙ্ক যাবার জন্য রওনা হলাম। সব থেকে নাম করা আর সুন্দর শহরগুলির মধ্যে এটি একটি। এর পাশ দিয়ে আড়াআড়ি ভাবে যে নদীটি চলে গেছে, সেটি কামরু পাহাড় থেকে জন্ম নিয়েছে। নাম নহর-উল-অজবাক (নীলনদী বা মেঘনা নদী)। এই নদীপথে বাঙলা ও লক্ষ্মণাবতী যাওয়া যায়। নদীর দু'তীরে জল-চালিত চাকা, বাগান আর গ্রাম, ঠিক যেমনটি নীলনদের দু' কূল জুড়ে তেমনটি। হবঙ্কের অধিবাসীরা মুসলমান শাসনাধীন হিন্দু। তাদের কাছ থেকে উৎপন্ন শস্যের অর্ধেক নিয়ে নেয়া হয়। এ ছাড়াও তাদের আরো কর দিতে হয়।

পনেরো দিন আমরা নৌকায় কাটালাম। দু'পাশের গ্রাম, কুঞ্জ ও বনানী পেছনে ফেলে নৌকা এগিয়ে চলেছে। আমরা এক বাণিজ্য কেন্দ্রের মধ্য দিয়ে যেন চলেছি। নদীর বুকে অগুণতি নৌকা। প্রতিটি নৌকায় একটি ক'রে ঢাক। যখন দুটো নৌকায় দেখা হয়, ঢাক বাজিয়ে মাঝিরা নিজেদের মধ্যে শুভেচ্ছা বিনিময় করে। সুলতান ফখর-উদ-দীনের আদেশ, কোন ফকীরের কাছ থেকে নৌকা-ভাড়া নেয়া চলবে না। যদি কোন ফকীরের কাছে খাবার-দাবার না থাকে তবে তাদের তা দিতে হবে। এজন্যে কোন ফকীর এ শহরে এলে তাকে আধ দীনার দেয়া হতো।

ওপরের বর্ণনা মতো পনেরো দিনের পথ পেরিয়ে আমরা সোনারগাঁ শহরে এসে পৌঁছলাম। এখানকার অধিবাসীরাই শইদা ফকীরকে বন্দী ক'রে সুলতানের ফৌজের হাতে তুলে দিয়েছিল। এখানে এসে দেখলাম সুমাত্রা (জাভা) যাবার জন্য একটি জলযান দাঁড়িয়ে আছে। সুমাত্রা এখান থেকে ৪০ দিনের পথ। আমরা এই যানে চড়ে বসলাম।

———

শব্দসূচী